হাদীছ অস্বীকারকারীদের সংশয় নিরসন

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

বই পরিচিতি

হিজরী প্রথম শতকে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে রাজনৈতিক বিশৃংখলার সূত্র ধরে কিছু বিভ্রান্ত মতবাদপুষ্ট দল ও উপদলের জন্ম হয়। এদের মধ্যে একটি অংশ রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে ইসলামী শরী'আতের অন্যতম মৌলিক উৎস সুন্নাহকে অস্বীকারের প্রবণতা শুরু করে। খারিজী, শী'আ, মু'তাযিলা প্রভৃতি সম্প্রদায় সর্বপ্রথম এই ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করে। বর্তমান যুগেও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism), উদারতাবাদ (Liberalism), আধুনিকতাবাদ (Modernism) কিংবা তথাকথিত মুক্তবুদ্ধি (Enlightenment)-এর নামে হাদীছ অস্বীকারের নীতি অবলম্বন করেছেন। এদের কেউ রাসূল (ছা.)-এর হাদীছকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করেছেন, কেউ অংশবিশেষকে অস্বীকার করেছেন, আবার কেউ সরাসরি অস্বীকার না করলেও সন্দেহ সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে বিগত শতাব্দীর শুরু থেকে প্রাচ্যবিদগণ ইসলামী আইনে হাদীছের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর গবেষণা চালিয়ে আসছেন এবং হাদীছ শাস্ত্র প্রকৃতই রাসূল (ছা.)-এর বাণীর প্রতিনিধিত্বকারী কি-না এবং এর উৎপত্তিকাল কখন- তা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক উত্থাপন করেছেন। দুঃখজনক হ'ল প্রাচ্যবিদদের উপস্থাপিত এই বিতর্কে মুসলিম সমাজের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি পর্যন্ত প্রভাবিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা প্রাচ্যবাদী গবেষণার ভ্রান্তিসমূহ খণ্ডন না করে বরং তাঁদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বে নিজেদের আবদ্ধ করেছেন।

অথচ রাসূল (ছা.)-এর কথা, কর্ম ও সম্মতির সংকলন হিসাবে হাদীছ বা সুন্নাহ ইসলামী শরী'আতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআন মাজীদকে যথাযথভাবে হৃদয়াঙ্গম করা হাদীছ ব্যতীত অসম্ভব। কেননা পবিত্র কুরআনে মানবজাতিকে যেসব বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দান করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির বিশদ বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে রাসূল (ছা.)-এর জীবনাচরণে তথা হাদীছে। ফলে কুরআনের মৌলিক নীতিমালা সমূহের ব্যাখ্যা হিসাবে রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহও সমান গুরুত্বের অধিকারী। এতদুভয়ের মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। উভয়টিই আল্লাহ প্রেরিত অহী, যা শরী'আতের বিধি-বিধান নির্ধারণে আবশ্যকীয়ভাবে অনুসরণীয়। একজন মুসলমানের জন্য এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ ও আপত্তি থাকার অবকাশ নেই।

অত্র গ্রন্থে হাদীছ অস্বীকারকারীদের ২৫টি সংশয় বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের যুক্তিসমূহ তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক ও যৌক্তিকভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। বিশেষতঃ প্রাচ্যবাদী পণ্ডিতদের ভ্রান্ত অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, বাস্তবতাবিবর্জিত এবং স্বার্থদুষ্ট প্রমাণ করা হয়েছে।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
www.hadeethfoundationbd.com

লেখক পরিচিতি

জন্ম সাতক্ষীরা যেলা সদরের বুলারাটি গ্রামে স্বীয় দাদার বাড়িতে। বেড়ে ওঠা পিতৃকর্মস্থল রাজশাহী শহরে। শিক্ষাজীবনের অধিকাংশই কাটিয়েছেন সমসাময়িককালে বাংলাদেশে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর অন্যতম সূতিকাগার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী-তে। এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি দাখিল, আলিম ও দাওরায়ে হাদীছ সম্পন্ন করেন। উচ্চশিক্ষার জন্য মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশীপ পেয়েছিলেন। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। ২০১৭ সালে তিনি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি (আইআইইউআই)-এর উছূলুদ্দীন অনুষদের অধীনস্থ হাদীছ বিভাগ থেকে এমএস সম্পন্ন করেন এবং ২০১৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ইসলামী শরী'আতে হাদীছের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

পিতা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও দাদা মাওলানা আহমাদ আলীর পদাংক অনুসরণ করে কলমী ময়দানকেই তিনি বিশেষভাবে আপন করে নেন। মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখির পাশাপাশি তিনি দ্বি-মাসিক তাওহীদের ডাক (২০১০ -বর্তমান) পত্রিকা সম্পাদনার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখনী প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক সেমিনারে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন এবং প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। 'হাদীছ অস্বীকারকারীদের সংশয় নিরসন' তার প্রথম প্রকাশিত বই।

দাওয়াতী ময়দানে তিনি 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। ২০১০-২০১৪ সেশনে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এবং ২০১৮-২০২২ সেশনে সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। গবেষণা ও দাওয়াতী উপলক্ষ্যে তিনি পাকিস্তান, শ্রীলংকা, সঊদীআরব, সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়া সফর করেছেন। বর্তমানে তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পরিচালিত হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, গবেষণা বিভাগ-এর পরিচালক এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের
সংশয় নিরসন

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

হাদীছ অস্বীকারকারীদের
সংশয় নিরসন

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

الرد علي شبهات منكري الحديث

تأليف: الدكتور أحمد عبد الله ثاقب

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش

(مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী-৬২০৩

হা.ফা.বা. প্রকাশনা-১৩৭

মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০

০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

E-mail : tahreek@ymail.com

www.hadeethfoundationbd.com

১ম প্রকাশ : মার্চ ২০২২ খৃ.

২য় প্রকাশ : জুন ২০২২ খৃ.

সর্বশেষ মুদ্রণ : জানুয়ারী ২০২৪ খৃ.

মুদ্রণ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য

১৪০ (একশত চল্লিশ) টাকা মাত্র

সূচীপত্র

উ ৎ স র্গ

পরম শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতার প্রতি
যাদের দেখানো পথ ধরে জ্ঞানচর্চার
আয়াসসাধ্য ময়দানে পদার্পন-

সেই সকল ওলামায়ে কেরামের প্রতি
যারা সুন্নাহ্‌র সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারে
জীবন উৎসর্গ করেছেন-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والســـلام على من لا نبيّ بعده

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين وبعد :

ভূমিকা

ইসলামী শরী'আত ও জীবনব্যবস্থার বুনিয়াদী দুই উৎস হ'ল পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ, যা অহী হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছে। এ দু'টি উৎসের মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন করেছেন, যা ক্বিয়ামত অবধি অব্যাহত থাকবে। এই উৎসদ্বয়ের মধ্যে প্রথম উৎস তথা পবিত্র কুরআন ইসলামী শরী'আতের সাধারণ মূলনীতিসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছে, যা মানবজাতির জন্য চিরন্তন হেদায়াতবাণী। আর সুন্নাহ হ'ল কুরআনের এই মূলনীতিসমূহের ব্যাখ্যা, যা রাসূলুল্লাহ (ছা.) কর্তৃক বর্ণিত এবং তাঁর কর্ম ও স্বীকৃতি দ্বারা প্রমাণিত পথনির্দেশিকা। এতদুভয়ের সমন্বয়েই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম।

মুসলিম উম্মাহ প্রাথমিক যুগ থেকে এই দুই মূল উৎসের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বিশৃংখলার সূত্র ধরে কিছু বিভ্রান্ত মতবাদপুষ্ট দল ও উপদলের জন্ম হয়। এদের মধ্যে একটি অংশ রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে সুন্নাহকে অস্বীকারের প্রবণতা দেখিয়েছে। খারিজী, শী'আ, মু'তাযিলা প্রভৃতি সম্প্রদায় সর্বপ্রথম এই ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করে। অতঃপর আধুনিক যুগেও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism), উদারতাবাদ (Liberalism), আধুনিকতাবাদ (Modernism) কিংবা তথাকথিত মুক্তবুদ্ধি (Enlightenment)-এর নামে হাদীছ অস্বীকারের নীতি অবলম্বন করেছেন। এদের কেউ রাসূল (ছা.)-এর হাদীছকে পুরোপুরিভাবে অস্বীকার করেছেন, কেউ অংশবিশেষকে অস্বীকার করেছেন, আবার কেউ সরাসরি অস্বীকার না করলেও সন্দেহ সৃষ্টি করেছেন। অপরদিকে বিগত শতাব্দীর শুরু থেকে প্রাচ্যবিদগণ ইসলামী আইনে হাদীছের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর গবেষণা চালিয়ে আসছেন এবং হাদীছ শাস্ত্র প্রকৃতই রাসূল (ছা.)-এর বাণীর প্রতিনিধিত্বকারী কি না এবং এর উৎপত্তিকাল কখন- তা নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক উত্থাপন করেছেন। দুঃখজনক হ'ল প্রাচ্যবিদদের উপস্থাপিত এই বিতর্কে মুসলিম সমাজের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই প্রভাবিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা প্রাচ্যবাদী গবেষণার ভ্রান্তিসমূহ খণ্ডন না করে বরং তাঁদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বে নিজেদের আবদ্ধ করেছেন। এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে সিরীয় বিদ্বান ড. মুছত্বফা আস-সিবাঈ (১৯৬৪খ্রি.) বলেন, হাদীছ তাদের মুক্তবুদ্ধি চর্চার পথে প্রধান বাধা। তাই তাঁদের ভিতরকার প্রবৃত্তিগত ইচ্ছার সাথে প্রাচ্যবাদী গবেষণার ফলাফল একবিন্দুতে মিলিত

হওয়ায় তাঁদের মস্তিষ্ক সেগুলো কোন প্রকার সমালোচনা ছাড়াই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নিয়েছে।[১]

অথচ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল (ছা.)-এর কথা, কর্ম ও সম্মতির সংকলন হিসাবে হাদীছ ইসলামী শরী'আতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআন মাজীদকে যথাযথভাবে হৃদয়াঙ্গম করা হাদীছ ব্যতীত অসম্ভব। কেননা পবিত্র কুরআনে মানবজাতিকে যেসব বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দান করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন পদ্ধতির বিশদ বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে রাসূল (ছা.)-এর জীবনাচরণ তথা হাদীছে। ফলে কুরআনের মৌলিক নীতিমালা সমূহের ব্যাখ্যা হিসাবে রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহও সমান গুরুত্বের অধিকারী। এতদুভয়ের মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। উভয়টিই আল্লাহ প্রেরিত অহী, যা শরী'আতের আহকাম নির্ণয়ে আবশ্যকীয়ভাবে অনুসরণীয়। একজন মুসলমানের জন্য এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ ও আপত্তি থাকার অবকাশ নেই।

আধুনিক যুগে হাদীছবিরোধী প্রবণতা মূলত হাদীছ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন থেকে শুরু হয়নি। বরং বিংশ শতাব্দীতে রচিত প্রাচ্যবিদদের লেখনীসমূহ পাঠ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরী'আত বা আইনের উৎপত্তি কি কোন অহী বা প্রত্যাদেশিক উৎস থেকে গৃহীত, নাকি তৎকালীন আরবের পূর্ব থেকে প্রচলিত সামাজিক আইন-কানূন, রোমান আইন কিংবা ইহুদী ও খৃষ্টানদের থেকে আহরিত, সেটিই তাদের প্রধান গবেষণার বিষয়। বিশেষ করে মরু আরবের লোকেরা ইসলামের সান্নিধ্যে এসে হঠাৎ কীভাবে এত সুসংহত সামাজিক আইনী কাঠামো গড়ে তুলল-এটি তাদের কছে বড় বিস্ময়ের। অধিকাংশ প্রাচ্যবিদদের ধারণা হ'ল, ইসলামী আইন কোন স্বতন্ত্র আইন কাঠামো নয় বরং তা হ'ল তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত এবং বহিরাগত আইন-কানূন সম্বলিত একটি মিশ্র আইন। এর সাথে কুরআন ও হাদীছের কোন সম্পর্ক নেই। আর থাকলেও তা অতি সামান্য এবং অনুল্লেখ্য। তাদের অনেকের মতে, বর্বর ঘোড়সওয়ার বেদুইনরা পূর্ব-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসমূহ জয় করার পর রোমান বিচার-ব্যবস্থার নিপুণতা দেখে চমৎকৃত হয় এবং সেই আইনকে তারা নিজ দেশে নিয়ে আসে এবং স্থানীয় আইনের সাথে সমন্বয় করে নেয়। এভাবেই জন্ম হয় ইসলামী আইনের। স্বতন্ত্রভাবে ইসলামী আইনের কোন ভিত্তি নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তারা বিশেষত হাদীছ বা রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ ইসলামী আইনের দলীল নয়, তা প্রমাণের জন্য গবেষণা চালিয়েছেন।

অন্যদিকে আধুনিক যুগে যে সকল মুসলিম নামধারী ব্যক্তি হাদীছের প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করেছেন তারা বস্তুত প্রাচ্যবিদদের ধ্যান-ধারণা দ্বারা প্রভাবিত। যদিও তাদের অস্বীকারের ধরন ভিন্নতর। তাদের মধ্যে নেহায়েৎ কম

---

১. মুছত্বফা আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী'ঈল ইসলামী* (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ঞ (ভূমিকা)।

সংখ্যকই এমন রয়েছেন, যারা হাদীছশাস্ত্রকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছেন। বরং তাদের অধিকাংশই মূলতঃ সংশয়বাদী। তাদের কারো সংশয় হল, হাদীছ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি কিংবা মুহাদ্দিছদের হাদীছের বিশুদ্ধতা নিরূপণ পদ্ধতি যথার্থ নয়। ফলে তারা মনে করেন, কোন হাদীছ যদি কুরআনের সাথে এবং বিবেকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তবেই তা গ্রহণযোগ্য; অন্যথায় নয়। আবার কেউ মনে করেন যে, হাদীছ ইসলামের ঐতিহাসিক দলীলমাত্র, কিন্তু তা ইসলামী শরী'আতের কোন অংশ নয়। আবার কিছু আধুনিকতাবাদীর মতে, হাদীছ ইসলামী আইন হিসাবে প্রাথমিক যুগের প্রেক্ষাপটে প্রযোজ্য ছিল, কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা প্রযোজ্য নয়। কেননা তাদের মতে, ইসলামী আইন কোন অপরিবর্তনীয় আইন নয়, বরং যুগের সাথে সাথে পরিবর্তনযোগ্য।

প্রাচ্যবিদ ও আধুনিকতাবাদী হাদীছ অস্বীকারকারীদের উপরোক্ত ধারণা ও প্রচারণাসমূহ যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, বাস্তবতাবিবর্জিত এবং স্বার্থদুষ্ট, তা আমরা তাদেরই উত্থাপিত কিছু আপত্তি ও সমালোচনা খণ্ডনের মাধ্যমে অত্র গ্রন্থে স্পষ্ট করব ইনশাআল্লাহ। এটি মূলত মৎপ্রণীত পিএইচ-ডি গবেষণা থিসিসের সর্বশেষ অধ্যায়। শুভাকাঙ্খীদের পরামর্শে এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ভাষাগত কিছু পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করতঃ এটি পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে এতে আলোচনার পরম্পরাগত কিছু ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়।

বইটি প্রকাশে যারা যতটুকু সহযোগিতা করেছেন ও উৎসাহ প্রদান করেছেন বিশেষতঃ নিত্য শুভার্থী ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, ড. নূরুল ইসলাম, শরীফুল ইসলাম মাদানী, ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব প্রমুখের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা রইল। সেই সাথে হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা বিভাগ ও প্রকাশনা বিভাগকেও অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদের সকলকে উত্তম পারিতোষিকে ভূষিত করুন। বইটিতে মুদ্রণজনিত বা অন্য কোন প্রমাদ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হলে লেখককে জানানোর জন্য সবিনয় অনুরোধ রইল। বইটি যদি কোন একজন পাঠকেরও উপকারে আসে, তবুও আমাদের পরিশ্রমকে স্বার্থক মনে করব।

পরিশেষে প্রার্থনা করি, মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাতের প্রতিরক্ষায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু উপকারী ইলম হিসাবে কবুল করে নিন এবং কাল কেয়ামতের ময়দানে আমাদের পরকালীন মুক্তির অসীলা করে দিন। আমীন!

বিনীত
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
নওদাপাড়া, রাজশাহী
২১.১১.২০২১ইং

১ম পরিচ্ছেদ

তত্ত্বগত সমালোচনা

সংশয়-১ : কুরআনই সব বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যাকারী।

হাদীছ অস্বীকারকারীগণ দলীল পেশ করেন যে, (১) আল্লাহ বলেছেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ 'আমরা কিতাবে কোন কিছু ছাড়িনি।'[২] (২) অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ 'আর আমরা আপনার উপরে কুরআন নাযিল করেছি (মানুষের প্রয়োজনীয়) সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হিসাবে।'[৩] অর্থাৎ কুরআনে দ্বীনের প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি হুকুম-আহকাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতএব কুরআন যেহেতু পরিপূর্ণ, সেহেতু সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে তার ব্যাখ্যাদানেরও কোন অবকাশ নেই। নতুবা কুরআনের আয়াত মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে, যা অসম্ভব। তারা এ প্রসঙ্গে আরও কিছু আয়াত উল্লেখ করে থাকেন। যেমন (৩) আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।'[৪] অন্যত্র (৪) আল্লাহ বলেন أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا

---

২. সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ৩৮।

৩. সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৮৯। এই আয়াতটি প্রাথমিক যুগের জনৈক হাদীছ অস্বীকারকারী ইমাম শাফেঈকে হাদীছ বর্জনের দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছিল। বর্তমান যুগে ড. তাওফীক ছিদকী, আবূ রাইয়াহ, মুহাম্মাদ নাজীব, মুছ্বতফা কামাল মাহদূভী, আহমাদ ছুবহী মানছূর, কাসিম আহমাদ, জামাল আল-বান্না, রাশাদ খলীফা প্রমুখ হাদীছ অস্বীকারকারীগণ সকলেই আয়াতটি তাদের পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দ্র. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *দিরাসাতুন ফীল হাদীছ আন-নববী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১; ড. ঈমাদ আশ-শারবীনী, *আস-সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ ফী কিতাবাতি আ'দাইল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯০-১৯১।

৪. সূরা আল-মায়িদা ৫/৩।

‘(আপনি বলে দিন) তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ফায়ছালাদানকারী হিসাবে কামনা করব? অথচ তিনি তোমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন (আক্বীদা ও বিধানগত বিষয়ে) বিস্তারিত বর্ণনাসহ।’[৫]

পর্যালোচনা :

উপরোক্ত আয়াতগুলি হাদীছ অস্বীকারের পক্ষে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই দলীল বহন করে না। বরং আয়াতগুলির মর্মার্থ অনুধাবনে তারা ভুল করেছেন, যা আমরা ৩টি দিক থেকে তুলে ধরব। যেমন :

(এক) অর্থগত ভুল :

ক. প্রথম আয়াতে কিতাব শব্দের অর্থ কুরআন নয়, বরং লওহ মাহফূয। যেখানে আল্লাহ মানবজাতিসহ সৃষ্টিজগতের সমস্ত ছোট-বড় বিষয়াদি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, কোন কিছুই ছাড়েননি বা লিখতে ভুলেননি।[৬] এখানে এই অর্থ গ্রহণের দলীল হ’ল ঐ আয়াতের পূর্বাপর অংশসমূহ। পূর্ণ আয়াতটি হ’ল, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ‘পৃথিবীতে বিচরণশীল সকল প্রাণী এবং দু’ডানায় ভর করে আকাশে সন্তরণশীল সকল পাখি তোমাদেরই মত একেকটি সম্প্রদায়। কোন কিছুই আমরা এই কিতাবে বলতে ছাড়িনি। অতঃপর তাদের সকলকে তাদের প্রতিপালকের কাছে সমবেত করা হবে।’[৭] ইবনু কাছীর (৭৭৪হি.) বলেন, এর অর্থ হ’ল, সকল বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ নিকট সংরক্ষিত। সে প্রাণী ভূমিতে বিচরণকারী হোক বা পানিতে বিচরণকারী, আল্লাহ তাদের কারও রিযিক প্রদান কিংবা তাদের প্রতিপালন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ভোলেন না।’[৮] সুতরাং এই আয়াতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ‘কিতাব’ শব্দটি দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়নি। দ্বিতীয়ত, আরবী ভাষায় কিতাব শব্দটি যেমন কুরআন অর্থে আসে, তেমনি অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, নির্দিষ্টতা, হুকুম, নির্ধারিত মেয়াদ ইত্যাদি। যেমন কুরআনে এসেছে, আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ‘আর কোন প্রাণী

---

৫. সূরা আল-আন‘আম ৬/১১৪।
৬. ড. আব্দুল গনী আব্দুল খালিক, *হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ*, পৃ. ৩৮৪।
৭. সূরা আল-আন‘আম, আয়াত : ৩৮।
৮. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২২৬।

আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া মৃত্যুবরণ করতে পারে না, সেজন্য একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে।'[৯] এখানে 'কিতাব' শব্দটি দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا 'নিশ্চয় ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত।'[১০] এখানে কিতাব শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট সময় বুঝানো হয়েছে। সুতরাং কিতাব শব্দটি এখানে কুরআন অর্থে নয়, বরং লওহ মাহফূয অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. দ্বিতীয় আয়াতটিতে لِكُلِّ شَيْءٍ আয়াতাংশ দ্বারা আমভাবে 'সমস্ত কিছু' উদ্দেশ্য করা হয়নি, বরং এটি কুরআনের একটি বাচনভঙ্গি, যার দ্বারা প্রয়োজনীয় সব মৌলিক বিষয় কিংবা অধিকাংশ বিষয় বুঝানো হয়েছে। যেমন কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 'আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার (পথশ্রান্ত) কৃশকায় উটের উপর সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্তের সকল অঞ্চল হ'তে।'[১১] এই আয়াতে كُلِّ (সকল) শব্দ দ্বারা এই অর্থ নেয়া যরূরী নয় যে, পৃথিবীর সকল উট মক্কায় আসবে, কিংবা পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষ মক্কায় উপস্থিত হবে। বরং যারা সেখানে উপস্থিত হবে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। অনুরূপই একটি আয়াত, আল্লাহ বলেন, أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا 'আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ 'হারাম'-এ বসবাস করাইনি? সেখানে সব ধরনের ফলমূল আমদানী করা হয়, আমার পক্ষ থেকে রিযিকস্বরূপ?'[১২] এই আয়াতে كُلِّ শব্দটি দ্বারা এই অর্থ গ্রহণ করা যরূরী নয় যে, পৃথিবীর সকল প্রকার ফলমূল মক্কায় পাওয়া যাবে। সুতরাং এ সকল আয়াতের উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হ'ল যে, কুরআনে সকল কিছুর বিবরণ

---

৯. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৪৫।
১০. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১০৩।
১১. সূরা আল-হজ্জ, আয়াত : ২৭।
১২. সূরা আল-ক্বাছাছ, আয়াত : ৫৭।

রয়েছে তার অর্থ হ’ল মানুষের ধর্মীয় জীবনের মৌলিক ও বুনিয়াদী সকল কিছু বর্ণিত হয়েছে। এতে সকল খুঁটিনাটি বিধান পুংখানুপুংখভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া যরূরী নয়। সুতরাং কুরআনে বুনিয়াদী বিষয়াদি বর্ণিত হয়েছে আর অন্যান্য বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে সুন্নাতে সংরক্ষিত রয়েছে।

(দুই) ব্যাখ্যাগত ভুল :

ক. প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা যদি লওহ মাহফূয না করা হয়, তবে কুরআনের আয়াতটি ভুল প্রমাণিত হবে। কেননা কুরআনে দুনিয়ার সকল বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়নি; বরং কেবল ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়গুলিই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এমনকি ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি মুসলমানের মৌলিক ফরয বিষয়ের বিস্তারিত নিয়মাবলীও কুরআনে উল্লেখিত হয়নি, বরং হাদীছে এসেছে। দ্বিতীয়ত, আয়াতটি মক্কায় নাযিল হয়েছে। আর ইসলামের অধিকাংশ বিধান নাযিল হয়েছে মদীনাতে। এখানে কিতাব অর্থ কুরআন ধরে নিলে মদীনায় অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহ ব্যতীতই মক্কায় অবতীর্ণ কুরআনে সব কিছু রয়েছে প্রতীয়মান হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মদীনায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহও তাদের নিকটে হাদীছের মত অপাঙক্তেয় গণ্য হওয়ার কথা, যা নিঃসন্দেহে তাদের দৃষ্টিতেও অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং এই আয়াত দ্বারা কুরআন উদ্দেশ্য নয়, বরং লওহ মাহফূয উদ্দেশ্য।

তৃতীয়ত, যদি কিতাবের অর্থ কুরআনই ধরে নেয়া হয়, তবে আয়াতের সাধারণ অর্থটি অপর আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট করতে হবে, যেখানে বলা হয়েছে, وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ‘আমরা তোমার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি কেবল এজন্য যে, তুমি তাদেরকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিবে যেসব বিষয়ে তারা মতভেদ করে।’[১৩] অর্থাৎ রাসূল (ছা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ সকল দ্বীনী বিষয়াদির বর্ণনা সম্পন্ন করেছেন। কেননা কুরআনে বহু আয়াতে রাসূল (ছা.)-কে কুরআনের ব্যাখ্যাকার হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তিনি আল্লাহর নির্দেশে কুরআনের বাইরেও অনেক খুঁটিনাটি বিষয় মুসলিম উম্মাহকে জানিয়েছেন। বস্তুত সকল নবীকেই আল্লাহ এই বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ‘আমরা স্বজাতির ভাষাভাষী ব্যতীত কোন রাসূলকে পাঠাইনি, যাতে

১৩. সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৬৪।

তারা তাদের কাছে (আমার দ্বীন) ব্যাখ্যা করে দিতে পারে।'[১৪] সুতরাং তাঁদের প্রদত্ত সংবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁদের আদেশ-নিষেধ শ্রবণ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

খ. দ্বিতীয় আয়াতের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ২৩ বছরের দীর্ঘ নবুঅতী জীবনের কথা, কর্ম ও সম্মতিসমূহ, যা 'হাদীছ' হিসাবে সংরক্ষিত হয়েছে। আল্লাহ নিজেই কুরআনে অসংখ্যবার তাঁর রাসূল (ছা.)-এর আদেশ ও নিষেধের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا 'আমার রাসূল তোমাদের যা প্রদান করেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও।'[১৫] এখানে 'প্রদান করেন' অর্থ 'আদেশ করেন।'[১৬] একদা আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হাদীছ শুনালেন, لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ 'আল্লাহ লা'নত করেছেন ঐ সমস্ত নারীর প্রতি যারা অন্যের শরীরে উল্কি অংকন করে, নিজ শরীরে উল্কি অংকন করায়, যারা সৌন্দর্যের জন্য ভ্রুর চুল উপড়ে ফেলে ও দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে। যে সব নারী আল্লাহ্র সৃষ্টিতে বিকৃতি আনয়ন করে।' একথা বনূ আসাদের জনৈকা মহিলা উম্মে ইয়াকূবের নিকট পৌঁছলে তিনি ইবনু মাসঊদের নিকটে এসে বললেন, আপনি কি এরূপ কথা বলেছেন? ইবনু মাসঊদ বললেন, আমি কেন তাকে লা'নত করব না, যাকে আল্লাহ্র রাসূল (ছা.) লা'নত করেছেন এবং যা আল্লাহ্র কিতাবে রয়েছে? তখন মহিলাটি বলল, আমার কাছে রক্ষিত কুরআনের কোথাও একথা পাইনি। জবাবে ইবনু মাসঊদ বললেন, যদি তুমি কুরআন ভালভাবে পড়, তাহ'লে পাবে। তুমি কি দেখনি আল্লাহ বলেছেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ... 'আমার রাসূল তোমাদের যা আদেশ করেন, তা গ্রহণ কর ... *(আল-হাশর ৫৯/৭)*। তখন মহিলাটি বলল, হ্যাঁ। ইবনু মাসঊদ বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে উক্ত কাজে নিষেধ করেছেন'। তখন মহিলাটি বলল, আমার ধারণা আপনার পরিবারে এরূপ আছে। ইবনু মাসঊদ বললেন, যাও দেখে আসো। মহিলাটি ভিতরে গিয়ে তেমন কিছু না পেয়ে

---

১৪. সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৪।
১৫. সূরা আল-হাশর, আয়াত : ৭।
১৬. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯৭।

ফিরে এল। তখন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, যদি এরূপ থাকত, তাহ'লে তুমি আমাদের দু'জনকে (স্বামী-স্ত্রীকে) একত্রে পেতে না (অর্থাৎ তালাক হয়ে যেত)'।[১৭]

সুতরাং কুরআন সবকিছুর বিবরণ হওয়ার অর্থ হাদীছ অপ্রয়োজনীয় হওয়া নয়। কেননা শরী'আতের বিস্তারিত বিবরণ রাসূল (ছা.)-এর আদেশ ও নিষেধ আকারে হাদীছেই এসেছে।[১৮] আর রাসূল (ছা.)-এর আদেশ-নিষেধাবলী মূলত আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই নাযিলকৃত, যা অপর আয়াতে আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছেন- وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 'আর সে মনগড়া কথা বলে না। বরং তা-ই বলে যা তার প্রতি অহীরূপে প্রেরণ করা হয়।'[১৯] সুতরাং সুন্নাহ্র মাধ্যমেই কুরআন تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ 'সকল বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা' হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কুরআন কখনও প্রত্যক্ষ نص তথা আয়াত নাযিলের মাধ্যমে এবং কখনও পরোক্ষ دلالة বা হাদীছের মাধ্যমে দ্বীনের সকল বিষয়ের বিবরণ দিয়েছে। যেমন ইমাম শাফেঈ (২০৪হি.) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول، متشعبة الفروع 'বয়ান বা বিবরণ এমন সকল অর্থ একত্রিত করে, যা মূলনীতিগত দিক থেকে এক, তবে শাখা-প্রশাখাগতভাবে বহুবিধ।' তিনি বলেন, আল্লাহ এই বিবরণ দিয়েছেন কয়েকভাবে– (১) যা আল্লাহ নছ নাযিল করার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। যেমন মানুষের জন্য ফরয করেছেন ছালাত, যাকাত, ছিয়াম, হজ্জ প্রভৃতি, আবার হারাম করেছেন গোপন ও প্রকাশ্য পাপাচার, যিনা, মদ, মৃত ভক্ষণ, শূকরের গোশত ভক্ষণ প্রভৃতি বিষয়। (২) যা ফরয হওয়ার ব্যাপারে তাঁর কিতাবে নাযিল করেছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন তাঁর রাসূল (ছা.)-এর মাধ্যমে। যেমন ছালাতের সংখ্যা, যাকাত আদায়ের সময় প্রভৃতি বিষয়। (৩) যা রাসূল (ছা.) বিধান হিসাবে চালু করেছেন, কিন্তু আল্লাহ সে ব্যাপারে কোন নছ নাযিল করেননি। আল্লাহ যেহেতু তাঁর কিতাবে রাসূল

---

১৭. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৪৮৮৬; *ছহীহ মুসলিম*, হা/২১২৫।
১৮. দ্র. আশ-শাত্বিবী, *আল-মুওয়াফাক্বাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮০।
১৯. সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩-৪।

(ছা.)-এর আনুগত্য ফরয করেছেন এবং তাঁর হুকুম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, অতএব রাসূল (ছা.)-এর নিকট থেকে কোন বিধান গ্রহণ করা অর্থ তা স্বয়ং আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেকই গ্রহণ করা।[২০]

(তিন) যুক্তিগত ভুল :

ক. যদি কুরআনই সমস্ত কিছুর বিস্তারিত বিবরণ হয় এবং কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন না হয়, তবে কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবনের উপায় কী? নিঃসন্দেহে অভিধানে বর্ণিত শব্দার্থ দ্বারা কুরআন বুঝতে হবে। এখন প্রশ্ন আসে যে, সঠিক শব্দার্থটি জানার জন্য কোন অভিধানটি নির্ভরযোগ্য? কেননা অভিধান ভেদে শব্দার্থেও কখনও ভিন্নতা এসে থাকে। আবার কুরআনে একই শব্দ অনেক সময় বিভিন্ন অর্থ দেয়। সেক্ষেত্রে কিসের ভিত্তিতে সঠিক শব্দার্থটি নির্বাচন করতে হবে? কেউ কি এমন নিশ্চয়তা দিতে পারবে যে, শব্দার্থ দিয়ে কুরআন বুঝতে গিয়ে কেউ কুরআনের মর্মার্থই বিকৃত করে ফেলবে না? শুধু তাই নয়, অনারবদের জন্য কুরআন বুঝতে আরবী ভাষার ব্যাকরণ ও অলংকারশাস্ত্র জানা আবশ্যক। সুতরাং কুরআন বোঝার জন্য যদি অভিধান থেকে শব্দার্থ জানা এবং আরবী ব্যাকরণ জানা আবশ্যক হয়, তবে রাসূল (ছা.)-এর গৃহীত নীতি তথা সুন্নাহ সম্পর্কে জানা কি অধিকতর আবশ্যক নয়? কেননা কুরআনের বহু শব্দ আভিধানিক অর্থের পরিবর্তে রূপক অর্থ ধারণ করে। যেমন কুরআনের আয়াত, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে যুলুম (শিরক)-কে মিশ্রিত করেনি, তাদের জন্যই রয়েছে (জাহান্নাম থেকে) নিরাপত্তা এবং তারাই হেদায়াত প্রাপ্ত।'[২১] এ আয়াতে 'যুলুম' শব্দটির অর্থ কী? যদি শব্দার্থ অনুযায়ী 'অত্যাচার' অর্থ করা হয়, তবে আয়াতটির অর্থ দাঁড়াবে যে, কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত নিজের ওপর কিংবা অন্যের ওপর কোন প্রকার অত্যাচার করা মাত্রই তার ঈমান কলুষিত হয়ে যাবে এবং সে ঈমানহারা হয়ে যাবে। অথচ বাস্তবতায় তা নয়। বরং আয়াতে 'যুলুম'-এর অর্থ শিরক, যা রাসূল (ছা.) তাঁর হাদীছের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।[২২] সুতরাং সুন্নাহ ব্যতীত শুধু অভিধানের সাহায্যে কুরআন বোঝার চিন্তা একেবারেই অবান্তর ও অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনেই সকল কিছুর বিবরণ দিতে পারতেন, কিন্তু তাঁর অভিপ্রায় ভিন্ন। যেমন ছালাত হ'ল ইসলামের সবচেয়ে

২০. আশ-শাফেঈ, *আর-রিসালাহ*, পৃ. ২১-২২।
২১. সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ৮২।
২২. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৩৩৬০, ৩৪২৮ প্রভৃতি; *ছহীহ মুসলিম*, হা/১২৪।

গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। পবিত্র কুরআনের অন্তত ৭৩টি জায়গায় ছালাত আদায়ের জন্য নির্দেশ এসেছে। কিন্তু এত অধিকবার ছালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও সমগ্র কুরআনে কোথাও ছালাত আদায়ের পূর্ণাঙ্গ নিয়মাবলী উল্লেখ করা হয়নি। যেমন রুকু, সিজদা, কিয়ামসহ প্রতিটি ছালাতের সময় এবং সংখ্যা কোন কিছুরই বিবরণ কুরআনে নেই। অনুরূপভাবে ইসলামের অন্যান্য মৌলিক ইবাদত যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ্ব সম্পর্কেও কুরআনে বিস্তারিত বিবরণ নেই। একমাত্র হাদীছ বা সুন্নাহ থেকেই এ সকল ইবাদতের পূর্ণাঙ্গ নিয়মাবলী জানা যায়। এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ কুরআনে দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এর বিস্তারিত বিবরণের দায়িত্ব দিয়েছেন রাসূল (ছাঃ)-কে। সুতরাং হাদীছের মাধ্যম দিয়েই কুরআন সমস্ত কিছুর বিস্তারিত বিবরণ হয়েছে।

খ. যারা হাদীছকে শরী'আতের অংশ মনে করতে দ্বিধান্বিত হন এই যুক্তিতে যে, তাতে দ্বীনের মধ্যে বহিরাগত জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটবে, তাদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে ড. মুছত্বফা আ'যামী চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ঐ ব্যক্তির উদাহরণ হ'ল এমন ব্যক্তি, যাকে এমন একটি সুসজ্জিত প্রাসাদ দেয়া হ'ল, যার মধ্যে প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে। অতঃপর সে প্রাসাদটিতে কোন আলোর ব্যবস্থা রাখল না। তার ধারণামতে প্রাসাদটি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। সুতরাং এতে বাইরের কোন বস্তু প্রবেশ করানো যাবে না। নতুবা তা পরমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে। কেননা বৈদ্যুতিক তারগুলি বাইরের কোন জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। সুতরাং সে রাতের অন্ধকারকেই আলো ধরে নিচ্ছে, যেহেতু সে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাসাদ দেখতে চায়।[২৩]

মোটকথা নিঃসন্দেহে কুরআন تبيان এবং مفصل হিসাবে মানবজাতির জন্য মৌলিক সবকিছুই বর্ণনা করেছে; কিন্তু আল্লাহ মানবজাতির হেদায়েতের জন্য কেবল কুরআন প্রেরণ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং মানুষের নিকট কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর রাসূল (ছা.)-এর মাধ্যমে প্রেরিত কুরআনের শিক্ষাসমূহ বাস্তবায়ন পদ্ধতির নামই হ'ল সুন্নাহ। সুতরাং সুন্নাহকে নিষ্প্রয়োজন মনে করার অর্থ রাসূল (ছা.)-এর আগমনকে অর্থহীন সাব্যস্ত করা এবং তাঁর রিসালাতের উদ্দেশ্য ও মর্যাদাকে অস্বীকার করা। আর এতে রাসূল (ছা.)-কে মান্য করার কুরআনী নির্দেশকে অমান্য করা হয়, যা স্বয়ং কুরআনই অমান্য করার শামিল।

---

২৩. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *দিরাসাতুল ফীল হাদীছ আন-নববী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।

সংশয়-২. আল্লাহ কেবল কুরআন হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন, হাদীছের নয়।

তাঁদের দলীল হ'ল, আল্লাহ্র বাণী– إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 'আমরা যিক্র নাযিল করেছি এবং আমরাই এর হেফাযতকারী।'[২৪] এই আয়াতে 'যিক্র' শব্দের অর্থ হ'ল কুরআন। অর্থাৎ আল্লাহ কেবল কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, অন্য কিছু নয়। আয়াতে لَهُ সর্বনামটি একবচন নির্দেশক, যা কেবল কুরআনের প্রতিই ইঙ্গিত করে, হাদীছের প্রতি নয়। ডা. তাওফীক ছিদকী, ইসমাঈল মানছূর, জামাল বান্না এবং উপমহাদেশের হাদীছ অস্বীকারকারীগণ প্রমুখ এই দলীল পেশ করেছেন।[২৫]

পর্যালোচনা :

এখানে 'যিক্র' অর্থ শুধু 'কুরআন' নয়, বরং এর মধ্যে হাদীছও শামিল। কেননা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শরী'আতের হেফাযতকারী হ'লেন আল্লাহ। আর হাদীছ ইসলামী শরী'আতের অপরিহার্য অংশ। সুতরাং হাদীছও আবশ্যিকভাবে 'যিকর'-এর অন্তর্ভুক্ত। দলীলসমূহ নিম্নরূপ :

ক. 'যিক্র' শব্দটি দ্বারা কেবল কুরআন উদ্দেশ্য নয়, বরং হাদীছও এর অন্ত র্ভুক্ত। কেননা 'যিকর' দ্বারা আল্লাহ্র প্রেরিত দ্বীন উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ বলেন, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'সুতরাং 'আহলুয যিকর' বা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জেনে থাক।'[২৬] এই আয়াতে 'আহলুয যিক্র' বলতে 'আহলুল ইলম' বা দ্বীন বা শরী'আত বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[২৭]

ইবনু হাযম (৪৫৬হি.) বলেন, الذكر اسم واقع على كل ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم من قرآن أو من سنة وحي يبين بها القرآن

---

২৪. সূরা আল-হিজর, আয়াত : ৯।
২৫. ড. ঈমাদ আশ-শারবীনী, *আস-সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ ফী কিতাবাতি আ'দাইল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৩।
২৬. সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৪৩; সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ৭।
২৭. আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

'যিকির বলতে কুরআন ও সুন্নাহ আকারে আল্লাহ তাঁর রাসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করেছেন, সবকিছুকেই বুঝায়। সুন্নাহ্র আকারে প্রেরিত অহী দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।' অতঃপর তিনি সূরা নাহলের ৪৪ নং আয়াতটি উল্লেখ করেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ 'আমরা আপনার নিকট 'যিকর' নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আয়াতটি দ্বারা রাসূল (ছা.) মানুষের নিকট কুরআনের ব্যাখ্যা করার জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। কুরআনে অনেক 'মুজমাল' বা সংক্ষিপ্ত বিষয় রয়েছে যেমন ছালাত, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতি। যেসব বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ তাঁর নিজস্ব শব্দে আমাদেরকে জানান নি; কিন্তু রাসূল (ছা.)-এর বিবরণে তা এসেছে। সুতরাং ঐ সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলিতে যদি রাসূল (ছা.)-এর বিবরণ সংরক্ষিত না থাকে এবং তা বহিরাগত বস্তুর সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত থাকার নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত না হয়, তবে কুরআনের মূল নির্দেশ (نص) দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ অকার্যকর হয়ে যায়। এতে আমাদের ওপর ফরযকৃত শরী'আতের অধিকাংশ বিধান বাতিল পরিগণিত হবে।'[২৮]

তিনি বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে রাসূল (ছা.)-এর প্রতিটি কথাই আল্লাহ্র প্রেরিত অহী। অভিধানবিদ ও শরী'আত বিশেষজ্ঞদের নিকট এ বিষয়ে কোন প্রকার মতভেদ বা সংশয় নেই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা কিছু অহী হিসাবে নাযিল হয়েছে তা-ই হ'ল 'যিকরে মুনাযযাল' বা 'প্রেরিত উপদেশবাণী'। সুতরাং সকল প্রকার অহীই সুনিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র সংরক্ষণে সংরক্ষিত। আর আল্লাহ যার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন তা কখনো বিনষ্ট হবার নয় এবং তাতে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটার কোনই সম্ভাবনা নেই।' তিনি আরও বলেন, 'রাসূল (ছা.) দ্বীনের ব্যাপারে কোন কথা বলবেন আর তা হারিয়ে যাবে তা যেমন হ'তে পারে না, আবার তাতে কোন বহিরাগত বস্তু সংমিশ্রিত হবে, অথচ কেউ তা পৃথক করতে পারবে না, এরও কোন সুযোগ নেই। কেননা যদি এমন সুযোগ থাকত তবে 'যিকির' অসংরক্ষিত হয়ে পড়ত এবং তা হেফাযতের জন্য আল্লাহ্র দায়িত্ব গ্রহণের প্রতিশ্রুতিও মিথ্যা প্রতীয়মান হ'ত।'[২৯]

---

২৮. ইবনু হাযম, *আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২।
২৯. ইবনু হাযম, *আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১-১২২।

ইবনুল কাইয়িম (৭৫২হি.)-ও সূরা নাহলের ৪৪ নং আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন, فعلم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين كله وحي من عند الله، وكل وحي من عند الله فهو ذكر أنزله الله 'অতএব বোঝা গেল যে দ্বীনের ব্যাপারে রাসূল (ছা.)-এর সকল বক্তব্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহি। আর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রেরিত সকল অহিই হ'ল আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত 'যিকর'।[৩০]

খ. আল্লাহ বলেন, إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ - فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ - ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 'আপনি 'অহী' আয়ত্ব করার জন্য দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না'। 'নিশ্চয়ই তা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের'। 'অতএব যখন আমরা (জিব্রীলের মাধ্যমে) তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন'। 'অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমাদেরই।'[৩১] এখানে 'বিশদ ব্যাখ্যা' অর্থ সম্পর্কে ইবনু কাছীর (৭৭৪হি.) বলেন, أي بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه ونلهمك معناه على ما أردنا وشرعنا 'হিফয ও তিলাওয়াত সম্পন্নের পর আমরা কুরআনের অর্থ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করব এবং অহী বা ইলহামের মাধ্যমে আমরা এর উদ্দেশ্য ও শারঈ বিধান জানিয়ে দেব।'[৩২] সুতরাং 'বিশদ ব্যাখ্যা' হ'ল 'হাদীছ', যা অহী ও ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর নবীকে প্রদান করেছেন। অতএব কুরআন ও হাদীছ দু'টিরই হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্র।

গ. আয়াতে لَهُ শব্দের সর্বনামটি 'সীমাবদ্ধতা' (الحصر)-এর অর্থ দেওয়ার জন্য আসেনি, অর্থাৎ এর দ্বারা এককভাবে কেবল কুরআনকেই উদ্দেশ্য করা হয়নি। বরং এর ব্যাখ্যায় আব্দুল গনী আব্দুল খালিক (১৯৮৩খ্রি.) বলেন, আল্লাহ কুরআন ছাড়াও অনেক কিছুই সংরক্ষণ করেছেন। যেমন আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছা.)-কে যাবতীয় ষড়যন্ত্র এবং হত্যা প্রচেষ্টা থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি আরশ, আসমান-যমীন সংরক্ষণ করেছেন ক্বিয়ামত পর্যন্ত। সুতরাং সর্বনামটি সীমাবদ্ধতার অর্থ দেয় না এবং ব্যাকরণগতভাবে সর্বনামটির تقديم وتأخير

---

৩০. ইবনুল কাইয়িম, *মুখতাছারুছ ছাওয়াঈক আল-মুরসালাহ*, পৃ. ৫৫৯।
৩১. সূরা আল-ক্বিয়ামাহ, আয়াত : ১৬-১৯।
৩২. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৯৭।

হওয়ার উদ্দেশ্যও সীমাবদ্ধ অর্থ প্রদান করা নয়, বরং আয়াতের বিন্যাস অক্ষুণ্ন রাখা। তিনি আরও বলেন যে, যদি সর্বনামটি দ্বারা সীমাবদ্ধতার অর্থও গ্রহণ করা হ'ত, তবুও সেই কারণে আয়াতের ব্যাপকার্থ থেকে সুন্নাহ বাদ পড়ত না। কেননা কুরআনের সংরক্ষণ সুন্নাহ্র সংরক্ষণের ওপর নির্ভরশীল এবং সুন্নাহ্র সংরক্ষণের মাঝেই কুরআনের সংরক্ষণ নিহিত। অতএব সুন্নাহ্ও এই আয়াতের মধ্যে ব্যাপকার্থে শামিল হবে এবং আল্লাহ সুন্নাহকেও তেমনিভাবে হেফাযত করেছেন, যেমনভাবে কুরআনকে হেফাযত করেছেন। ফলে সুন্নাহ্র কোন কিছুই হারিয়ে যায় নি, যদিও তা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এককভাবে রক্ষিত নেই।[৩৩]

ঘ. যুক্তিগতভাবেও প্রমাণিত হয় যে, 'যিক্র' দ্বারা আয়াতে কুরআনের সাথে হাদীছও উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা কুরআনের সাথে কুরআনের ব্যাখ্যা হেফাযত করাও অপরিহার্য। যদি আল্লাহ শুধু কুরআন সংরক্ষণ করতেন এবং কুরআনের ব্যাখ্যা তথা হাদীছ সংরক্ষণ না করতেন, তবে অপব্যাখ্যাকারীদের হাতে অচিরেই স্বয়ং কুরআন বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধনের শিকার হ'ত এবং স্বার্থবাজ ব্যক্তিগণ যা খুশি তাই রচনা করে রাসূল (ছা.)-এর নামে চালিয়ে দিত। এতে ইসলাম ধর্মও ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মের মত বিকৃত হয়ে পড়ত, যারা নিজ হাতে ধর্মগ্রন্থ রচনা করে বলেছিল যে, এটি আল্লাহ্র কিতাব, অথচ তা আল্লাহ্র কিতাব ছিল না।[৩৪] সুতরাং নিঃসন্দেহে আল্লাহ কুরআনকে যেমন সংরক্ষণ করেছেন, তেমনি তার ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীছও সংরক্ষণ করেছেন। আর সংরক্ষণ করেছেন বলেই ইসলাম ধর্ম ইহুদী এবং খৃষ্টান ধর্মের মত বিকৃতি কিংবা বিলুপ্তির শিকার হয়নি। আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ 'অতঃপর আল্লাহ নিজ অনুমতিতে মুমিনদেরকে হেদায়াত দিলেন যে বিষয়ে তারা (পথভ্রষ্ট আহলে কিতাবরা) মতবিরোধ করছিল।'[৩৫]

ঙ. ঐতিহাসিকভাবে যদি বিশ্লেষণ করা হয়, তবে এটি নিশ্চিতভাবে প্রতীয়মান হবে যে, রাসূল মুহাম্মাদ (ছা.)-এর সুন্নাহ তথা তাঁর জীবন ও কর্মের আলেখ্য মুসলমানদের নিকট যেরূপ গুরুত্ব ও মর্যাদা পেয়েছে তা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন রাষ্ট্রনায়ক, চিন্তানায়ক, সেনানায়কের ভাগ্যে জোটেনি।

---

৩৩. আব্দুল গনী আব্দুল খালিক, *হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ*, পৃ. ৩৯০-৩৯১।
৩৪. ইবনুল কাইয়িম, *মুখতাছারুছ ছাওয়াঈক আল-মুরসালাহ*, পৃ. ৫৭০।
৩৫. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত : ২১৩।

ছাহাবী, তাবেঈ এবং তৎপরবর্তীকালের মুসলমানগণ অত্যন্ত আগ্রহ ও তৎপরতার সাথে রাসূল (ছা.)-এর প্রতিটি কথা, কর্ম ও অনুমোদন পুংখানুপুংখভাবে সংরক্ষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এ সকল বিবরণের বিশুদ্ধতা এবং প্রকৃত ব্যাখ্যা নির্ণয়ের জন্য নিয়োজিত হয়েছেন হাজারো বিদ্বান। পৃথিবীর আর কোন মানুষের জীবনী এত সূক্ষ্ম ও সুবিস্তৃতভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি। সুতরাং এই বিশাল কর্মযজ্ঞ যদি কোন কিছুর ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে, তা হ'ল এটাই যে, আল্লাহ মুসলিম উম্মাহ্‌র এই তৎপরতার মাধ্যমে তাঁর রাসূল (ছা.)-এর সমগ্র জীবনীই আয়নার মত হেফাযত করেছেন, যা 'সুন্নাহ' বা 'হাদীছ' হিসাবে ছাহাবীদের স্মৃতি ও লেখনীর মারফৎ কেয়ামত পর্যন্ত জন্য কুরআনের ন্যায় সংরক্ষিত হয়ে আছে।[৩৬]

সংশয়-৩. হাদীছ আল্লাহ্‌র অহী নয়।

মুনকিরে হাদীছ আব্দুল্লাহ চড়কালভী বলেন, আমরা অহী ব্যতীত অন্য কিছু মানতে আদিষ্ট হইনি। যদি তর্কসাপেক্ষে ধরে নেই যে, কিছু হাদীছ সুনিশ্চিতভাবে রাসূল (ছা.) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে, তবুও তার অনুসরণ করা অপরিহার্য নয়। কেননা তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত অহী নয়। অনুরূপভাবে গোলাম আহমাদ পারভেয বলেন, 'অহী দুই ভাগে বিভক্ত' এই বিশ্বাস ইহুদীদের নিকট থেকে ধার করা। তারাও একই বিশ্বাস করে যে অহী দুই প্রকার। পঠিত অহী (Shaktab) এবং অপঠিত অহী (Shab-alfa)। এই ধারণার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।[৩৭]

পর্যালোচনা :

ক. কুরআনে সূরা আন-নাজমের ৩-৪ আয়াত এবং সূরা আল-হাক্কাহ্‌র ৪৪-৪৭ আয়াতে স্পষ্টভাবে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, রাসূল (ছা.) দ্বীনের বিষয়ে যা কিছু বলেন, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই বলেন এবং তা আল্লাহ্‌র অহি। এর ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, আল-কুরআন যেমন রাসূল (ছা.)-এর নিকট অহী সূত্রে প্রেরিত হয়েছে, তেমনিভাবে তিনি সুন্নাহ্‌ও অহী সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছেন।[৩৮] উভয় প্রকার অহির মধ্যে পার্থক্য কেবল এই যে, আল-কুরআন শব্দগতভাবে

---

৩৬. ড. ঈমাদ আশ-শারবীনী, *আস-সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ ফী কিতাবাতি আ'দাইল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪-২১৫।

৩৭. খাদিম ইলাহী বখশ, *আল-কুরআনিউন ওয়া শুবহাতুহুম*, পৃ. ২১৩-২১৪।

৩৮. আল-কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন*, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৮৫; ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪১১।

নাযিল হয়েছে এবং তা ছালাতে তেলাওয়াত করা হয়। সেই সাথে আল্লাহ তা শব্দগতভাবেও কোন প্রকার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন থেকে সংরক্ষণ করেছেন। কিন্তু হাদীছের ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। তা জিব্রীলের মাধ্যমে সরাসরি শব্দাকারে নাযিল হয়নি, বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহামের মাধ্যমে অর্থগতভাবে প্রেরিত হয়েছে। যেমনভাবে আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 'কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন, অহীর মাধ্যম, পর্দার আড়াল অথবা কোন দূত প্রেরণ ব্যতিরিকে।'[৩৯] অর্থাৎ রাসূল (ছা.) কুরআন ছাড়াও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম সূত্রে প্রাপ্ত অহির মাধ্যমে মানুষের দ্বীনী বিষয়ের সমাধান দিতেন। পবিত্র কুরআনে এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। যেমন-

(১) সূরা আত-তাহরীমের ৩ আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ 'আর যখন নবী তার এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিলেন; অতঃপর যখন সে (স্ত্রী) অন্যকে তা জানিয়ে দিল এবং আল্লাহ তার (নবীর) কাছে এটি প্রকাশ করে দিলেন তখন নবী কিছুটা তার স্ত্রীকে অবহিত করলেন আর কিছু এড়িয়ে গেলেন। যখন তিনি তাকে বিষয়টি জানাল তখন সে (স্ত্রী) বলল, 'আপনাকে এ সংবাদ কে দিল?' সে বলল, 'মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন।'

এই আয়াতে স্পষ্ট হয় যে, রাসূল (ছা.) তাঁর কোন স্ত্রীকে একটি গোপন কথা বলেছিলেন, যা তিনি অসুবিধা নেই ভেবে অন্যদের নিকট ফাঁস করে দিয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছা.)- কে তাঁর স্ত্রীর এই কর্মটি জানিয়ে দিলেন এবং রাসূল (ছা.) স্ত্রীকে বিষয়টি স্বল্পাকারে উল্লেখ করে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন স্ত্রী বিস্মিত হয়ে এই তথ্যের উৎস রাসূল (ছা.)-এর নিকট জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'আমাকে জানিয়েছেন আল্লাহ।' এই ঘটনায় রাসূল (ছা.) তাঁর স্ত্রীকে কী বলেছিলেন, আর তাঁর স্ত্রী অন্যদের নিকট কী ফাঁস করেছিলেন কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। এখন প্রশ্ন হ'ল, এই অনুল্লেখিত বিষয়গুলো কি পরবর্তীতে কুরআন থেকে বিলুপ্ত করা হয়েছে, নাকি রাসূল (ছা.)-কে আল্লাহ ভিন্ন প্রকার অহী (গায়র মাতলূ)-এর মাধ্যমে

---

৩৯. সূরা আশ-শূরা, আয়াত : ৫১।

জানিয়েছিলেন? যদি বলা হয় কুরআন থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেটা অসম্ভব। সুতরাং এটা অপরিহার্য হয়ে যায় যে, রাসূল (ছা.) অপঠিত অহির দ্বারা সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

(২) সূরা আল-বাক্বারাহ্‌র ১৪৪ আয়াতে আল্লাহ বলেন, قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 'আকাশের দিকে তোমার মুখ বার বার ফিরানো আমি অবশ্যই দেখছি। অতএব আমি অবশ্যই তোমাকে এমন কিবলার দিকে ফেরাব, যা তুমি পছন্দ কর। সুতরাং তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও.. ।'

এই আয়াতে মুসলমানদের প্রথম ক্বিবলা বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে পরিবর্তিত হয়ে কা'বা ঘরের দিকে নির্ধারণের ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল, আয়াতের বর্ণনামতে দ্বিতীয় ক্বিবলা নির্ধারণের পূর্বে প্রথম ক্বিবলা হিসাবে আল্লাহ বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সেই নির্ধারণের কোন দলীল কি কুরআনে রয়েছে? যদি না থাকে, তার অর্থ হ'ল আল্লাহ প্রথম ক্বিবলা সম্পর্কে রাসূল (ছা.)-কে অহী গায়র মাতলু (হাদীছ) দ্বারা অবগত করিয়েছিলেন।

সুতরাং নিঃসন্দেহে হাদীছও আল্লাহ্‌র অহী যা ইলহামের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছা.)-এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আর এ কারণেই ছাহাবীগণ রাসূল (ছা.)-এর সকল আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য মনে করে পালন করতেন, যদিও তা কুরআনে না থাকত। তাঁর মৃত্যুর পরও যখনই রাসূল (ছা.)-এর কোন সুন্নাহ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন, তৎক্ষণাৎ তার প্রতি চুড়ান্ত আনুগত্যের মস্তক অবনত করেছেন, যদিও সে বিষয়ে কুরআনে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা নেই।

রশীদ রিযা (১৯৩৫খ্রি.) বলেন, রাসূল (ছা.) হ'তে দ্বীনের ব্যাপারে যে সকল হাদীছ ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে ব্যাপকার্থে আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত বিধানে মধ্যেই শামিল। কেননা আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল (ছা.)-এর অনুগত্য করা ও তাঁর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁকে মানুষের নিকট দ্বীনের বাণী প্রচারক হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। যেমন তাঁকে বলা হয়েছে, 'আমরা আপনার নিকট 'যিকর' নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের ব্যাখ্যা করে দেন, যা তাদের জন্য

নাযিল করা হয়েছে।'[৪০] অতঃপর তিনি বলেন, والجمهور على أن الأحكام الشرعية الواردة في السنة موحى بها، وأن الوحي ليس محصورا في القرآن 'জুমহূর বিদ্বানদের মতে সুন্নাতে বর্ণিত শরী'আতের আহকামসমূহ আল্লাহ্র অহী। আর অহী কেবল কুরআনের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।'[৪১]

খ. হাদীছ অস্বীকারকারীদের ধারণা- পঠিত এবং অপঠিত অহির ধারণা ইহুদীদের নিকট থেকে ধার করা হয়েছে। এর স্বপক্ষে নিছক কষ্টকল্পনা ব্যতীত কোন প্রকার দলীল তারা দেয়নি। কে কখন কিভাবে এই ধারণা ইহুদীদের নিকট থেকে ইসলামে প্রবেশ করিয়েছে, তারও কোন প্রমাণ দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর কোন মুসলিম, অমুসলিম বিদ্বান বা ঐতিহাসিক এই অভিনব দাবী উত্থাপন করেন নি। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার কোন কারণ নেই। অপরপক্ষে মুসলিম বিদ্বানগণের বক্তব্য সুস্পষ্ট দলীলভিত্তিক। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 'আর সে মনগড়া কথা বলে না। বরং তা-ই বলে যা তার প্রতি অহীরূপে প্রেরণ করা হয়।'[৪২] আল্লাহ আরও বলেন, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 'আর আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমাত (সুন্নাহ) এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। আর তোমার উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ রয়েছে মহান।'[৪৩] রাসূলুল্লাহ (ছা.) স্পষ্টভাবে বলেন, أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ– وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ 'জেনে রাখো! আমি কুরআন প্রাপ্ত হয়েছি ও তার ন্যায় আরেকটি বস্তু (হাদীছ)। সাবধান! এমন একটি সময় আসছে যখন বিলাসী মানুষ তার গদিতে বসে বলবে, তোমাদের জন্য এ কুরআনই যথেষ্ট। সেখানে যা হালাল পাবে, তাকেই হালাল জানবে এবং সেখানে যা হারাম পাবে, তাকেই হারাম জানবে। অথচ আল্লাহ্র রাসূল যা হারাম করেছেন তা আল্লাহ কর্তৃক হারাম করার অনুরূপ।'[৪৪]

---

৪০. সূরা আন-নাহল, আয়াত : ৪৪।
৪১. রশীদ রিযা, *তাফসীরুল মানার*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪।
৪২. সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩-৪।
৪৩. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১১৩।
৪৪. *মুসনাদ আহমাদ*, হা/১৭১৭৪, *সুনান আবী দাউদ*, হা/৪৬০৪; সনদ ছহীহ।

সংশয়-৪ : আল্লাহ কুরআনকে সহজ করেছেন।

তাদের মতে, আল্লাহ্র বাণী– وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ‘আমরা কুরআনকে সহজ করেছি উপদেশ লাভের জন্য। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?[৪৫] এই আয়াত থেকে প্রমাণিয়ত হয় যে, কোরআন বোঝার জন্য হাদীছের প্রয়োজন নেই।

পর্যালোচনা :

এখানে কুরআন সহজ হওয়ার অর্থ হ’ল, এতে বর্ণিত জীবন-বিধান সহজ-সরল ও বাস্তবায়নযোগ্য। যেমন ছালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, ছিয়াম রাখা, হজ্জ করর, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, অন্যায় ও অশ্লীলতা হ’তে দূরে থাকা ইত্যাদি। এগুলি যেকোন সাধারণ কুরআন পাঠক সহজে বুঝতে পারেন। কিন্তু কুরআন অনুধাবনের অর্থ তা নয়। যেমন আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন, كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ– ‘এই কিতাব যা আমরা আপনার নিকট নাযিল করেছি, তা বরকতমণ্ডিত। তা এজন্য নাযিল করেছি যাতে লোকেরা এর আয়াতসমূহ গবেষণা করে এবং জ্ঞানীরা এ থেকে উপদেশ হাছিল করে।’[৪৬] তিনি জ্ঞানীদের তিরস্কার করে বলেন, أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوْبٍ أَقْفَالُهَا؟ ‘কেন তারা কুরআন গবেষণা করে না? নাকি তাদের হৃদয়সমূহ তালাবদ্ধ?’[৪৭] কুরআন গবেষণা ও তার মর্ম অনুধাবন ও তা থেকে বিধি-বিধান নির্ধারণ ও উপদেশ আহরণের জন্য প্রয়োজন কুরআনের ভাষা ও অলংকার সম্পর্কিত জ্ঞানে পরিপক্কতা অর্জন করা ও অন্যান্য যরূরী বিষয়ে দক্ষতা লাভ করা। বস্তুত, কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাকারী হ’লেন রাসূলুল্লাহ (ছা.)। অতঃপর ছাহাবায়ে কেরাম, যাদের কাছে তিনি কুরআন বর্ণনা করেছেন, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করেছেন ও উপদেশ প্রদান করেছেন, যা লিপিবদ্ধ আছে ‘হাদীছ’ ও ‘আছার’ আকারে। অতএব কুরআন অনুধাবনের জন্য হাদীছের ব্যাখ্যা জানা অত্যাবশ্যক।

দ্বিতীয়ত, কুরআন সহজ হওয়ার অর্থ যদি এটাই হয় যে, এর কোন ব্যাখ্যা বা তাফসীরের প্রয়োজন নেই, তবে রাসূল (ছা.)-এর আগমণের হেতু

---

৪৫. সূরা আল-ক্বামার, আয়াত : ১৭, ২২, ৩২, ৪০।
৪৬. সূরা ছোয়াদ, আয়াত : ২৯।
৪৭. সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২৪।

কী ছিল? মানুষের পক্ষে কি নিজেই সবকিছু বুঝে নেওয়া সম্ভব ছিল না? কেন আল্লাহ তাঁর রাসূলকে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী[৪৮] হিসাবে প্রেরণ করলেন?

সংশয়-৫ : আল্লাহ্র বিধান তথা কুরআনই চূড়ান্ত।

মুনকিরে হাদীছ খাজা আহমাদ দ্বীন বলেন, 'মানুষ শিরককে জীবিত করার জন্য বহু পথ আবিষ্কার করেছে। তারা বলে যে, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ হ'লেন মূল সত্তা, যিনি আনুগত্যের হক্বদার। তবে আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল (ছা.)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (ছা.)-এর অনুসরণ হ'ল মূল সত্তার আনুগত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই ভ্রষ্ট দলীলের মাধ্যমে তারা যাবতীয় প্রকারের শিরকের বৈধতা দিয়ে থাকে। কোন অপরিচিত ব্যক্তি কি কোন বিবাহিত মহিলার স্বামী হয়ে যায়, যদি মহিলার স্বামী তাকে সেই অপরিচিত ব্যক্তির স্ত্রী বলে? সাবধান! আল্লাহ কখনই এমন নির্দেশ দেননি। কেননা আল্লাহ্র বাণী হ'ল, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ 'বিধান দেওয়ার অধিকার কেবল আল্লাহ্র।'[৪৯] অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিতে রাসূল (ছা.)-এর আনুগত্য করার অর্থ আল্লাহ্র আনুগত্যে শিরক করা।

পর্যালোচনা :

এই আয়াত দ্বারা রাসূল (ছা.)-এর আনুগত্য নাকচ করা হয়নি, কিংবা রাসূল (ছা.)-এর আনুগত্য করা শিরকও নয়। স্রেফ অজ্ঞতার কারণে এরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। দলীলসমূহ নিম্নরূপ :

ক. আয়াতটি পবিত্র কুরআনে মোট ৩টি স্থানে এসেছে। প্রতিটিই ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। যেমন প্রথমে সূরা আল-আন'আমে আয়াতটি বর্ণিত হয়েছে কাফেররা তাঁর নিকট কুরআনের আয়াত নাযিল করার জন্য চাপ প্রয়োগের প্রেক্ষিতে। এই আয়াত নাযিলের মাধ্যমে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই দাবী পূরণ করা রাসূল (ছা.)-এর আয়ত্তাধীন নয়, বরং আল্লাহ্র আয়ত্তাধীন। এ ব্যাপারে আল্লাহ এক এবং একক। পরের দু'টি আয়াত এসেছে সূরা ইউসুফে। প্রথম স্থানে ইউসুফ (আ.) তাঁর জেলখানার সহবন্দী দু'জনকে শিরক পরিত্যাগের উপদেশ দিয়ে আয়াতটি পাঠ করেছিলেন এবং পরবর্তী স্থানে ইয়াকুব (আ.) তাঁর সন্তানদেরকে রাজার দরবারে প্রবেশের আদব-কায়দা শেখানোর সময় তাদের ওপর কোন বিপদের আশংকা থেকে আল্লাহ্র

---

৪৮. সূরা নাহল, আয়াত : ৪৪।
৪৯. সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ৫৭; সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৪০, ৬৭।

প্রতি নির্ভরতাসূচক আয়াতটি পাঠ করেছিলেন। প্রতিটি স্থানে মানুষের অক্ষমতা এবং আল্লাহ্র সর্বময় ক্ষমতার কথা উদ্ভাসিত হয়েছে, যার কোন শরীক নেই। কিন্তু এসকল আয়াতে সুন্নাহ অনুসরণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাসূচক কিছু নেই। এতে শিরকের প্রসঙ্গ তো নেই-ই, বরং তাওহীদই প্রকাশিত হয়। কেননা আল্লাহ নিজেই তাঁর রাসূল (ছা.)-এর আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাঁর নির্দেশকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা কারোও নেই। আল্লাহ বলেন, أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ 'সাবধান! হুকুম প্রদানের ক্ষমতা তাঁরই। আর তিনি হচ্ছেন খুব দ্রুত হিসাবকারী।'[৫০] সুতরাং এই নির্দেশ মান্য করাই তাওহীদ এবং অমান্য করাই শিরক। কেননা এতে রাসূল (ছা.)-এর অনুসরণের এলাহী নির্দেশকে উপেক্ষা করে শরী'আত প্রণয়ন ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব আল্লাহ্র রাসূল ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া হয়, যার অধিকার আল্লাহ কাউকে দেননি। সুতরাং আল্লাহ্র ব্যাপারে এই অনধিকার চর্চাই বরং শিরক হিসাবে পরিগণিত হবে।

খ. রাসূল (ছা.)-এর অনুসরণ যদি শিরক হয়, তবে প্রশ্ন আসে যে, রাসূল (ছা.) তবে কিসের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন? তিনি কি শিরক প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীতে এসেছিলেন? তাঁর সুন্নাহসমূহ কি আল্লাহ্র বিধান প্রতিষ্ঠারই নিমিত্ত নয়? আল্লাহ বলেন, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ' অতএব আপনার রবের কসম তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে বিচারক নির্ধারণ করে, আর আপনি যে ফায়ছালা দেবেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।'[৫১] এই আয়াতে আল্লাহ নিজের কসম খাওয়ার পর রাসূল (ছা.)-এর ফয়ছালা অনুসরণের যে হুকুম প্রদান করলেন, তা কি শিরকের প্রতি আহ্বান? অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহই কি শিরকের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন? যদি তা অসম্ভব হয়, তবে রাসূল (ছা.)-এর আনুগত্যের মাঝেই বরং তাওহীদের দাবী প্রতিষ্ঠিত হয়। কেননা এই আনুগত্য সরাসরি আল্লাহ্রই হুকুম। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে এই আনুগত্যের নির্দেশ এসেছে যা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে দেখেছি। সুতরাং নিঃসন্দেহে রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ্র আনুগত্য করা অপরিহার্য এবং তা প্রকৃতপক্ষে তাওহীদেরই বহিঃপ্রকাশ।

---

৫০. সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ৬২।
৫১. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৬৫।

সংশয়-৬ : রাসূল (ছা.) কেবল কুরআনের প্রচারক ছিলেন।

মুনকিরে হাদীছদের দাবী, রাসূল (ছা.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কেবল কুরআনের প্রচারক ছিলেন। তিনি কোন বিধান প্রবর্তক ছিলেন না। তিনিও অন্যান্য মানুষের মত কুরআন অনুসরণের জন্য আদ্দিষ্ট ছিলেন। এর প্রমাণে অন্যান্য আয়াতের সাথে রাসূল (ছা.) বর্ণিত কিছু হাদীছও দলীল হিসাবে পেশ করা হয়। যেমন রাসূল (ছা.) ছহীহ মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীছে মন্তব্য করেন, وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله 'আমি তোমাদের নিকট ছেড়ে যাচ্ছি এমন একটি বস্তু যা ধারণ করলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। আর সেটি হ'ল আল্লাহ্‌র কিতাব।'[৫২] এছাড়া রাসূল (ছা.) তাঁর মৃত্যুশয্যায় থাকা অবস্থায় বললেন, 'আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় লিখে দিতে চাই, যার পরে তোমরা আর পথভ্রষ্ট হবে না।' অতঃপর উমার (রা.) উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, রাসূল (ছা.) এখন তীব্র যন্ত্রণায় আক্রান্ত। তোমাদের নিকট কুরআন রয়েছে। আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট (وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله)।[৫৩] সুতরাং এসব থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছা.)-এর অনুসরণ কুরআনের ভিত্তিতেই প্রযোজ্য। তিনি কুরআন প্রচারের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন, হাদীছ নয়।

পর্যালোচনা :

ক. রাসূল (ছা.)-কে কেবল কুরআন প্রচারক হিসাবে আল্লাহ প্রেরণ করেননি; বরং মানবজাতির জন্য শিক্ষক হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি সমাজের বুকে কুরআনের শিক্ষাসমূহ সার্বিকভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন, যা হাদীছ হিসাবে সংরক্ষিত হয়ে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 'বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও

৫২. *ছহীহ মুসলিম*, হা/১২১৮।
৫৩. *ছহীহ মুসলিম*, হা/১৬৩৭।

হিকমাত (সুন্নাহ) শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।'[৫৪] এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, রাসূল (ছা.) কেবল কুরআন তেলাওয়াতকারী ছিলেন না, বরং মানবজাতির শিক্ষক হিসাবে তিনি তাদেরকে হাতে-কলমে শিক্ষাও প্রদান করেছেন। কেননা যদি শুধুমাত্র কুরআন পড়ে শুনানোই রাসূল (ছা.)-এর দায়িত্ব হ'ত তাহ'লে يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ বলাই যথেষ্ট হ'ত, পুনরায় وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ বলার প্রয়োজন ছিল না।

খ. আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 'আর সে মনগড়া কথা বলে না। বরং তা-ই বলে যা তার প্রতি অহীরূপে প্রেরণ করা হয়।'[৫৫] এই আয়াতে (النطق) বা কথা বলার অর্থ কুরআন তিলাওয়াত নয়, বরং নবীর নিজের মুখের ভাষা। আর দ্বীন সংক্রান্ত তাঁর যে কোন কথাই হাদীছ। এ বিষয়ে কুরআনে অসংখ্য প্রমাণ মওজূদ রয়েছে।

গ. উপস্থাপিত হাদীছসমূহে কুরআনকে উল্লেখ করা হয়েছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে (على وجه التغليب), যেহেতু কুরআন শরী'আতের প্রধানতম উৎস। ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (৮৫২হি.) বলেন, রাসূল (ছা.) তাঁর এই বক্তব্যে কেবল কুরআনকে উল্লেখ করেছেন এই জন্য যে, কুরআন হ'ল সর্বপ্রধান, বাকীগুলো তার অনুগামী। আর তাতে সকল কিছুর বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে, হয় সরাসরি নছের মাধ্যমে কিংবা ইস্তিম্বাত (অন্যান্য দলীলের ভিত্তিতে বিধি-বিধান নির্ণয় করা)-এর মাধ্যমে। মানুষ যখন কুরআনের নির্দেশ অনুসরণ করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাকে রাসূল (ছা.)-এর নির্দেশসমূহও অনুসরণ করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও।'[৫৬]

ঘ. কুরআনের অন্যান্য বহু আয়াতে রাসূল (ছা.)-এর আনুগত্যের নির্দেশ স্পষ্টতই সাক্ষ্য দেয় যে, এই আনুগত্য কেবল কুরআনের পাঠকারী হিসাবে তাঁর আনুগত্য নয়, বরং শরীআ'তের ব্যাখ্যাদানকারী হিসাবে তাঁর আনুগত্য। নতুবা তাঁর আনুগত্যের বিশেষ কোন মূল্য থাকত না এবং প্রকারান্তরে তাঁর

---

৫৪. সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৬৪।
৫৫. সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩-৪।
৫৬. সূরা আল-হাশর, আয়াত : ৭; ইবনু হাজার আসক্বালানী, *ফাতহুল বারী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১।

আনুগত্য করার নির্দেশ অর্থহীন হয়ে যেত। কেননা এর ফলে কুরআনের পাঠকারী হিসাবে তিনি এবং সাধারণ পাঠকের মাঝে কোনই পার্থক্য থাকত না। যা নিঃসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য। অতএব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত মানবজাতির শিক্ষক হিসাবে রাসূল (ছা.)-এর শিক্ষা বা সুন্নাহ্‌ও কুরআনের মতই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্যভাবে অনুসরণীয়।

সংশয়-৭ : রাসূল (ছা.) হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন।

প্রাথমিক এবং আধুনিক যুগের হাদীছ অস্বীকারকারীদের সবচেয়ে বড় দলীল হ'ল, রাসূল (ছা.) প্রথমাবস্থায় হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছিলেন। তাদের মতে, হাদীছ যদি ইসলামী আইনের উৎস বা দলীল হ'ত, তাহ'লে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নবী বা ছাহাবীগণ তার লিখন, সংকলন এবং হেফাযতের ব্যবস্থা নিতেন– যেমনভাবে কুরআনের ক্ষেত্রে নিয়েছিলেন। গোলাম আহমাদ পারভেয বলেন, 'সুন্নাহ যদি দ্বীনের অংশ হ'ত, তবে রাসূল (ছা.) নিশ্চয়ই কুরআনের মত হাদীছ সংরক্ষণের জন্যও লিপিবদ্ধকরণ, মুখস্তকরণ বা পাঠদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেন। দ্বীনের এই বৃহৎ অংশটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় হ'তেন না। কেননা নবুঅতের অবস্থান থেকে উম্মাহ্‌র জন্য দ্বীনকে সংরক্ষিতভাবে প্রদানই কাম্য ছিল। কিন্তু রাসূল (ছা.) কেবল কুরআনের জন্যই সংরক্ষণের যাবতীয় ব্যবস্থা নিলেন, অথচ হাদীছের জন্য কোন কিছুই করেননি। উপরন্তু হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছেন এ মর্মে যে, 'তোমরা আমার নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিখে নিও না। যদি কেউ আমার থেকে কুরআন ভিন্ন কিছু লিপিবদ্ধ করে, তবে তা যেন মুছে ফেলে।'[৫৭]

এ সম্পর্কে তারা রাসূল (ছা.)-এর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীছসমূহ উপস্থাপন করেন এবং যে সকল ছাহাবী এবং তাবেঈ হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে অনাগ্রহ পোষণ করতেন কিংবা নিষেধ করতেন তাদেরকেও তারা দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন। বিশেষত খুলাফায়ে রাশিদীন যেমন আবূ বকর, উমার এবং আলী (রা.)-এর বর্ণনাসমূহ। কেননা আবূ বকর সম্পর্কে এমন বর্ণনা

---

৫৭. আবু সাঈদ আল-খুদরী বর্ণিত, রাসূল (ছা.) বলেন, لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني، ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (*ছহীহ মুসলিম*, হা/৩০০৪)। দ্র. ড. খাদিম ইলাহী বখশ, *আল-কুরআনিউন ওয়া শুবহাতুহুম*, পৃ. ২২৩-২২৪।

এসেছে যে, তিনি পাঁচশত হাদীছ লিপিবদ্ধ করার পর তা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। আর উমার (রা.) ছিলেন হাদীছ বর্ণনার ঘোর বিরোধী এবং দীর্ঘ একমাস ইস্তিখারার পর তিনি হাদীছ সংকলন না করার সিদ্ধান্ত নেন। আলী (রা.)-ও অনুরূপভাবে বিরোধী ছিলেন। আর রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ লিখনের আদেশসূচক হাদীছসমূহ তারা দুর্বল মনে করেন, কিংবা নিষেধাজ্ঞার হাদীছটি দ্বারা আদেশসূচক হাদীছসমূহ রহিত হয়েছে মনে করেন।

পর্যালোচনা :

রাসূল (ছা.) হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে সাময়িক নিষেধ করেছিলেন, তবে পরবর্তীতে অনুমতি দিয়েছিলেন, যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। নিম্নে উপরোক্ত দাবীসমূহ খণ্ডন করা হ'ল।

ক. হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ সম্পর্কে রাসূল (ছা.) হ'তে মোট ৩টি নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদীছ এসেছে, যেগুলি আবূ সাঈদ আল-খুদরী, আবূ হুরায়রা এবং যায়েদ ইবনু ছাবিত (রা.) বর্ণনা করেছেন। তবে একমাত্র আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি ব্যতীত অন্যগুলি যঈফ।[৫৮] আর এই হাদীছটিও মারফূ' হওয়া নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। ইমাম বুখারী বলেন, এটি মাওকূফ হওয়াই ছহীহ।[৫৯] এতদ্ব্যতীত ছাহাবী এবং তাবেঈগণ হ'তে কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে লিপিবদ্ধ করার বিরুদ্ধে, যার মধ্যে কিছু বর্ণনা ছহীহ রয়েছে এবং কিছু যঈফও রয়েছে। কিন্তু এসকল হাদীছের বিপরীতে রাসূল (ছা.) হ'তে হাদীছ লিখনের অনুমতি ও নির্দেশসূচক হাদীছ রয়েছে এবং একইভাবে ছাহাবী ও তাবেঈদের পক্ষ থেকেও লেখনীর অনুমতিসূচক অসংখ্য হাদীছ পাওয়া যায়। ড. মুছত্বফা আল-আ'যামী ৫২ জন ছাহাবীর তালিকাসহ ১ম হিজরী শতকে হাদীছ লিপিবদ্ধকারী জ্যেষ্ঠ ৫৩ জন তাবেঈ এবং কনিষ্ঠ ২৫২ জন তাবেঈ'র তালিকা বৃত্তান্ত সহকারে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে তাদের হাদীছ লেখনীর অনুমোদন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।[৬০]

খ. হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ সম্পর্কে এই পরস্পরবিরোধী বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে বিদ্বানদের বক্তব্য হ'ল প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায়

---

৫৮. ড. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৮; আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী, *আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ*, পৃ. ৩৪-৪৩; রিফ'আত ফাওযী, *তাওছীকুস সুন্নাহ ফিল ক্বারনিছ ছানী আল-হিজরী*, পৃ. ৪৬।

৫৯. ইবনু হাজার আসক্বালানী, *ফাতহুল বারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮; খত্বীব বাগদাদীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন (*তাক্বয়ীদুল ইলম*, পৃ. ৩১)।

৬০. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪-৩২৫।

রাসূল (ছা.) হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। তবে সে আশংকা বিদূরিত হওয়ার পর তিনি লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দেন। অপর একদল বিদ্বানের মতে, আদেশের হাদীছগুলি দ্বারা নিষেধের হাদীছটি মানসূখ হয়ে গেছে।[৬১] আর ছাহাবী ও তাবেঈগণ যেমন আবূ বকর (রা.), উমার (রা.), আলী (রা.), আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.), আবূ হুরায়রা (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) প্রমুখ ছাহাবীগণ মূলত মানুষের মুখস্থ ছেড়ে লেখনীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া এবং ভুলের মধ্যে নিপতিত হওয়ার শংকা থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা অধিকাংশই এই অবস্থান থেকে সরে এসেছিলেন এবং তাঁদের পক্ষ থেকেও হাদীছ লিপিবদ্ধ করার দলীল পাওয়া গেছে।[৬২] সুতরাং হাদীছ লিপিবদ্ধকরণে রাসূল (ছা.)-এর নিষেধাজ্ঞা এবং ছাহাবী ও তাবেঈদের বিরূপভাব সবই ছিল একটি সাময়িক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। আর হাদীছ সংরক্ষণের প্রশ্নে তাদের মধ্যে বিতর্ক হয়নি, বরং বিতর্ক ছিল কেবল সংরক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে অর্থাৎ তা মুখস্থকরণের মাধ্যমে হবে নাকি লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে। ইমাম নববী বলেন, ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف অর্থাৎ '(প্রাথমিক দ্বিধাগ্রস্থতার পর) মুসলমানরা লেখনীর বৈধতার ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেন এবং এ বিষয়ে মতপার্থক্য দূর হয়ে যায়।'[৬৩] সুতরাং এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা যদি নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি বহাল থাকত তবে ছাহাবীরা কখনই হাদীছ লিপিবদ্ধ করতেন না।

গ. মিসরীয় বিদ্বান রশীদ রিযা এ ব্যাপারে একক ব্যক্তি যিনি ভিন্নমত পোষণ করেন যে, রাসূল (ছা.)-এর নিষেধাজ্ঞার হাদীছটি দ্বারা আদেশসূচক হাদীছসমূহ রহিত হয়েছে।[৬৪] এর পক্ষে তিনি দু'টি দলীল পেশ করেছেন। (১)

৬১. দ্র. ইবনু কুতায়বা আদ-দীনাওয়ারী, *তা'বীলু মুখতালাফিল হাদীছ*, পৃ. ৪১২; খত্বীব আল-বাগদাদী, *তাক্বয়ীদুল ইলম*, পৃ. ৫৭; শামসুদ্দীন আস-সাখাভী, *ফাতহুল মুগীছ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯; ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, *ফাতহুল বারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮; জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৫; আব্দুল গনী আব্দুল খালিক, *হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ*, পৃ. ৪৪৪; আবূ যাহু, *আল-হাদীছু ওয়াল মুহাদ্দিছূন*, পৃ. ১২৩-১২৪)।

৬২. খত্বীব আল-বাগদাদী, *তাক্বয়ীদুল ইলম*, পৃ. ৩৬-৪৩, ৪৯-৬১, ৮৭-৯৮; মুছত্বফা আল-আ'যামী, *দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৩।

৬৩. মুহিউদ্দীন আন-নববী, *আল-মিনহাজ শারহু মুসলিম*, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ১৩০।

৬৪. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯।

নবীর মৃত্যুর পর কতিপয় ছাহাবীর হাদীছ লেখনী থেকে বিরত থাকা এবং অন্যদেরকে নিষেধ করা। (২) ছাহাবীদের হাদীছ সংকলন এবং তা প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ না করা। কেননা যদি তাঁরা সংকলন করতেন এবং প্রচার করতেন, তবে তাদের সংকলনসমূহ 'মুতাওয়াতির' সূত্রে আমাদের নিকট পৌঁছাতো।[৬৫] রশিদ রিযার এই ধারণা সঠিক নয়, যা পূর্বেই স্পষ্ট করা হয়েছে। ছাহাবী ও তাবেঈগণের সময়কালে হাদীছ কীভাবে সংরক্ষিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে মুহাদ্দিছগণের হাদীছ সংগ্রহ ও বর্ণনা পদ্ধতি কী ছিল সে সম্পর্কে কোন ধারণা ব্যতীত তিনি এই মন্তব্য করেছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

ঘ. রাসূল (ছা.) যে হাদীছে লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন, সেই একই হাদীছের শেষাংশে উল্লেখ করা হয়েছে যে, وحدثوا عني، ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 'তবে তোমরা আমার পক্ষ থেকে (যা শোন তা) বর্ণনা কর, তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়।'[৬৬] অর্থাৎ লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে এর দ্বারা হাদীছ বর্ণনা করা অর্থাৎ হাদীছের প্রামাণিকতাকে নাকচ করা মোটেও উদ্দেশ্য ছিল না।[৬৭]

ঙ. ছাহাবীগণের মধ্যে আবূ বকর (রা.) ও উমার (রা.) হাদীছ বর্ণনার কঠোর বিরোধী ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। একথার কিছুটা বাস্তবতা থাকলেও সর্বাংশে সত্য নয়। যেমন আবূ বকর (রা.) তাঁর নিজের কাছে লিখিত পাঁচশত হাদীছের পাণ্ডুলিপিটি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন মর্মে আয়েশা (রা.) বর্ণিত প্রসিদ্ধ কাহিনীটি বিশুদ্ধ নয়;[৬৮] বরং তিনি নিজেই বাহরাইনের গভর্নর আনাস ইবনু মালিক (রা.) এবং আমর ইবনুল আছ (রা.)-এর নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন, যাতে রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ লিখিত ছিল।[৬৯] তবে আবূ মুলাইকা থেকে মুরসাল সূত্রে একটি বর্ণনা এসেছে যে, রাসূল (ছা.)-এর মৃত্যুর পর আবূ

---

৬৫. রশীদ রিযা, '*আত-তাদভীন ফিল ইসলাম*' (*মাজাল্লাতুল মানার*; কায়রো, ১০ম খণ্ড : শাওয়াল/১৩২৫হি. সংখ্যা), পৃ. ৭৬৭।

৬৬. *ছহীহ মুসলিম*, হা/৩০০৪।

৬৭. ড. আব্দুল গনী আব্দুল খালিক, *হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ*, পৃ. ৪২৩-৪২৪।

৬৮. শামসুদ্দীন ইবনুল জাযারী, *আন-নাশরু ফিল কিরাআতিল আল-আশরি* (মিসর : আল-মাতবা'আহ আত-তিজারিয়াহ আল-কুবরা, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

৬৯. ড. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪।

বকর (রা.) মানুষকে একত্রিত করে বললেন, إنكم تحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافا فلا تحدثوا عن رسول الله شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه 'তোমরা রাসূল (ছা.) থেকে হাদীছ বর্ণনা করছ এবং তাতে বিভিন্নতা করছ। মানুষ তোমাদের পর আরও বেশী মতভেদ করবে। অতএব রাসূল (ছা.) হ'তে কোন কিছু বর্ণনা করো না। তোমাদের নিকট কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে তোমরা বলে দাও, আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র কিতাব। অতএব তাতে যা হালাল করা হয়েছে তা হালাল মনে কর এবং যা হারাম করা হয়েছে তা হারাম কর।'[৭০] আবূ বকর (রা.)-এর এই বর্ণনাটি যদি বিশুদ্ধ হয় তবে এর উদ্দেশ্য এমন হ'তে পারে যে, মতপার্থক্যের সময় অধিক হাদীছ বর্ণনা থেকে সতর্ক করা। কেননা এতে রাসূল (ছা.) যে অর্থে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, সে ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হ'তে পারে। এজন্য বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর ইমাম যাহাবী (৭৪৮হি.) বলেন, أن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري لا سد باب الرواية 'এর মাধ্যমে আবূ বকর (রা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে অধিক যাচাই-বাছাই ও সতর্কতা অবলম্বন করা। তিনি হাদীছ বর্ণনার দুয়ার বন্ধ করেননি।' এর প্রমাণ হ'ল দাদীর সম্পত্তি বিষয়ক রাসূল (ছা.)-এর হাদীছটি যখন তাঁর নিকট উল্লেখিত হয়েছিল তিনি নির্দ্বিধায় কবুল করে নিয়েছিলেন। তিনি খারিজীদের মত একথা বলেননি যে 'আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবই যথেষ্ট।'[৭১]

অনুরূপভাবে উমার (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে যে, তিনি হাদীছ সংকলনকর্ম শুরু করার ব্যাপারে ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। ছাহাবীরা তাঁকে হাদীছ সংকলনের ব্যাপারে ইতিবাচক পরামর্শ দিলেন। অতঃপর উমার (রা.) একমাস ব্যাপী ইস্তিখারা করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহসমূহ লিখে রাখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার স্মরণ হ'ল যে, পূর্ববর্তী কওমরা আল্লাহ্‌র কিতাব ছেড়ে দিয়ে নিজেদের লেখা কিতাবসমূহে

---

৭০. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯।
৭১. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯।

মজে গিয়েছিল। অতএব আল্লাহ্‌র কসম আমি আল্লাহ্‌র কিতাবের সাথে অন্য কিছুর মিশ্রণ ঘটাব না।[৭২] এছাড়া আরও কিছু বর্ণনা রয়েছে যেমন :

-তিনি মানুষের কাছে রক্ষিত হাদীছের পাণ্ডুলিপিসমূহ পুড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ফরমান পাঠিয়েছিলেন যে, অনুরূপ কোন পাণ্ডুলিপি থাকলে তা মুছে ফেলতে হবে।[৭৩]

-তিনি আবূ হুরায়রা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, তুমি অবশ্যই হাদীছ বর্ণনা পরিত্যাগ করবে, নতুবা তোমাকে দাওসের ভূখণ্ডে (নির্বাসনে) পাঠিয়ে দেব।[৭৪]

-তিনি কা'ব আল-আহবারকে বলেছিলেন যে, তুমি হাদীছ বর্ণনা ছাড়বে, নতুবা তোমাকে কুরদা নামক এলাকায় (নির্বাসনে) প্রেরণ করব।[৭৫]

-তিনি আবূ যার, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ এবং আবুদ দারদা (রা.)- কে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমরা রাসূল (ছা.) থেকে বেশী বেশী হাদীছ বর্ণনা করছ কেন? অতঃপর তাদেরকে মদীনায় বন্দী করে রাখলেন।[৭৬]

-আবূ হুরায়রা (রা.) বলতেন, আমি এমন অনেক হাদীছ বর্ণনা করি, যা উমার (রা.)-এর যুগে বর্ণনা করলে আমার মাথা কাটা যেত। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, উমার (রা.)-এর মৃত্যুর পূর্বে আমরা 'আল্লাহ্‌র রাসূল (ছা.) বলেছেন' এ কথা বলতে পারতাম না। আমরা তাঁর চাবুককে ভয় করতাম।[৭৭]

এই বর্ণনাসমূহের মধ্যে কেবল প্রথম বর্ণনাটি ছহীহ। বাকি বর্ণনাগুলোর সূত্র সবই যঈফ কিংবা বিচ্ছিন্ন, যা দলীলযোগ্য নয়।[৭৮] প্রথম বর্ণনাটি বরং হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের পক্ষেই একটি দলীল। কেননা ছাহাবীরা উমার (রা.)- কে লিপিবদ্ধ করার পরামর্শই দিয়েছিলেন। কিন্তু উমার (রা.) তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ মোতাবেক কেবল কুরআন লিপিবদ্ধ করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চেয়েছিলেন। এর পিছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে। যেমন :

---

৭২. আল-বায়হাক্বী, *আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা* (কুয়েত : দারুল খুলাফা, তাবি), পৃ. ৪০৭, হা/৭৩১; ইবনু আব্দিল বার্র, *জামিঊ বায়ানিল ইলম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৪; খত্বীব আল-বাগদাদী, *তাকয়ীদুল ইলম*, পৃ. ৪৯।

৭৩. খত্বীব আল-বাগদাদী, *তাকয়ীদুল ইলম*, পৃ. ৫১-৫৩।

৭৪. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০০-৬০১।

৭৫. তদেব।

৭৬. *মুসতাদরাক হাকিম*, হা/৩৭৪; আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৫।

৭৭. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০২-৬০৩।

৭৮. আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী, *আল-আনওয়ার আল-কাশিফাহ*, পৃ. ১৫৪-১৫৫; মুছত্বফা আল-আ'যামী, *দিরাসাত ফীল হাদীছ আন-নববী*, ১ম খণ্ড, ১৩৩-১৩৪।

(১) তিনি কুরআনকে যথাযথভাবে সংরক্ষণকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেই সাথে হাদীছ মানুষের অন্তরে মুখস্থ থেকে যাওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। যেন মানুষ উভয়টির মাঝে সংমিশ্রণ না ঘটিয়ে ফেলে।[৭৯]

(২) তিনি এই সিদ্ধান্ত তৎকালীন মানুষের অবস্থার প্রেক্ষিতে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি চাননি দূর-দূরান্তের বিভিন্ন রাজ্যের নতুন নতুন ইসলামগ্রহণকারী মানুষ কোন বিভ্রান্তিতে পড়ে যাক এবং কুরআন ও হাদীছকে সংমিশ্রিত করে ফেলুক। সেজন্য বিচক্ষণতার সাথে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি কেবল কুরআনকেই মানুষের অন্তরে গেঁথে দিতে চেয়েছিলেন এবং সুন্নাহকে তার আপন গতিতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।[৮০]

(৩) তিনি হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে যে কড়াকড়ি করতেন, তা কেবল হাদীছের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য। এর প্রমাণ হ'ল উমার (রা.) ও আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)-এর মধ্যকার প্রসিদ্ধ ঘটনাটি[৮১], যেখানে তিনি উমার (রা.)- কে তিনবার সালাম দিয়ে না পেয়ে ফিরে এসেছিলেন এবং উমার (রা.) তাঁর এই কর্মের ব্যাপারে দলীল ও সাক্ষী তলব করেন। অবশেষে সাক্ষী হিসাবে আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)- কে পাওয়ার পর তিনি হাদীছটি কবুল করেন। উমার (রা.) ঐ ঘটনার পর আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)- কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে দোষী বানাতে চাই নি, কিন্তু আমি ভয় পাই যে, মানুষ রাসূল (ছা.)-এর নামে হাদীছ রটনা করা শুরু করবে'।[৮২]

---

৭৯. আবূ যাহু, *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন*, পৃ. ২৩৪।

৮০. তদেব, পৃ. ১২৬।

৮১. *ছহীহুল বুখারী*, হা/২০৬২, ৬২৪৫; *ছহীহ মুসলিম*, হা/২১৫৩।

৮২. أما إني لم أتهمك. ولكني خشيت أن يتقول الناস على رسول الله صلى الله عليه وسلم. –*মুওয়াত্ত্বা মালিক* (তাহক্বীক : মুছত্বফা আল-আ'যামী), হা/৩৫৪০। অন্য বর্ণনায় এসেছে - والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أحببت أن أستثبت 'আল্লাহর কসম! আমি রাসূল (ছা.)-এর হাদীছের যিম্মাদারী নিয়ে বসতে চাই না, বরং কেবল বর্ণনার যথার্থতা নিশ্চিত হ'তে চেয়েছিলাম।' –ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী,*ফাতহুল বারী*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩০। অনুরূপ অন্য এক ঘটনায় উবাই ইবনু কা'ব (রা.) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, হে উমার! আপনি রাসূল (ছা.)-এর ছাহাবীদের ওপর আযাব হয়ে দাঁড়াবেন না। তখন উমার (রা.) বলেন, سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت 'সুবহানাল্লাহ! আমি তো কেবল যে বিষয়টি শুনেছিলাম, তা পরখ করে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম' (প্রাগুক্ত, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩০)।

(৪) তিনি হাদীছকে যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে মানুষের মনে ভয় ঢুকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। যেন রাসূল (ছা.)-এর নামে নিজের ইচ্ছামত কেউ যেন কিছু বলতে সাহস না করে। ফলে পরবর্তীরা যেন এই শিক্ষা নেয় যে, উমার (রা.) হাদীছ বর্ণনার ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল (ছা.)-এর মর্যাদাবান ছাহাবীদের ওপর যখন এত কড়াকড়ি করেছেন, তখন তাদের জন্য বিষয়টি কত কঠিন হতে পারে। আর শয়তানের প্ররোচনায় রাসূল (ছা.)-এর নামে কোন মিথ্যা রটনা করার পরিণাম কত ভয়ংকর হতে পারে।[৮৩]

(৫) ইবনু কাছীর (৭৭৪হি.) বলেন, উমার (রা.)-এর কড়াকড়ি সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ এই অর্থে গ্রহণ করতে হবে যে, তিনি এমন হাদীছ বর্ণনার বিষয়ে শংকিত ছিলেন যা মানুষ ভুল বুঝে ভুল স্থানে ব্যবহার করতে পারে। আর কেউ যখন বেশী হাদীছ বর্ণনা করে তখন স্বভাবতই ভুল বা প্রমাদের আশংকা থাকে। ফলে মানুষ সেই ভুলটিই সঠিক ভেবে গ্রহণ করে বসতে পারে।[৮৪]

সুতরাং আবূ বকর (রা.) ও উমার (রা.) সম্পর্কে প্রাপ্ত বর্ণনাসমূহ হাদীছ অস্বীকারের পিছনে কোন দলীল হ'তে পারে না। কেননা এগুলো প্রায় সবই দুর্বল বর্ণনা। আর যেগুলি ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। উপরন্তু এ সকল বর্ণনা যদি বিশুদ্ধও হ'ত তবুও কোন ছাহাবী বা তাবেঈ'র ব্যক্তিগত মতামতের কারণে ইসলামী শরী'আতে সুন্নাহ্‌র অবস্থান নিঃসন্দেহে দুর্বল হয় না। কেননা সুন্নাহ্‌র মর্যাদা কুরআন দ্বারাই সুপ্রতিষ্ঠিত।[৮৫]

চ. ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, প্রাথমিক যুগে কুরআনের মত আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীছ সংকলনের উদ্যোগ না নেয়ার প্রধান কারণ ছিল, কুরআনের মত হাদীছের কোন নির্দিষ্ট সীমানা ও চৌহদ্দি ছিল না। কেননা রাসূল (ছা.)-এর পুরো জীবনচিত্রই হল হাদীছের বিষয়বস্তু। প্রত্যেক ছাহাবী

---

৮৩. খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.) বলেন, وفي تشديد عمر أيضا على الصحابة، وفي روايتهم حفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترهيب لمن لم يكن من الصحابة أن يدخل في السنن ما ليس منها، لأنه إذا رأى الصحابي المقبول القول، المشهور بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تشدد عليه في روايته، كان هو أجدر أن يكون للرواية أهيب، ولما يلقي الشيطان في النفس من تحسين الكذب أرهب। দ্র. খত্বীব আল-বাগদাদী, *শারফু আছহাবিল হাদীছ*, পৃ. ৯১।

৮৪. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৬।

৮৫. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *দিরাসাতুন ফীল হাদীছ আন-নববী*, পৃ. ৮০।

রাসূল (ছা.)-কে যতটুকু দেখেছেন ও শুনেছেন, তাঁর ভিত্তিতেই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর এই ছাহাবীদের সংখ্যাও ১ লক্ষের কম ছিল না। ফলে দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অবস্থানকারী ছাহাবীদের বর্ণিত সমস্ত হাদীছ একত্রিত করা ও গ্রন্থাবদ্ধ করার জন্য স্বভাবতঃই দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সকল ছাহাবী এক সাথে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং রাসূল (ছা.)-এর সাথে সমানভাবে সহাবস্থান করেননি। কেউ আগে মৃত্যুবরণ করেছেন, কেউ পরে। কেউবা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সেসকল স্থানে তাঁদের ছাত্র ও শিষ্যদের কাছে বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে হাদীছ বর্ণনা করেছিলেন। সুতরাং হাদীছের এক বিশাল ভাণ্ডার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সেসকল হাদীছ একত্রিত করা এবং গ্রন্থাবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল দূরদূরান্ত সফর করার। ফলে লেখনীর অপ্রচলন এবং যোগাযোগব্যবস্থার অপ্রতুলতার সেই যুগে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে কাজ আঞ্জাম দেয়া অসম্ভবই ছিল। ধীরে ধীরে বছরের পর বছর মুহাদ্দিছদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সংমিশ্রণের আশংকার ব্যাপারে অবিশ্বাস্য সতর্কতা অবলম্বনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হাদীছ শাস্ত্র সংকলিত ও গ্রন্থাবন্ধ হয়।

তৃতীয়ত, যেহেতু রাসূল (ছা.)-এর যিন্দেগীর সুদীর্ঘ ২৩ বছরের পুরো সময়কাল পর্যন্ত হাদীছের গণ্ডি সুবিস্তৃত, কাজেই তার সমস্ত কথা, আমল, অনুমতি ও স্বীকৃতিসমূহ কাগজে বা খেঁজুর পাতায় এক জায়গায় লিখে সুরক্ষিত করে রাখা কঠিন, বরং অসম্ভব কাজ ছিল। কেননা এমন বিশালাকার কাজের জন্য বহু সংখ্যক ছাহাবীর অব্যাহত প্রচেষ্টার প্রয়োজন হ'ত। আর এটা সর্বজনবিদিত যে, রাসূল (ছা.)-এর জীবদ্দশায় লেখকের সংখ্যাও ছিল বেশ অপ্রতুল। সুতরাং যে কয়জন লেখক ছিলেন, তারা কেবল রাসূল (ছা.)-এর স্থায়ী মু'জিযা তথা কুরআন লিপিবদ্ধ করার কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আর সুন্নাহ্র ক্ষেত্রে তারা ব্যক্তিগত এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে কিছু লিখিত সংকলন করলেও মূলত তাঁর প্রদর্শিত পথে চলা এবং তাঁর বাণীসমূহ মুখস্থকরণের উপরই অধিকতর গুরুত্বারোপ করেছিলেন।[৮৬]

চতুর্থত, প্রাথমিক যুগে কুরআন সংকলন এবং কুরআনের প্রচারই ছিল ছাহাবীদের মনোযোগের প্রধান কেন্দ্রস্থল। কেননা কুরআন ইসলামী শরী'আতের মূল ভিত্তি। তাছাড়া কুরআন তিলাওয়াত করা হয় এবং এর ভাষা,

---

৮৬. আব্দুল গনী আব্দুল খালিক, *হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ*, পৃ. ৪২৩; আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ৫৮-৫৯।

শব্দ ও বর্ণ সবকিছুই সুনির্দিষ্ট, যাতে কোন প্রকার আক্ষরিক পরিবর্তন-পরিবর্ধনের বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। সুতরাং কুরআনকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়াই ছিল ছাহাবীদের নিকট মুখ্য বিষয়। অতঃপর ওছমান (রা.)-এর যুগে কুরআন সংরক্ষণপর্ব পুরোপুরি নিশ্চয়তার সাথে সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত মুসলমানরা ভিন্ন দিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পায়নি।

জ. যুক্তিগত দিক থেকে বলা যায় যে, কোন জিনিস দলীলযোগ্য হওয়ার জন্য লিপিবদ্ধ হওয়া শর্ত নয়। এর প্রমাণ হ'ল স্বয়ং কুরআন। কুরআন যে অকাট্য দলীল হিসাবে গৃহীত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে নয়, বরং শব্দগতভাবে তা আমাদের নিকট অসংখ্য বিশ্বস্ত সূত্রে (التواتر اللفظي) পৌঁছানোর কারণে। অর্থাৎ কুরআন যদি লিপিবদ্ধ নাও থাকত তবুও তা আমাদের নিকট অকাট্য দলীল হ'ত। সুতরাং লিপিবদ্ধ হওয়া কুরআনের গুরুত্বপূর্ণ কোন বৈশিষ্ট্য নয়। ড. আব্দুল গণি আব্দুল খালিক (১৯৮৩খ্রি.) বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে উদাহরণ দিয়ে বলেন যে, প্রথম যে বস্তু বা বস্তুসমূহের ওপর সরাসরি অহির বাণী লিপিবদ্ধ হয়েছিল, সেই বস্তুর কোন সন্ধান কি এখন পাওয়া যায়? তবে আমরা কিসের ভিত্তিতে নিশ্চিত হচ্ছি যে, আমাদের নিকট রক্ষিত কুরআন প্রকৃতই অহির ভিত্তিতে নাযিলকৃত কুরআন? কিসের ভিত্তিতে আমরা নিশ্চিত হচ্ছি যে, তাতে কোন প্রকার রদবদল হয়নি? এই নিশ্চয়তা পেয়েছি কেবলমাত্র সত্যবাদী এবং ন্যায়পরণতায় বিশ্বস্ত একদল বিরাট সংখ্যক মানুষের প্রদত্ত সংবাদের মাধ্যমে, যাদের কোন মিথ্যার ওপর ঐক্যমত হওয়া সম্ভব নয়। অতঃপর প্রত্যেক যুগে ধারাবাহিকভাবে বিশ্বস্ত সংবাদদাতাদের মাধ্যমে আমরা মূলসূত্র তথা মূল যে দলটি হাদীছ লিখন কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেছিলেন, তাদের নিকট পৌঁছাতে পারি এবং নিশ্চিত হতে পারি যে, এটিই সেই মূল কুরআনের অনুলিপি। অনুরূপভাবে যারা প্রথম কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন কিংবা লিপিবদ্ধ হ'তে দেখেছিলেন, তারাও কুরআনকে অকাট্য দলীল হিসাবে গ্রহণের ব্যাপারে লিপিবদ্ধ কুরআনের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কেননা তাঁরা তো সরাসরি রাসূল (ছা.) থেকেই কুরআন শ্রবণ করেছিলেন এবং লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব থেকেই শ্রবণসূত্রে কুরআন তাঁদের নিকট অকাট্য দলীল ছিল।

দ্বিতীয়ত, কুরআনের সকল অনুলিপি তৈরী হয়েছিল মূলত একটি পাণ্ডুলিপি থেকে যেটি যায়েদ ইবনু ছাবিত (রা.) প্রস্তুত করেছিলেন। সুতরাং

কিসের ভিত্তিতে আমরা নিশ্চিত হচ্ছি যে যায়েদ ইবনু ছাবিত (রা.)-এর প্রস্তুতকৃত এই একক পাণ্ডুলিপিতে যা কিছু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা যথার্থই রাসূল (ছা.)-এর ওপর নাযিলকৃত কুরআন? এই নিশ্চয়তা পাওয়ার একমাত্র উপায় হ'ল, ছাহাবীগণ সকলেই তাঁদের স্মৃতির ভিত্তিতে এর সত্যতা এবং বিশুদ্ধতার ব্যাপারে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সুতরাং একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, লিপিবদ্ধ হওয়া প্রাথমিক দলীল নয়, এটি একটি সহযোগী দলীল মাত্র।[৮৭]

তৃতীয়ত, যারা মনে করেন যে, লিপিবদ্ধ হলেই কেবল দলীলযোগ্য হয় তারা এই প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন যদি কোন ইহুদী বা খৃষ্টান এসে তাদেরকে বলেন যে, কুরআন প্রামাণ্য গ্রন্থ নয়, কেননা সেটি আসমান থেকে লিখিতভাবে নাযিল হয়নি। যদি কুরআন প্রামাণ্য দলীলই হ'ত, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ গুরুত্ব সহকারে তা লিখিত আকারে নাযিল করতেন, যেমনটি তাওরাত ও ইঞ্জিলের ক্ষেত্রে করেছেন? এর উত্তর আমরা এভাবে দেই যে, প্রথমত রাসূল (ছা.)-এর নিষ্পাপত্ব এবং তাঁর নিকট হ'তে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণই আমাদের নিকট দলীল। এই বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের বর্ণনা যখন আমাদের নিকট মুতাওয়াতির সূত্রে পৌঁছে তখন আমরা সেটি নিশ্চিত দলীল হিসাবে গ্রহণ করি। আর হাদীছ অস্বীকারকারীগণ যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চান তবে তাদেরকে স্বীকার করতেই হবে যে, লিপিবদ্ধ হওয়া দলীল হওয়ার জন্য শর্ত নয়। বরং বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ের হওয়া বা বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত হওয়ার মাধ্যমেই দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়, যদিও তা খবর ওয়াহিদ হয়। কেননা কুরআন লিপিবদ্ধ আকারে প্রেরিত হয়নি; বরং রাসূল (ছা.) হ'তে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীদের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। আর এটা যদি তারা স্বীকার করে নেন, তবে নিঃসন্দেহে তারা এ কথা বলার সুযোগ পাবেন না যে, কুরআনই কেবল দলীল, হাদীছ দলীল নয়; কেননা তা প্রাথমিক যুগে লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয়নি।[৮৮]

ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (৮৫২হি.) বলেন, والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم '(ওছমান রা.)-এর কুরআনের মুছহাফসমূহ প্রেরণের মধ্য দিয়ে এটিই কেবল প্রতীয়মান হয় যে, কুরআনের লিখিত রূপটির সনদসূত্র

---

৮৭. দ্র. ড. আব্দুল গনী আব্দুল খালিক, *হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ*, পৃ. ৪০৭-৪০৯।
৮৮. দ্র. ড. আব্দুল গনী আব্দুল খালিক, *হুজ্জিয়াতুস সুন্নাহ*, পৃ. ৪০০-৪০১।

ওছমান (রা.) পর্যন্ত সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু এটি মূল কুরআন হওয়ার প্রমাণ বহন করে না; বরং কুরআন তাদের নিকট মুতাওয়াতির সূত্রেই প্রমাণিত ছিল।’[৮৯]

ইবনুল জাযারী (৮৩৩হি.) বলেন, إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ المصاحف والكتب، وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة،...وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب ولا يقرءونه كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب ‘কুরআনের হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি লিখিত কিতাব বা মুছহাফের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং হৃদয়ে মুখস্থ ধারণের ওপর নির্ভরশীল। এটিই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই মুসলিম জাতির জন্য সবচেয়ে মর্যাদাবান বৈশিষ্ট্য। ... এটি আহলুল কিতাবদের বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা যারা তাদের কিতাব একমাত্র লিপিবদ্ধ উপায়ে সংরক্ষণ করে এবং কেবল দেখে দেখে পাঠ করে; মুখস্থ পাঠ করে না।’[৯০]

ঝ. যদি প্রাথমিক অবস্থায় কুরআনের প্রচার ও প্রসার সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই সুন্নাহ্র আনুষ্ঠানিক সংকলন শুরু হ’ত তবে কুরআনের সাথে সুন্নাহসহ মানুষের মতামতও কুরআনের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে যেত। ফলে পুরো ইসলামী শরী‘আত দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা তৈরী হ’ত। সুতরাং নিঃসন্দেহে প্রথম পর্যায়ে সুন্নাহ লিপিবদ্ধ না হওয়ার পিছনে মহান আল্লাহ্র বিশেষ কোন হিকমত নিহিত ছিল। ড. হাম্মাম আব্দুর রহীম বলেন, যদি এটা না হ’ত তবে কুরআনের আয়াতের ওপর ব্যাখ্যা ও মতামতের স্তূপ জমে যেত। ফলে কুরআন লিপিবদ্ধকারক এবং পরবর্তীদের জন্য কুরআনের সাথে সুন্নাহ ও ফক্বীহদের রায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা দুষ্কর হয়ে পড়ত। পূর্ববর্তী নবীদের গ্রন্থসমূহে এই ঘটনাই ঘটেছিল। ফলে খাঁটি বস্তুর সাথে মানুষের কল্পিত জিনিস, ভুলের সাথে সঠিক, স্বপ্নের সাথে অহী সব মিলেমিশে একাকার হয়ে শেষ পর্যন্ত মূলবস্তুটিই হারিয়ে যেত এবং সংযোজন-পরিবর্ধনের মাঝে চাপা পড়ে যেত। ফলে অহীর নিজস্বতা এবং সুমহান তাৎপর্য আর অবশিষ্ট থাকত না। যেমনভাবে ইহূদী এবং খৃষ্টানদের নিকট অহী স্রেফ একটি ইতিহাসের বয়ান হয়ে পড়েছে তথা যা কিছু ইতিহাসে ঘটেছে সবই অহীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।’[৯১]

---

৮৯. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, *ফাতহুল বারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪।
৯০. তদেব।
৯১. ড. হাম্মাম আব্দুল হালীম সাঈদ, *আল-ফিকরুল মানহাজী ইনদাল মুহাদ্দিছীন*, পৃ. ৪০-৪১।

সংশয়-৮ : হাদীছ অনেক দেরীতে সংকলন শুরু করা হয়েছিল।

তারা মনে করেন, হাদীছ ২য় হিজরী শতাব্দীর পূর্বে সংকলিত হয়নি। কেননা উমর ইবনু আব্দিল আযীয তাঁর শাসনামলে (৯৯-১০১হি.) সর্বপ্রথম হাদীছ সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন। সুতরাং রাসূল (ছা.)-এর জীবনকাল থেকে প্রায় ৮০ বছর পর সংকলন শুরু হওয়ায় হাদীছ তার নির্ভেজাল রূপে সংকলিত হয়নি; বরং তাতে আহলুল কিতাবদের গ্রন্থসমূহের মত নানা ভুল-ভ্রান্তি এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে। যেহেতু ছাহাবীদের আমলে হাদীছ সংকলন হয়নি, অতএব পরবর্তী যুগের লোকেরা তাতে অনেক মিথ্যা হাদীছের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। সুতরাং হাদীছের বিশুদ্ধতার ওপর আস্থা রাখা যায় না। ড. আহমাদ আমীন, মাহমূদ আবূ রাইয়াহ, মুছত্বফা আল-মাহদূভী, আহমাদ ছুবহী মানছূরসহ প্রায় সকল হাদীছ অস্বীকারকারী এই আপত্তি পেশ করেছেন। প্রাচ্যবিদ গোল্ডজিহের, জোসেফ শাখত প্রমুখও এই মতের প্রবক্তা।[৯২]

পর্যালোচনা :

২য় অধ্যায়ে আমরা রাসূল (ছা.)-এর জীবদ্দশায় এবং ছাহাবীদের যুগে ধারাবাহিক হাদীছ সংকলনের প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরেছি, যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, হাদীছ সংকলন আনুষ্ঠানিকভাবে ২য় শতাব্দী হিজরীর শুরুতে হলেও প্রাথমিক ধাপে তার প্রস্তুতি অনানুষ্ঠানিকভাবে কয়েকটি ধারায় রাসূল (ছা.) জীবদ্দশাতেই শুরু হয়েছিল। সুতরাং হাদীছ অস্বীকারকারীদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। নিম্নে তাদের বক্তব্যসমূহ খণ্ডন করা হ'ল।

ক. ইবনু শিহাব আয-যুহরীকে সর্বপ্রথম হাদীছ সংকলক বলা হয়, যিনি উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দিল আযীয (১০১হি.)-এর নির্দেশক্রমে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীছ সংকলন শুরু করেন।[৯৩] ইমাম মালিক (১৭৯হি.) বলেন, أول من دون العلم ابن شهاب 'প্রথম যিনি হাদীছ সংকলন করেন তিনি হ'লেন ইবনু শিহাব আয-যুহরী (১২৪হি.)।'[৯৪] কিন্তু এখানে তাঁকে প্রথম সংকলক বলতে কী বুঝানো হয়েছিল, তা জানা প্রয়োজন। এজন্য প্রথমত

---

৯২. দ্র. ড. ঈমাদ আস-সাইয়েদ আশ-শারবীনী, *আস-সুন্নাহ আন-নববিয়াহ ফী কিতাবাতি আ'দাইল ইসলাম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭।

৯৩. ইবনু আব্দিল বার্র, *জামিঊ বায়ানিল ইলম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২০, ৩৩১।

৯৪. আবু নাঈম আল-আছবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

লক্ষ্যণীয় হ'ল دون বা تدوين শব্দটি। ইবনু মানযূর (৭১১হি.) বলেন, الديوان: مجتمع الصحف 'দীওয়ান শব্দের অর্থ হ'ল ছহীফা বা ছোট ছোট লিখিত পাণ্ডুলিপির সমষ্টি।'[৯৫] আয্-যাবীদী (১২০৫হি.) বলেন, دَوَّنَهُ تَدْوِيناً: جَمَعَهُ অর্থাৎ জমা করা বা একত্রিত করা।[৯৬] অর্থাৎ এখানে সংকলক অর্থ লিপিবদ্ধকারক নয় বরং বিক্ষিপ্ত লিখিত বস্তুসমূহ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জমাকারী। সুতরাং ইবনু শিহাব আয-যুহরী ছিলেন প্রথম লিখিত হাদীছের পাণ্ডুলিপিসমূহ একত্রকারী। এই অর্থটি আরও পরিষ্কার হয় ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (৮৫২হি.)-এর মন্তব্যে। তিনি বলেন, أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة 'রাসূল (ছা.)-এর হাদীছসমূহ ছাহাবী এবং জ্যেষ্ঠ তাবেঈদের যুগে গ্রন্থাবদ্ধ এবং সুবিন্যস্ত আকারে সংরক্ষিত ছিল না।[৯৭] তিনি অব্যবহিত পরই বলেন, ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار 'অতঃপর তাবেঈদের যুগের শেষের দিকে হাদীছ সমূহ জমা করা শুরু হ'ল এবং তা অধ্যায়ভিত্তিকভাবে সাজানো হ'তে লাগল। অর্থাৎ তাঁর মন্তব্যে এটিই পরিষ্কার হয় যে, ছাহাবী এবং তাবেঈদের যুগে হাদীছ বর্তমান যুগের মত গ্রন্থাকারে ছিল না বা অধ্যায়ভিত্তিকভাবে সুসজ্জিত ছিল না। তবে তাবেঈদের যুগের শেষের দিকে হাদীছ জমা করা হয় এবং অধ্যায় ভিত্তিকভাবে বিন্যাস শুরু হয়। অর্থাৎ এটি ছিল হাদীছ সংরক্ষণের দ্বিতীয় পর্যায়। যার পূর্বে প্রথম পর্যায়ে ছাহাবীগণ ছোট ছোট পাণ্ডুলিপিতে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। হাদীছ সংরক্ষণের এই প্রথম পর্যায় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য ধরতে না পারার কারণেই সকল হাদীছ অস্বীকারকারী এবং প্রাচ্যবিদ এই ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েছেন যে, ইবনু শিহাব আয-যুহরীই প্রথম হাদীছ লিপিবদ্ধ করেন এবং ২য় শতাব্দী হিজরীর পূর্বে হাদীছ লিপিবদ্ধ করা শুরু হয়নি। বরং ইবনু শিহাব আয-যুহরী ছিলেন হাদীছ সংকলনের দ্বিতীয় পর্যায় তথা একত্রিতকরণ ও বিন্যাস্তকরণ আরম্ভকারী। আর প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছিল রাসূল (ছা.)-এর জীবদ্দশাতেই। এছাড়া ছাহাবী এবং জ্যেষ্ঠ তাবেঈদের লিখিত ছহীফাসমূহ ছিল অসংখ্য, যা সর্বজনবিদিত। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে

---

৯৫. ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরাব*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১৬৬।
৯৬. মুরতাযা আয-যাবীদী, *তাজুল আরূস*, ৩৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৫।
৯৭. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, *ফাতহুল বারী* (হাদিউস সারী), ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

প্রমাণিত যে, হাদীছ ১ম শতাব্দীতেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল এবং তা রাসূল (ছা.)-এর জীবদ্দশাতেই। অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে ইবনু শিহাব আয-যুহরীর মাধ্যমে তা একত্রিত ও সুবিন্যস্ত করা হয় এবং তৃতীয় পর্যায়ে তা গ্রন্থাকারে রূপ পরিগ্রহ করে।

ড. ফুয়াদ সেযগীন হাদীছ সংকলনের এই তিনটি পর্যায়কে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর ‘তারিখুত তুরাছ আল-আরাবী’ গ্রন্থে’। তিনি বলেন হাদীছ সংকলন তিনটি ধাপ অতিক্রম করেছিল। (১) كتابة الحديث : এই ধাপে ছহীফা এবং জুয্ নামে ছোট ছোট পাণ্ডুলিপিতে হাদীছ লিখিত হ’ত। এটি ছিল রাসূল (ছা.)-এর যুগ, ছাহাবী এবং জ্যেষ্ঠ তাবেঈদের যুগ। (২) تدوين الحديث : এই ধাপে পূর্ব ধাপে বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত ছহীফা ও জুয্সমূহ একত্রিত করা হয়। প্রথম শতাব্দী হিজরীর শেষভাগ এবং ২য় শতাব্দী হিজরীর প্রথমভাগ ছিল এর ব্যাপ্তিকাল। (৩) تصنيف الحديث : এই ধাপে হাদীছসমূহ বিষয়বস্তু অনুসারে অধ্যায়ভিত্তিকভাবে সজ্জায়ন শুরু হয়। ২য় হিজরী শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যভাগ থেকে শুরু হয়ে ২য় হিজরীর শেষভাগ পর্যন্ত এই ধাপ চলমান ছিল, যতদিন না ছাহাবীদের নাম অনুসারে নতুন ধারার বিন্যাসপদ্ধতি শুরু হয়, যা ‘আল-মুসনাদ’ নামে পরিচিত।[৯৮] প্রাচ্যবিদদের মধ্যে নাবিয়া এ্যাবোট[৯৯] এবং গ্রেগর শোয়েলার[১০০] জোরালোভাবে এ ব্যাপারে সহমত পোষণ করেছেন।

সুতরাং হাদীছ লিপিবদ্ধ হওয়া শুরু হয়েছিল রাসূল (ছা.)-এর জীবদ্দশাতেই। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে তার একত্রিতকরণ শুরু হয় ১ম শতাব্দীর হিজরীর শুরুতে। যেমনভাবে কুরআন লিপিবদ্ধ হয়েছিল রাসূল (ছা.)-এর যুগে। তবে তা একত্রিত করে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাবদ্ধ করা হয়েছিল ওছমান (রা.)-এর যুগে। সুতরাং ২য় হিজরী শতাব্দীর পূর্বে হাদীছ সংকলন শুরু হয়নি, এ কথা আদৌ সত্য নয়, যা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

খ. হাদীছ সংকলন শুধুমাত্র লেখনীর ওপর নির্ভরশীল ছিল না; বরং তা একই সাথে মুখস্তকরণের মাধ্যমেও চলমান ছিল। মুহাদ্দিছগণ বর্ণনাকারীর

৯৮, ফুয়াদ সেযগীন, *তারীখুত তুরাছ আল-আরাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০।

৯৯. Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri : Quranic Commentary and Tradition*, vol. 2, p. 6-7.

১০০. Gregor Schoeler, *The Genesis of Literature in Islam: From the Aural to the Read*, p. 2-7.

ন্যায়পরায়ণতা (العدالة) এবং সঠিকভাবে ধারণক্ষমতা (الضبط)-কে সবার ঊর্ধ্বে রাখেন। আর সঠিকভাবে ধারণক্ষমতা (الضبط) দুই ভাবে বিভক্ত। (১) ضبط صدر : বর্ণনাকারী তাঁর শ্রুত বিষয়টি এমনভাবে মুখস্থ রেখেছেন এবং হৃদয়াঙ্গম করেছেন যে, যে কোন সময় তিনি তা নিজের স্মৃতি থেকে উপস্থাপন করতে পারেন। (২) ضبط كتاب : বর্ণনাকারী তাঁর নিকট লিখিত পাণ্ডুলিপিটি নিজের কাছে এমন সতর্কতার সাথে সংরক্ষণে রেখেছেন যে লেখনীর সময় তাতে কোন ভুল-ভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটেনি এবং লেখনীর পরও তাতে কোন ত্রুটি সৃষ্টি হয়নি।[১০১] তবে মুহাদ্দিছদের নিকট ضبط صدر বা মুখস্থকরণই প্রাধান্য পেত। এমনকি ইমাম মালিক (১৭৯হি.) বর্ণনাকারীর নিকট লেখনী থাকা সত্ত্বেও মুখস্থ থাকাকে অপরিহার্য মনে করতেন। ইমাম আবূ হানীফা (১৫০হি.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে।[১০২] কেননা মুখস্থকরণের চেয়ে লেখনীতে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভবনা অধিকতর বেশী থাকে। এর কারণ লেখনীতে মানবীয় ত্রুটির বাইরেও বহিরাগত নানামুখী ত্রুটির সম্ভবনা থাকে। যেমন পানিতে ভিজে নষ্ট হওয়া, পোকায় কেটে ফেলা, লেখা অস্পষ্ট হয়ে পড়া, লেখকের অবর্তমানে কেউ তাতে সংযোজন-বিয়োজন করা, লেখকের প্রমাদের কারণে এক শব্দ অন্য শব্দে রূপান্তরিত হওয়া (التصحيف والتحريف) ইত্যাদি। ফলে পবিত্র কুরআনও রাসূল (ছা.)-এর যুগে এবং পরবর্তী তিন খলীফার যুগে মূলত মুখস্থ পদ্ধতিতেই সংরক্ষিত ছিল। ওছমান (রা.) গ্রন্থাবদ্ধ করার পরই প্রথম কুরআনের লিপিবদ্ধরূপের প্রসার ঘটে।[১০৩]

সুতরাং ১ম শতাব্দীতে হাদীছ লিপিবদ্ধকরণের কাজ তুলনামূলক কম হ'লেও মুখস্থকরণের মাধ্যমে তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। ছাহাবী এবং জ্যেষ্ঠ তাবেঈদের মুখস্থকরণ এবং লেখনীর এই যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই হাদীছ সংকলনের দ্বিতীয় ধাপ তথা একত্রিকরণ (التدوين) কাজ শুরু হয়েছিল। যদি পূর্ববর্তী ধাপে তা সংরক্ষণ করা না হ'ত তবে এই দ্বিতীয় ধাপ তথা একত্রিকরণের কাজ শুরু হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠত না। সুতরাং হাদীছ

---

১০১. ইবনুছ ছালাহ, *মুকাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ*, পৃ. ১০৪-১০৬, ১৮১-১৮৩।
১০২. ড. রিফ'আত ফাওযী, *তাওছীকুস সুন্নাহ ফিল ক্বারনিছ ছানী আল-হিজরী*, পৃ. ১৬৩-১৬৪।
১০৩. আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী, *আল-আনওয়ার আল-কাশিফাহ*, পৃ. ৭৭।

সংকলনকর্ম সময়মতই শুরু হয়েছিল এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষিতও হয়েছিল। তবে তা একত্রিত করা এবং গ্রন্থে পরিণত করার কাজটি সঙ্গত কারণে বিলম্বিত হয়েছিল।

গ. উমার ইবনু আব্দিল আযীয (১০১হি.) যখন হাদীছ একত্রিকরণের নির্দেশ দিলেন, তখন তা স্রেফ ধর্মীয় আবেগবশত ছিল না; বরং এর পিছনে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রেক্ষাপট ছিল। মূলত ছাহাবীদের যুগেই হাদীছ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। উমার (রা.) এ ব্যাপারে ছাহাবীদের সাথে পরামর্শও করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন প্রেক্ষাপটের কথা চিন্তা করে তিনি এ কাজ থেকে ফিরে আসেন। অতঃপর তাবেঈদের যুগে এই প্রয়োজনীয়তা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে উমার ইবনু আব্দিল আযীযের যুগে তা প্রকট আকার ধারণ করে।[১০৪] কেননা ছাহাবীগণ তখন অধিকাংশই মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যারা ছিলেন সুন্নাহের প্রধান ধারক ও বাহক। জ্যেষ্ঠ তাবেঈগণ যারা ছাহাবীদের নিকট থেকে সুন্নাহের ভাণ্ডার সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন তারাও তখন জীবনের প্রান্তসীমায় চলে এসেছিলেন। অপরদিকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিবাদের ডামাডোলে জাল হাদীছ রচনার প্রবণতা তুঙ্গে উঠেছিল। সব মিলিয়ে তিনি আশংকা করেছিলেন যে, সুন্নাহ্‌র ভাণ্ডার এখনই একত্রিত না করলে তা অচিরেই আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হবে। যেমন তাঁর নিজের ভাষ্য– انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبوه فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله ‘তোমরা রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ সম্পর্কে খোঁজ কর এবং তা লিপিবদ্ধ করা শুরু কর। কেননা আমি হাদীছের বিলুপ্তি এবং হাদীছের ধারক-বাহকদের প্রস্থান (মৃত্যু)-এর আশংকা করছি।’[১০৫] সুতরাং এ কথা ভাবার প্রশ্নই ওঠে না যে, ১ম শতাব্দীর পূর্বে হাদীছ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি। উমার বিন আব্দুল আযীযের নির্দেশে তা মূলতঃ একত্রিত করা শুরু হয়েছিল।

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, উমার ইবনু আব্দিল আযীয (৬১-১০১হি.) খিলাফতে আসীন হয়ে মদীনায় তাঁর নিযুক্ত গভর্নর আবূ বকর ইবনু হাযম আনছারী (১২০হি.)-এর নিকট হাদীছ লিপিবদ্ধ করার জন্য

---

১০৪. আব্দুস সালাম আল-মুবারাকপুরী, *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী* (শারজাহ : দারুল ফাত্‌হ, ৮ম প্রকাশ : ১৯৯৭খ্রি.), পৃ. ১৮১-১৮২।

১০৫. *ছহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১; *সুনানুদ দারিমী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩১, হা/৫০৪-৫০৫।

ফরমান পাঠান।[১০৬] তিনি তাকে আরও নির্দেশ দেন যে, আমরাহ বিনতু আব্দির রহমান (৯৮হি.) এবং কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর (১২০হি.)-এর কাছে সংরক্ষিত হাদীছ সমূহ লিপিবদ্ধ করতে। কেননা তারা ছিলেন আয়েশা (রা.)-এর হাদীছ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।[১০৭] এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে, হাদীছ আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ করার পূর্বেই মানুষের কাছে তা ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষিত ছিল। নতুবা উমার ইবনু আব্দিল আযীয তাঁকে বিশেষভাবে আমরাহ এবং কাসিম ইবনু মুহাম্মাদের নিকট রক্ষিত হাদীছসমূহ লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন না। তাঁর এই নির্দেশই প্রমাণ করে যে, এই নির্দেশের পূর্ব থেকে হাদীছ সংরক্ষিত ছিল।

ঘ. হাদীছ সংকলনের শুরুতে মুহাদ্দিছগণ শহরে শহরে তৎকালীন বিদ্বানদের মজলিসে গেলেন যারা হাদীছ সংরক্ষণ এবং সংকলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তারা তাদের নিকট থেকে যথাযথসূত্রে প্রাপ্ত হাদীছসমূহ একত্রিত করতে লাগলেন। তাদের লিখিত পাণ্ডুলিপি সমূহে রাসূল (ছা.)-এর হাদীছের সাথে ছাহাবী ও তাবেঈদের ব্যাখ্যা ও ফৎওয়াসমূহও লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর ধীরে ধীরে রাসূল (ছা.)-এর হাদীছসমূহ পৃথক করা এবং হাদীছ বর্ণনাকারীদের নাম-ঠিঁকুজি সংরক্ষণ করা, হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করা প্রভৃতি ধাপগুলো পেরিয়ে হাদীছ সংকলন কর্ম পূর্ণতা পায়। এই পর্যায়ে এসে মুহাদ্দিছগণ হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের সূক্ষ্ম পদ্ধতিও আবিষ্কার করেন। অর্থাৎ মুহাদ্দিছগণ কখনই ঢালাওভাবে সকল হাদীছ বিশুদ্ধ মনে করতেন না, যেমনটি হাদীছ অস্বীকারকারীগণ ধারণা করেছেন; বরং একটি কঠোর নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাদীছের শুদ্ধতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য ইসনাদ সংরক্ষণ এবং বর্ণনাকারীদের জীবনচরিত শাস্ত্রের জন্ম ঘটেছিল প্রায় হাদীছ সংকলনকর্ম শুরু হওয়ার সময়কাল থেকেই।[১০৮] মূলত রাসূল (ছা.)-এর সতর্কতাবাণী– من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ‘আমার ওপর যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ

---

১০৬. *ছহীহুল বুখারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১; *সুনান আদ-দারিমী*, হা/৫০৪-৫০৫, সনদ ছহীহ।

১০৭. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫; আব্দুর রহমান ইবনু আবী হাতিম, *আল-জারহু ওয়াত তা'দীল* (বৈরূত : দারু ইহইয়াহিত তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৫২খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১।

১০৮. দ্র. ড. রিফ'আত ফাওযী, *তাওছীকুস সুন্নাহ ফিল ক্বারনিছ ছানী আল-হিজরী*, পৃ. ৬৬-৬৭।

করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়'[১০৯] মোতাবেক ছাহাবীগণ মিথ্যা বর্ণনার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন, যা আমরা আবূ বকর ও উমার (রা.)-সহ অন্যান্য ছাহাবীদের গৃহীত নীতিতে স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি। পরবর্তীতে তাবেঈগণও একই রূপ সতর্ক পদক্ষেপ নেন। যেমন বছরার বিখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (১১০হি.) বলেন, لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وبنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم 'মানুষ ইতোপূর্বে হাদীছের ক্ষেত্রে সনদ জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু যখন ফিতনা সৃষ্টি হ'ল তখন তারা বলতে শুরু করল, তোমাদের লোকদের নাম বল। যদি দেখা যেত সে আহলুস সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি, তখন তার হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত, আর যখন দেখা যেত সে বিদ'আতী ব্যক্তি, তখন তার হাদীছ আর গৃহীত হ'ত না।'[১১০] কুফার ফক্বীহ ইবরাহীম আন-নাখঈ (৯৬হি.)-কে সনদের আবির্ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলেন, أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام 'তখন আলী (রা.)-এর ওপর (শী'আদের) মিথ্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছিল।'[১১১] অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীছ সংকলনের পূর্বেই বিভিন্ন শহরের বিদ্বানগণ সনদের মাধ্যমে হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই শুরু করেছিলেন। সুতরাং এ কথা বলা নিঃসন্দেহে হঠকারিতামূলক যে, হাদীছ সংকলনের কাজ দেরীতে শুরু হয়েছিল বলে তার শুদ্ধতার ওপর আস্থা রাখা যায় না।

৬. যুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, কুরআন রাসূল (ছা.)-এর যুগে সংকলিত হ'লেও তা একত্রিকরণের কাজ সুসম্পন্ন হ'তে প্রায় ৩০ বছর সময় লেগেছিল। অতএব হাদীছের এই বিশাল ভাণ্ডার ছাহাবীদের মাধ্যমে সংরক্ষিত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে একত্রিত করার কর্ম সঙ্গত কারণে বিলম্বিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং এর ভিত্তিতে হাদীছের প্রামাণিকতা অস্বীকার করা অযৌক্তিক।

রাসূল (ছা.)-এর মৃত্যুর পূর্বেই কুরআন লিপিবদ্ধভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল। অথচ ছাহাবী যায়েদ ইবনু ছাবিত (রা.)-কে যখন আবূ বকর (রা.)

---

১০৯. *ছহীহুল বুখারী*, হা/১০৭।
১১০. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ১২২।
১১১. ইবনু রজব আল-হাম্বলী, *শারহু ইলালিত তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।

কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি ভীত-কম্পিত হয়ে বললেন, فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن 'আল্লাহ্র শপথ! তারা যদি আমাকে একটি পর্বত এক স্থান হ'তে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিত, তাহ'লেও আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন বলে মনে হ'ত না।' আমি বললাম, যে কাজ রসূল (ছা.) করেন নি, আপনারা সে কাজ কীভাবে করবেন? অতঃপর তিনি বলেন যে, আবূ বকর ও উমার (রা.)-এর অব্যাহত তাগাদায় আল্লাহ আমার বক্ষ উন্মোচিত করে দিলেন। এর পর আমি কুরআন অনুসন্ধানের কাজে লেগে গেলাম এবং খেঁজুর পাতা, প্রস্তর খণ্ড এবং মানুষের বক্ষ থেকে আমি তা সংগ্রহ করতে লাগলাম।'[১১২] যায়েদ ইবনু ছাবিত (রা.)-এর এই বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, লিপিবদ্ধভাবে সংরক্ষিত কুরআনকে একত্রিত করাও তাঁর জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিনতম কর্ম মনে হয়েছিল। এমনকি তিনি এ-ও ভেবেছিলেন যে, রাসূল (ছা.) যখন একত্রিতভাবে সংকলন করে যান নি, অতএব আমাদের জন্যও তা উচিৎ হবে কি না। সুতরাং কুরআন সংকলনকে কেন্দ্র করেই যখন এত প্রকার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বাঁধা অতিক্রম করতে হয়েছিল, তখন হাদীছের বিশাল ভাণ্ডারকে লিপিবদ্ধভাবে সংরক্ষণ করার কর্ম শুরু করার বিষয়টি কতটা দুরূহ ও অনতিক্রম্য ছিল? শুধু এই একটি বিষয় বিবেচনায় রাখলেই হাদীছ দেরীতে লিপিবদ্ধকরণ সংক্রান্ত কোন সন্দেহ থাকার অবকাশ থাকে না।

সংশয়-৯ : হাদীছের অর্থগত বর্ণনা (الرواية بالمعني) প্রমাণ করে যে, হাদীছ যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়নি।

হাদীছ অস্বীকারকারীগণ বলে থাকেন যে, হাদীছ সংকলনে বিলম্ব ঘটার ফলে তাতে শব্দগত বর্ণনার পরিবর্তে অর্থগত বর্ণনা (الرواية بالمعني) তথা ভাবার্থের প্রচলন ঘটেছে। ফলে হাদীছ বর্ণনায় প্রচুর কম-বেশী হয়েছে এবং হাদীছের মৌলিক অর্থের পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটেছে। সুতরাং হাদীছ শরী'আতের দলীল হওয়ার উপযুক্ত নয়। এমনকি এজন্য আরবী বৈয়াকরণিকগণ হাদীছ দ্বারা কোন দলীল পেশ করেন না। কেননা হাদীছের শব্দসমূহ রাসূল (ছা.)-এর বর্ণিত শব্দ নয়; বরং বর্ণনাকারীদের নিজস্ব

১১২. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৪৯৮৬।

শব্দচয়ন।[১১৩] হাদীছ যদি অহী হ'ত তবে অবশ্যই তা শব্দগতভাবে সংরক্ষিত হ'ত। অনুরূপভাবে প্রাচ্যবিদগণও হাদীছের Narrative Structure- কে কেন্দ্র করে সমালোচনার প্রয়াস পেয়েছেন এবং একে হাদীছ মনগড়া হওয়ার দলীল হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।

পর্যালোচনা :

হাদীছের অর্থগত বর্ণনা (الرواية بالمعني) মুহাদ্দিছদের নিকট একটি সুপরিচিত বিষয়। এটি বৈধ না অবৈধ তা নিয়ে মুহাদ্দিছদের মধ্যে শুরু থেকেই মতভেদ ছিল। এ বিষয়ে খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.) দীর্ঘ আলোচনার অবতারণা করেছেন।[১১৪] ছাহাবী, তাবেঈ এবং পরবর্তী বিদ্বানদের একটি অংশ হাদীছের অর্থগত বর্ণনাকে বৈধ মনে করতেন না। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) সামান্য শব্দগত পরিবর্তনকেও গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না। একবার তাঁর সামনে এক ব্যক্তি রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ উল্লেখ করলেন যে, إنما مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين من الغنم 'মুনাফিকের উদাহরণ হ'ল, ছাগলের দু'টি পালের মধ্যে আবর্তনকারী ছাগলের মত।' আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) তৎক্ষণাৎ সংশোধনী দিয়ে বললেন যে, বাক্যটি এমন নয়; বরং রাসূল (ছা.) বলেছিলেন, مثل المنافق مثل الشاة بين الغنمين।[১১৫] এখানে দু'টি বাক্যের অর্থ একই। কেবল শব্দের সামান্য পার্থক্য হয়েছে। তবুও আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) তা গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। অপর এক বর্ণনায় দেখা যায় তাঁর সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। তিনি ছিয়াম ও হজ্জকে আগে-পরে করে বর্ণনা করেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) তাকে বললেন, لا، ولكن حج البيت وصيام رمضان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 'না এভাবে নয়, বরং বায়তুল্লাহ্‌য় হজ্জ্ব এবং রামাযানের ছিয়াম। এভাবেই রাসূল (ছা.) বলেছেন।[১১৬] এখানে তিনি শব্দের সামান্য আগে-পরে হওয়াকেও অনুমোদন করেননি। অনুরূপভাবে তাবেঈ ফক্বীহ আল-ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (১০৭হি.) এবং মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন

---

১১৩. মাহমূদ আবূ রাইয়াহ, *আযওয়াউন আলাস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ*, পৃ. ৩৪৫।
১১৪. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ১৭১-২১১।
১১৫. তদেব, পৃ. ১৭৩।
১১৬. তদেব, পৃ. ১৭৬।

(১১০হি.)[১১৭], ইমাম মালিক (১৭৯হি.)[১১৮], আব্দুর রহমান ইবনুল মাহদী (১৯৮হি.)[১১৯] প্রমুখও হাদীছের শব্দগত বর্ণনার ওপর জোর দিতেন এবং অর্থগত বর্ণনা করাকে নিষেধ করতেন।

তারা মনে করতেন, রাসূল (ছা.)-এর বর্ণিত শব্দসমূহের মাঝে কম-বেশী করা হ'লে তাতে অর্থগত পরিবর্তনের আশংকা থাকে।[১২০] যেমন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, من سمع حديثا فحدث به كما سمع، فقد سلم 'যে ব্যক্তি কোন হাদীছ শুনল এবং যেভাবে শুনল সেভাবেই বর্ণনা করল, সে ব্যক্তি নিরাপদ থাকল।'[১২১] আব্দুল মালিক ইবনু উমাইর (১১০হি.) বলেন, والله إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি যখন হাদীছ বর্ণনা করি তখন (সংক্ষেপায়নের উদ্দেশ্যে) একটি শব্দও ছাড়ি না।'[১২২]

তবে অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, অর্থগত বর্ণনা শর্তসাপেক্ষ বৈধ।[১২৩] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.), আনাস ইবনু মালিক (রা.), ইবরাহীম আন-নাখঈ (৯৬হি.), আমের আশ-শা'বী (১০০হি.), হাসান আল-বছরী (১১০হি.)[১২৪] প্রমুখ অর্থগত হাদীছ বর্ণনায় আপত্তি করতেন না, যদি মূল মর্মার্থ ঠিক থাকে। এজন্যই আমরা হাদীছ শাস্ত্রে সূত্র ভেদে একই হাদীছ ভিন্ন ভিন্ন শব্দে দেখতে পাই, যদি ভাবার্থ একই হয়ে থাকে। ছাহাবী এবং তাবেঈদের মধ্যে মূল অর্থ ঠিক রেখে এমন ভাবার্থবোধক বর্ণনার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কেননা তারা সুন্নাহ্‌র ক্ষেত্রে শব্দের চেয়ে অর্থের প্রতি বেশী গুরুত্বারোপ করতেন।[১২৫]

ছাহাবী ওয়াছিলাহ ইবনুল আছক্বা' (রা.)- কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলেন, 'তোমাদের সামনে কুরআন লিপিবদ্ধ রয়েছে, তবুও তোমরা

---

১১৭. তদেব, পৃ. ১৮৬।

১১৮. ইবনু আব্দিল বার্র, *জামিউ বায়ানিল ইলম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫০; খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ১৮৯।

১১৯. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ১৬৭।

১২০. আস-সারাখসী, *উছূলুস সারাখসী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫; ড. রিফ'আত ফাওযী, *তাওছীকুস সুন্নাহ ফীল ক্বারনিছ ছানী আল-হিজরী*, পৃ. ৪১৩।

১২১. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ১৭২।

১২২. তদেব, পৃ. ১৯০।

১২৩. ইবনুছ ছালাহ, *মুক্বাদ্দামাতু ইবনুছ ছালাহ*, পৃ. ২১৪; শামসুদ্দীন আস-সাখাভী, *ফাতহুল মুগীছ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮; জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *কাওয়াঈদুত তাহদীছ*, পৃ. ২২১।

১২৪. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ১৮৬, ড. রিফ'আত ফাওযী, *তাওছীকুস সুন্নাহ ফীল ক্বারনিছ ছানী আল-হিজরী*, পৃ. ৪২১।

১২৫. ইবনুছ ছালাহ, *মুক্বাদ্দামাতু ইবনুছ ছালাহ*, পৃ. ২১৪।

মুখস্থ করতে বেগ পাও এবং তাতে (শব্দে) কম-বেশী হচ্ছে কি না সন্দেহে পতিত হও। তাহ'লে হাদীছের ক্ষেত্রে কী হ'তে পারে, যা আমরা হয়তবা একবারই রাসূল (ছা.)-এর নিকট থেকে শুনেছি?... অতএব আমরা অর্থগতভাবে হাদীছ বর্ণনা করলে তা-ই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।'[১২৬]

হাসান বাছরী (১১০হি.) এবং ইবনু শিহাব আয-যুহরী (১২৪হি.) বলেন, لا بأس بالحديث إذا أصبت المعنى '(অর্থগতভাবে) হাদীছ বর্ণনায় কোন সমস্যা নেই যদি অর্থটি সঠিক থাকে।'[১২৭]

হাসান বাছরী (১১০হি.) এর পক্ষে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন যে, أن الله تعالى قد قص من أنباء ما قد سبق قصصا، كرر ذكر بعضها في مواضع بألفاظ مختلفة، والمعنى واحد 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পূর্বযুগের অনেক ঘটনা (কুরআনে) বর্ণনা করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে গল্পগুলোর অংশবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন শব্দে ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার অর্থ একই।'[১২৮] অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই কুরআনে যেমন আদম (আ.), মূসা (আ.) প্রমুখের সাথে কথোপকথনগুলো অনেক স্থানে উল্লেখ করেছেন এবং তাতে শব্দগুলো স্থান ভেদে বেশ পরিবর্তিত হয়েছে, যদিও তাতে অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং অর্থগত বর্ণনা বৈধ।

---

১২৬. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫।

১২৭. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ২০৭। এ বিষয়ে খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.) ৩টি মারফূ' হাদীছ উল্লেখ করেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল (ছা.)- কে জিজ্ঞাসা করল যে, হে রাসূল! আমরা আপনার নিকট হাদীছ শুনি। কিন্তু ঠিক যেভাবে শুনেছি, সেভাবে অনেক সময় অপরের নিকট বর্ণনা করতে পারি না। তখন রাসূল (ছা.) বললেন, إذا لم تحرموا حلالا ولا تحلوا حراما وأصبتم المعنى فلا بأس 'যদি তোমরা হারামকে হালাল না কর এবং হালালকে হারাম না কর এবং অর্থ ঠিক রাখতে পার তবে কোন সমস্যা নেই' (পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯-২০০)। কিন্তু এগুলোর কোনটিই ছহীহ নয়। আল-জাওরাক্বানী (৫৪৩হি.) বলেন, هذا حديث باطل، وفي إسناده اضطراب 'এই হাদীছ বাতিল এবং এর সনদে অসংলগ্নতা রয়েছে'। দ্র. আল-জাওরাক্বানী, *আল-আবাত্বীল ওয়াল মানাকীর*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৩। ইবনু রজব (৭৯৫হি.) এ প্রসঙ্গে বলেন, روي فيه أحاديث مرفوعة، لا يصح شيء منها 'এ বিষয়ে কিছু মারফূ' হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যার কোনটিই ছহীহ নয়'। দ্র. ইবনু রজব, *শারহু ইলালিত তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৯।

১২৮. আর-রামহারমুযী, *আল-মুহাদ্দিছুল ফাছিল*, পৃ. ৫২৯।

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (১১০হি.) বলেন, كنت أسمع الحديث من عشرة المعنى واحد واللفظ مختلف 'আমি দশজনের নিকট থেকে হাদীছ শুনতাম যার অর্থ এক; কিন্তু শব্দ বিভিন্ন।'[১২৯]

তাবেঈ যুরারাহ ইবনু আওফা (৯৩হি.) বলেন, لقيت أناسا من أصحاب رسول الله، فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك، فقال: لا بأس ما لم يحيل المعنى 'আমি রাসূল (ছা.)-এর ছাহাবীদের মধ্য থেকে অনেকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তারা (হাদীছ বর্ণনা করতেন), যা অর্থের দিক থেকে একই হ'ত, যদিও শব্দের দিক থেকে বিভিন্ন হ'ত। আমি তাদের কাউকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এতে কোন সমস্যা নেই, যতক্ষণ না অর্থ পরিবর্তিত হয়।'[১৩০]

ইমাম শাফেঈ (২০৪হি.) এই মতের পক্ষে দলীল হিসাবে উল্লেখ করেন রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ– إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرءوا ما تيسر 'নিশ্চয়ই কুরআন সাতটি হরফে নাযিল হয়েছে, অতঃপর তোমরা পড় যা তোমাদের জন্য সহজ হয়।'[১৩১] তিনি বলেন, যদি আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহজতার জন্য কুরআন সাতটি হরফে নাযিল করে থাকেন, এটা জানিয়ে দিতে যে শব্দ ভিন্ন হ'লেও তা পাঠ করা বৈধ, যতক্ষণ না তাতে অর্থের কোন পরিবর্তন আসে; তবে কুরআন ভিন্ন অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে তা আরও বেশী বৈধ, যদি না অর্থের পরিবর্তন হয়। আর প্রত্যেক যেসব হাদীছে কোন হুকুম উল্লেখিত হয় না, তাতে শব্দের পরিবর্তন ঘটলেও অর্থের পরিবর্তন ঘটে না।[১৩২]

আল-আমিদী (৬৩১হি.) এটি বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা' রয়েছে মন্তব্য করে বলেন, والمختار مذهب الجمهور، ويدل عليه النص، والإجماع، والأثر والمعقول 'এটাই হ'ল জুমহূর বিদ্বানদের গৃহীত মাযহাব। যা নছ, ইজমা', আছার এবং যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত।'[১৩৩]

---

১২৯. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ২০৬।
১৩০. আশ-শাফেঈ, *আর-রিসালাহ*, পৃ. ২৭০; ইবনু রজব, *শারহু ইলালিত তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৮।
১৩১. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৬৯৩৬; ৭৫৫০।
১৩২. আশ-শাফেঈ, *আর-রিসালাহ*, পৃ. ২৭০।
১৩৩. আল-আমিদী, *আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৩।

ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (৮৫২হি.) বলেন, ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانها للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى، فجوازه باللغة العربية أولى ‘এই দলটির সবচেয়ে বড় দলীল হ’ল অনারব ভাষাভাষীদের জন্য তাদের ভাষায় শরী‘আতের বিধানসমূহ ব্যাখ্যা করার অনুমোদনে মুসলিম উম্মাহ্র ইজমা‘। যদি তা অন্য ভাষায় পরিবর্তন করা বৈধ হয়, তবে আরবী ভাষার মধ্যে (তার শব্দগত পরিবর্তন) অধিকতর বৈধ।’[১৩৪]

আব্দুর রহমান আল-মু‘আল্লিমী (১৩৮৬হি.) বলেন, ‘আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে ছাহাবীগণ স্বাভাবিক নিয়মেই দ্বীন প্রচারের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে যারা রাসূল (ছা.)-এর বিবরণ শব্দে শব্দে মুখস্থ রাখতে পেরেছিলেন তারা সেভাবেই প্রচার করেছিলেন। আর যারা অর্থ মনে রেখেছিলেন তারা অর্থগতভাবে হাদীছ প্রচার করেছিলেন। এটি একটি সুনিশ্চিত বিষয় যাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এই নীতিই রাসূল (ছা.)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পর ছাহাবীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।’[১৩৫]

সুতরাং কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ছাহাবী এবং তাবেঈদের যুগে বাধ্যগত অবস্থায় হাদীছের অর্থগত বিবরণ প্রচলিত ছিল। তবে তা শর্তহীন ছিল না। বরং অর্থগত বর্ণনাকারীর জন্য ইমাম শাফেঈসহ বিদ্বানগণ কিছু কঠোর শর্ত নির্ধারণ করেছেন। যেমন : (১) তাকে আরবী ভাষা এবং তার বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে। (২) বাক্যের অর্থ এবং অন্তর্গত ফিক্বহ সম্পর্কে জ্ঞাত হ’তে হবে। (৩) কিসে অর্থের পরিবর্তন ঘটে বা না ঘটে সে সম্পর্কে সচেতন হ’তে হবে। এভাবে যদি কোন বর্ণনাকারী অর্থের পরিবর্তন সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন হয়, তবেই তার জন্য অর্থগত বর্ণনা বৈধ হবে। অন্যথায় তাকে শব্দগতভাবেই বর্ণনা করতে হবে।[১৩৬]

এছাড়া অর্থগতভাবে বর্ণনা করার সময় আরও খেয়াল রাখতে হবে যে, হাদীছটির মতনটি যেন جوامع الكلم (সারগর্ভ বাক্য) বা রাসূল (ছা.)-এর ‘সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য’-এর অন্তর্ভুক্ত না হয় এবং এমন না

---

১৩৪. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, *নুযহাতুন নাযার*, পৃ. ৯৭; জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৬।

১৩৫. আব্দুর রহমান আল-মু‘আল্লিমী, *আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ*, পৃ. ৭৮।

১৩৬. আশ-শাফেঈ, *আর-রিসালাহ*, পৃ. ৩৮০; আর-রামহারমুযী, *আল-মুহাদ্দিছুল ফাছিল*, পৃ. ৫২৯।

হয় যা দ্বারা ইবাদত করা হয়। যেমন আযানের বাক্যসমূহ, বিভিন্ন মাসনূন দোআ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, হাদীছ সংকলন সম্পন্ন হওয়ার পর অর্থগত বর্ণনার এই নীতি সাধারণভাবে আর বৈধ নয়।[১৩৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুহাদ্দিছদের নিকট কোন হাদীছ মূল শব্দে বর্ণনা করাই সাধারণ নীতি।[১৩৮] কিন্তু হাদীছের মূল শব্দটি ভুলে গেলে ইলম গোপনের আশংকায় শর্তসাপেক্ষে অর্থগত বর্ণনার অনুমোদন রয়েছে, যদি তাতে অর্থের পরিবর্তন না হয়।[১৩৯] আর যদি অর্থ পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে সেক্ষেত্রে সকল বিদ্বানের ঐক্যমতে অর্থগত বর্ণনা নিষিদ্ধ। খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.) বলেন, وليس بين أهل العلم خلاف في أن ذلك لا يجوز للجاهل بمعنى الكلام وموقع الخطاب ، والمحتمل منه وغير المحتمل 'বিদ্বানদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই যে, বাক্যের অর্থ, প্রাসঙ্গিকতা, সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অর্থগত বর্ণনা বৈধ নয়।'[১৪০]

সুতরাং হাদীছ অস্বীকারকারীদের ধারণামতে প্রথম যুগে ঢালাওভাবে হাদীছের অর্থগত বর্ণনার প্রচলন ছিল একথা মোটেও সত্য নয় এবং যারা অর্থগত বর্ণনা করতেন তাদের জন্যও হাদীছের মূল অর্থে কোন পরিবর্তন ঘটানোর কোন অনুমোদন ছিল না। ফলে এর মাধ্যমে হাদীছের অর্থে বিকৃতি ঘটা কিংবা হাদীছের মৌলিকত্ব বিনষ্ট হওয়ার কোন সুযোগ নেই। বিশেষত ছাহাবী এবং তাবেঈদের এ বিষয়ে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন থেকে এটি জোরালোভাবে প্রমাণিত হয়। নিম্নে আমরা এ বিষয়ে হাদীছ অস্বীকারকারীদের আরও কিছু ধারণা খণ্ডন করব।

ক. কুরআনের মত হাদীছও কেন শব্দগতভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হ'ল না? এই প্রশ্নের জবাবে ড. আবূ যাহু বলেন, কুরআনকে শব্দগতভাবে সংরক্ষণের কারণ ছিল এই যে, কুরআন তেলাওয়াত হ'ল ইবাদত। তার আয়াতসমূহ হ'ল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মু'জিযাস্বরূপ। এজন্য তা অর্থগত

---

১৩৭. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৭-৫৩৮; আবূ যাহূ, *আল-হাদীছু ওয়াল মুহাদ্দিছূন*, পৃ. ২০১।

১৩৮. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (৮৫২হি.) বলেন, جميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه (*নুযহাতুন নাযার*, পৃ. ৯৭)।

১৩৯. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৭।

১৪০. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ১৯৮।

বর্ণনার কোন অনুমোদন নেই। বরং তার নাযিলকৃত শব্দ হুবহু সংরক্ষণ করা আবশ্যক। আর হাদীছ শব্দগতভাবে সংরক্ষণ না করার কারণ হ'ল, হাদীছের ক্ষেত্রে শব্দ নয় বরং অর্থ হ'ল মুখ্য বিষয়। এজন্য হাদীছ তেলাওয়াতও করা হয় না। হাদীছের মতনসমূহ মু'জিযাও নয়। সুতরাং তার অর্থগত বর্ণনায় কোন বাধা নেই। দ্বিতীয়ত, কুরআনের শব্দগত সংরক্ষণ সমগ্র শরীআতের জন্য রক্ষাকবচ। আর সুন্নাহ্‌র ক্ষেত্রে অর্থগত সংরক্ষণে দায়মুক্তি প্রদান মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সহজীকরণ। কেননা যদি মুসলিম উম্মাহ কুরআনের মত সুন্নাহকেও শব্দে শব্দে সংরক্ষণ করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হ'ত, তবে তাদেরকে হাজারো সীমাবদ্ধতা ও সংকটের সম্মুখীন হ'তে হ'ত। আবার যদি সুন্নাহ্‌র মত কুরআনও অর্থগতভাবে বর্ণনার সুযোগ থাকত তবে কিছু মানুষ তাতে অনাস্থা প্রকাশের সুযোগ পেত যে, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত নয়। ফলে আল্লাহ কুরআনকে শব্দগতভাবে সংরক্ষণ করে একদিকে শরী'আতকে রক্ষা করেছেন। অপরদিকে সুন্নাহকে অর্থগতভাবে সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়ে মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য বিষয়টি সহজ করে দিয়েছেন। তৃতীয়ত, আমরা লক্ষ্য করেছি যে সুন্নাহ্‌র অর্থগত বর্ণনা একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। ফলে শব্দগতভাবে সংরক্ষিত না হ'লেও এর মূল অর্থে বিকৃতি ঘটার কোন সুযোগ নেই। চতুর্থত, যদি বলা হয় যে, রাসূল (ছা.) শব্দগতভাবে সংরক্ষণ করে গেলে সুন্নাহ্‌র প্রতি আস্থা রাখা যেত, তাহ'লে এ কথার দ্বারা রাসূল (ছা.)-এর ওপর সরাসরি অভিযোগের তীর ছোড়া হয় যে, তিনি সঠিকভাবে দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব পালন করেননি কিংবা সুন্নাহ দ্বীনের অংশ নয়। এ দু'টি কথাই মানুষকে পথভ্রষ্টকারী।[১৪১]

খ. কুরআনের মত হাদীছ শব্দগতভাবে নাযিল হয়নি। সুতরাং তা শব্দগতভাবে সংরক্ষণের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। এজন্য রাসূল (ছা.) নিজেই অর্থগত বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ একই বিষয়ের বিবরণ সময় ও স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে প্রদান করেছেন। যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কে যতবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছে, প্রতিবার তিনি কিছুটা পরিবর্তিত উত্তর প্রদান করেছেন। ফলে যে কোন সাধারণ পাঠক ভেবে বসতে পারে যে, এটি স্ববিরোধিতা কিংবা বর্ণনাকারীর দুর্বলতা বা অর্থগত বর্ণনার ফল। অথচ বাস্তবতা হ'ল, রাসূল (ছা.) ছিলেন মানসিক চিকিৎসক। তিনি প্রত্যেক মানুষকে তার উপযোগী করে প্রয়োজনীয় উত্তর প্রদান করতেন বা প্রশ্নকারীর অবস্থা বুঝে উত্তর দিতেন। তাঁর নিকট দেশ-বিদেশ থেকে সর্বদা মানুষ আসত এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করত। তিনি

---

১৪১. আবূ যাহূ, *আল-হাদীছু ওয়াল মুহাদ্দিছূন*, পৃ. ২০১।

সকলের অবস্থা অনুযায়ী সংক্ষেপে কিংবা দীর্ঘ করে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। ফলে একই প্রশ্নের উত্তরে কখনও কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় দীর্ঘ করে কিংবা সংক্ষিপ্তভাবে এসেছে। এটা বর্ণনাকারী বা অর্থগত বর্ণনার ত্রুটি নয়। বরং এভাবেই রাসূল (ছা.) বর্ণনা করেছিলেন। যেমনভাবে কুরআনেও আমরা লক্ষ্য করি যে, নবীদের কাহিনী বর্ণনার সময় একই ঘটনা বিভিন্ন সূরায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। কুরআনের ওপর অবিশ্বাসী অজ্ঞ পাঠক এটি কুরআনের ভুল ও স্ববিরোধীতা ধরে নিতে পারে। অথচ বাস্তবে তা নয়। কেননা কুরআনে কোন প্রকার ভুল বা মিথ্যার সন্নিবেশ ঘটার সুযোগ নেই।[১৪২] সুতরাং হাদীছের অর্থগত বর্ণনাকে এর দুর্বলতা ভাবার সুযোগ নেই।

গ. বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীছসমূহ যদি আমরা প্রায়োগিকভাবে বিশ্লেষণ করি তাহ'লে দেখব যে, কোন হাদীছে শব্দগত কিছু পরিবর্তন আসলেও তার বিষয়বস্তুতে মৌলিক কোন পরিবর্তন আসে নি। উদাহরণস্বরূপ এ পর্যন্ত প্রাপ্ত হাদীছ শাস্ত্রের সর্বাধিক প্রাচীন লিখিত সংকলন ছহীফা হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ, যা ১ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়েছিল, তাতে মূসা (আ.)-এর বস্ত্র উন্মোচিত হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনাটি এসেছে।[১৪৩] একই হাদীছ প্রায় দুইশত বছর পর ৩য় হিজরী শতকে সংকলিত ছহীহুল বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ<মা'মার ইবনু রাশেদ<আব্দুর রায্যাক ইবনু হাম্মাম<ইসহাক্ব ইবনু ইবরাহীম ইবনু নাছর (বুখারী), মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' (মুসলিম) সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে হুবহু প্রায় একই শব্দে।[১৪৪] অনুরূপভাবে হাদীছটি ইমাম বুখারী আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে অন্য দুই বর্ণনাকারী খাল্লাস ইবনু আমর (১০০হি.) এবং মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ আল-কুরাশী সূত্রে[১৪৫] এবং ইমাম মুসলিম অপর একজন বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক আল-উক্বাইলী (১০৮হি.) সূত্রে[১৪৬] বর্ণনা করেছেন। অথচ লক্ষ্যণীয় যে এই দীর্ঘ পরিক্রমায় নানা সূত্রের বর্ণনাকারী ভেদে হাদীছের শব্দগত কিছু পরিবর্তন হ'লেও মূল বিষয়বস্তুর কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

এজন্য প্রাচ্যবিদদের মধ্যে যারা হাদীছের এই বর্ণনাধারা সম্পর্কে তুলনামূলক গবেষণা চালিয়েছেন তাঁরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে,

---

১৪২. তদেব, পৃ. ২০৭-২০৮।

১৪৩. হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ, *ছহীফাহ হাম্মাদ ইবনু মুনাব্বিহ*, তাহক্বীক : আলী হাসান আলী আব্দুল হামীদ (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৮৭খ্রি.), পৃ. ৪৪, হা/৬০।

১৪৪. *ছহীহুল বুখারী*, হা/২৭৮; *ছহীহ মুসলিম*, হা/৩৩৯।

১৪৫. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৩৪০৪।

১৪৬. *ছহীহ মুসলিম*, হা/৩৩৯।

হাদীছ বর্ণনাকারীগণ রাসূল (ছা.)-এর বাণীকে যথাযথ ও সুসংহতভাবেই সংরক্ষণ করেছেন। যেমন ড. নাবিয়া এ্যাবোট (১৮৯৭-১৯৮১খ্রি.) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ *Studies in Arabic literary papyri* গ্রন্থে তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহ বিশ্লেষণ করে বিষদভাবে তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী এবং পরবর্তীদের বর্ণনায় তেমন কোন বিভক্তি দেখা যায়নি শব্দের কিছু পার্থক্য ছাড়া।[১৪৭] এমনিভাবে মুসনাদ আবূ দাঊদ আত-তায়ালিসীর হাদীছসমূহের বর্ণনাভঙ্গির ওপর পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনকারী আমেরিকান গবেষক R. Marston Speight (১৯২৪-২০১১খ্রি.) মুসনাদ তায়ালিসী'র ২৭৬৭টি হাদীছের ওপর বর্ণনাভঙ্গি গবেষণার[১৪৮] পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যুগপরম্পরায় হাদীছ বর্ণনাকারীগণের অর্থগত বর্ণনা বিস্ময়করভাবে রাসূল (ছা.)-এর হাদীছসমূহে মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধন করেনি। তিনি বলেন, This investigation of two-, three-, and four-part narrative forms contributes to a fuller appreciation of hadith in their phenomenal reality and in their total living context. It helps us to see how hadith transmitters informed the memory of the prophetic model with clear and consistent structural line.[১৪৯]

ঘ. হাদীছের শব্দগত বিভিন্নতা কেবল প্রভাবিত করে কওলী তথা রাসূল (ছা.)-এর কথ্য হাদীছকে, যা তুলনামূলক কম সংখ্যক। কিন্তু বেশীর ভাগ হাদীছসমূহ তথা ফে'লী (কর্মগত) এবং তাক্বরীরী (অনুমোদনসূচক) হাদীছসমূহে এর কোন প্রভাব নেই। কেননা কোন কর্ম বা অনুমোদনের বিবরণ কখনও একই শব্দে হ'তে পারে না। বর্ণনাকারী ভেদে তাতে ভিন্নতা আসবেই, যা সুপরিজ্ঞাত বিষয়। সুতরাং কথা উঠতে পারে কেবল সে সকল হাদীছে যেখানে ছাহাবী বলেছেন قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...إلخ 'রাসূল (ছা.) বলেছেন.. '। যদি এই কওলী হাদীছগুলো বিশ্লেষণ করা হয়, তবে দেখা যায় দুই জন বা তিন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে কতিপয় শব্দের কম-বেশী

১৪৭. Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri : Quranic Commentary and Tradition*, vol. 2, p.1.

১৪৮. *The Musnad of Al-Tayalisi: A Study of Islamic Hadith as Oral Literature* (Connecticut (USA) : Hartford Seminary Foundation, 1970).

১৪৯. *Narrative Structures in the Hadīth* (Chicago : Journal of Near Eastern Studies, Vol. 59, No. 4 (Oct., 2000), pp. 271.

ছাড়া মূল বক্তব্যের কোনই পরিবর্তন ঘটেনি। এখান থেকে স্পষ্ট হয় যে, ছাহাবীগণ এবং পরবর্তী বর্ণনাকারীগণ হাদীছ বর্ণনার সময় শব্দগত বিবরণের চেষ্টায় কোন অবহেলা করেননি। বরং তারা সাধ্যমত হুবহু বর্ণনার চেষ্টা করেছেন। এতে কখনও হয়ত শব্দের আগ-পিছ হয়েছে কিংবা কোন শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যা হাদীছের মূল অর্থ বা বিষয়বস্তুর কোন পরিবর্তন ঘটায় নি।[১৫০]

ঙ. হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীগণ এমনই সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে প্রায়শই বলতেন, أو كما قال ,أو كما ورد ,أو نحوه ,أو شبهه অর্থাৎ 'রাসূল (ছা.) সম্ভবত অনুরূপ বলেছেন' বা 'সম্ভবত এভাবে বর্ণিত হয়েছে' ইত্যাদি অনিশ্চয়তাবোধক বক্তব্য। হাদীছ গ্রন্থসমূহে এমন উদাহরণ অসংখ্য পাওয়া যায়। শুধু রাসূল (ছা.)-ই নন বরং ঊর্ধ্বতন যে কোন বর্ণনাকারী বা তার বর্ণনা সম্পর্কে তাঁরা এমন সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং সন্দেহ হলেই তা প্রকাশ করতেন। যা মুহাদ্দিছদের নিকট شك من الراوي (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) হিসাবে পরিচিত। ইমাম ইবনু মাজাহ (২৭৩হি.) তাঁর সুনানে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (রাসূল (ছা.)-এর হাদীছের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন) শিরোনামে এবং এতে ছাহাবী ও তাবেঈদের সতর্কতা সম্পর্কে বেশ কিছু বর্ণনা একত্রিত করেছেন। যেমন ইবনু সীরীন হ'তে বর্ণিত আনাস (রা.) রাসূল (ছা.) হ'তে কোন হাদীছ বর্ণনার সময় ভীত হ'তেন এবং বলতেন, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 'অথবা রাসূল (ছা.) অনুরূপ বলেছেন'।[১৫১] তাবেঈ এবং তৎপরবর্তী যুগেও অনেক বর্ণনাকারী এত সতর্কতা অবলম্বন করতেন যে, কোন বর্ণ ও অব্যয় পর্যন্ত পরিত্যাগ করতেন না। সুলায়মান ইবনু মিহরান আল-আ'মাশ (১৪৮হি.) বলেন, كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد فيه واوا أو ألفا أو دالا '(হাদীছের) জ্ঞান এমন একদল মানুষের নিকট রক্ষিত ছিল যাদের কারো নিকট হাদীছের মধ্যে 'ওয়াও', 'আলিফ', 'দাল' বৃদ্ধি করা থেকে আসমান থেকে পড়ে যাওয়াই অধিক প্রিয়তর ছিল।'[১৫২]

---

১৫০. আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী, *আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ*, পৃ. ৭৯।
১৫১. *সুনান ইবনু মাজাহ*, হা/২৪।
১৫২. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ১৭৭।

ইমাম মুসলিম (২৬১হি.)-এর ‘ছহীহ’ অধ্যয়ন করলে এই সতর্কতা চমৎকারভাবে অনুধাবন করা যায়। তিনি মতনে সামান্য একটি সমার্থবোধক শব্দের পরিবর্তন পেলেও তা উল্লেখ করেছেন। যাতে অর্থের কোনই পরিবর্তন হয় না কিংবা হলেও এত সূক্ষ্ম পরিবর্তন যা প্রকৃত জ্ঞানী ব্যতীত কেউ অনুভব করতে পারবে না। এছাড়া ইমাম আহমাদ (২৪১হি.) তাঁর মুসনাদে এবং আবূ দাউদ তাঁর সুনানে এই নীতি সূক্ষ্মভাবে অবলম্বন করেছেন।[১৫৩] এছাড়া কোন হাদীছের ক্ষেত্রে সত্য সত্যই এমন শব্দ যদি ঢুকে যায় যা রাসূল (ছা.)-এর বর্ণিত বাক্য নয় বলে অনুমিত হয়, তবে মুহাদ্দিছগণ সেটি المدرج বা অনুপ্রবিষ্ট কথা হিসাবে চিহ্নিত করে তা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন।

সুতরাং আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, হাদীছের অর্থগত বর্ণনার কারণে হাদীছের বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতায় কোন প্রভাব পড়ে না। আর এতে হাদীছের অর্থে ও বিষয়বস্তুতে কোন বিকৃতিরও প্রশ্ন আসে না। অতএব এ যুক্তিও এখানে প্রযোজ্য নয় যে, হাদীছের ভাষ্যসমূহ রাসূল (ছা.)-এর নিজের বর্ণিত শব্দ নয় বরং তা পরবর্তী বর্ণনাকারীদের নিজস্ব চয়ন। বরং অর্থগত বর্ণনাকে আমরা কুরআনের প্রচলিত বিভিন্ন ‘ক্বিরাআত’-এর সাথে তুলনা করতে পারি, যাতে শব্দের ভিন্নতায় মূল অর্থের পরিবর্তন হয় না।

চ. কতিপয় প্রাচীন ভাষাবিদ যেমন সিবওয়াইহ (১৮০হি.), আবুল হাসান আল-কিসাঈ (১৮৯হি.), আবূ যাকারিয়া আল-ফার্রা (২০৭হি.) প্রমুখ বিশুদ্ধ আরবী ভাষার দলীল হিসাবে তাঁদের গ্রন্থসমূহে কুরআনের আয়াত কিংবা আরবী কবিতাসমূহ ব্যবহার করলেও হাদীছের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেননি কেন? এ প্রশ্নের জবাবে ড. ছুবহী ছালিহ বলেন, এর কারণ সম্ভবত তৎকালীন সময়ে হাদীছ ও ফিকহের পণ্ডিত ব্যতীত অন্যদের নিকট হাদীছগ্রন্থ সমূহের দুষ্প্রাপ্যতা। নতুবা তারা আরবী কবিতার আশ্রয় নেওয়ার পরিবর্তে হাদীছ থেকেই উদ্ধৃতি দিতেন, যেমনটি দেখা গেছে পরবর্তী ভাষাবিদদের ক্ষেত্রে। যেমন আবুল মানছূর আল-আযহারী (৩৭০হি.) সংকলিত تهذيب اللغة, ইসমাঈল ইবনু হাম্মাদ আল-জাওহারী (৩৯৩হি.) সংকলিত الصحاح, ইবনু ফারিস (৩৯৫হি.) সংকলিত معجم مقاييس اللغة প্রভৃতি অভিধানে হাদীছ থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে।[১৫৪] সুতরাং এই যুক্তিও হাদীছ অস্বীকারের জন্য কোন দলীল হ’তে পারে না।

---

১৫৩. শামসুদ্দীন আস-সাখাভী, *ফাতহুল মুগীছ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১।
১৫৪. ছুবহী ছালিহ, *উলূমুল হাদীছ ওয়া মুছত্বলাহুহু*, পৃ. ৩২২।

সংশয়-১০ : হাদীছ হুকুমগতভাবে যান্নী বা ধারণা নির্ভর।

হাদীছ শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিদের নিকট অজানা নয় যে, খবর ওয়াহিদ হাদীছকে বিদ্বানদের একটি দল 'যান্নী' আখ্যায়িত করেছেন, যা প্রবল ধারণার অর্থ দেয় এবং এর ভিত্তিতে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব হয়। কিন্তু হাদীছ অস্বীকারকারীগণ বিদ্বানদের এই 'যান্নী' শব্দটি হাদীছ অস্বীকারের জন্য দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং ধারণা করেছেন, যেহেতু হাদীছ 'যান্নী' বা ধারণা নির্ভর, অতএব তা শারঈ বিষয়ে বৈধ নয়। তাদের দলীল হ'ল, আল্লাহ বলেছেন, وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا 'আর নিশ্চয় ধারণা সত্যের মোকাবেলায় কোনই কাজে আসে না।'[১৫৫]

পর্যালোচনা :

ক. খবর ওয়াহিদ হাদীছ 'যান্নী' হওয়া বিদ্বানদের একটি বিশেষ পরিভাষা। যার অর্থ হ'ল, খবর ওয়াহিদ হাদীছ যাবতীয় যাচাই-বাছাইয়ের পর অপেক্ষাকৃত প্রবল ধারণাভিত্তিক জ্ঞান প্রদান করে। বিদ্বানগণ হাদীছটির সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পরও প্রবল সতর্কতাস্বরূপ আল্লাহ্র ওপর যিম্মাদারী ছেড়ে দিতে খবর ওয়াহিদকে 'যান্নী' বলেন। যেমনভাবে একজন মুফতী নিজের প্রদত্ত ফৎওয়ার উপর নিশ্চিত বিশ্বাস রাখার পরও বলেন যে, والله أعلم 'আল্লাহই অধিক অবগত'। সুতরাং এখানে 'যান্নী' পরিভাষাটি উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত নিন্দিত ধারণা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, বরং এটি একটি স্বতন্ত্র পরিভাষা। বিদ্বানগণ খবর ওয়াহিদকে যখন 'যান্নী' বলেন, তখন তার ওপর প্রবল ধারণাভিত্তিক নিশ্চিত বিশ্বাস রেখে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব বলে থাকেন। অর্থাৎ তারা খবর ওয়াহিদকে অনিশ্চিত (الوهم) বা সন্দেহ (الشك) পূর্ণ মনে করেন না, বরং নিশ্চিত বিশ্বাসই মনে করেন। তবে তা মুতাওয়াতিরের মত পঞ্চেন্দ্রেয়প্রাপ্ত ইয়াক্বীন নয়–শুধু এ কথা বুঝানোর জন্য বলা হয়ে থাকে খবর ওয়াহিদ দ্বারা 'যান্ন' লাভ হয়ে থাকে।[১৫৬] সুতরাং এতে হাদীছের বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা ক্ষুণ্ন হয় না। উপরন্তু বিদ্বানদের একটি বড় দল তথা মুহাদ্দিছগণ খবর ওয়াহিদ হাদীছকে 'যান্নী' আখ্যা দেওয়া সমর্থন করেন না। বরং প্রমাণসাপেক্ষে তা ইলমুল ইয়াক্বীন বা নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে মনে করেন, যা আমরা অন্যত্র আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

---

১৫৫. সূরা আন-নাজম, আয়াত নং : ২৮।
১৫৬. নূর মোহাম্মদ আ'জমী, *হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, পৃ. ৯-১০।

খ. হাদীছকে যদি 'যান্নী' হওয়ার অভিযোগে পরিত্যাগ করতে হয়, তবে কুরআনও পরিত্যাগ করার অবকাশ সৃষ্টি হয়। কেননা কুরআন বিশুদ্ধতার দিক থেকে 'ক্বাতঈ' বা অকাট্য হলেও অর্থগত দিক থেকে অনেক সময় 'যান্নী' (ظني الدلالة)। যেমন তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে– وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ 'আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন 'কুরু' পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে।'[১৫৭] এখানে 'কুরু' শব্দটি দু'টি অর্থ বহন করে। (১) হায়েয বা ঋতু। (২) তুহূর বা ঋতু শেষে পবিত্রতালাভ। সুতরাং আয়াতটি 'যান্নী' অর্থ দেয়। এখন এই কারণে কি কুরআন বর্জন করতে হবে যে, তা 'যান্নী' অর্থ প্রদান করে?

গ. কুরআন নিজেই 'যান্ন'-কে শারঈ দলীল হিসাবে ব্যবহার করেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ 'অতঃপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয়) তালাক দেয়, তাহ'লে সে যতক্ষণ তাকে ব্যতীত অন্য স্বামী গ্রহণ না করে, ততক্ষণ উক্ত স্ত্রী তার জন্য সিদ্ধ হবে না। অতঃপর যদি উক্ত স্বামী তাকে তালাক দেয়, তখন তাদের উভয়ের পুনরায় ফিরে আসায় কোন দোষ নেই, যদি তারা (দৃঢ়) ধারণা রাখে যে, তারা আল্লাহ্র সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে।'[১৫৮] অর্থাৎ এই আয়াতে আল্লাহ পুনরায় স্বামী ও স্ত্রীকে একত্রিত হওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন, যদি তারা উভয়ে আল্লাহ্র সীমারেখার মধ্যে থেকে দাম্পত্য জীবন পরিচালনার (দৃঢ়) ধারণা রাখে। সুতরাং আল্লাহ নিজেই এখানে 'যান্ন'কে শারঈ দলীল হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অতএব খবর ওয়াহিদ হাদীছ 'যান্নী' হওয়ার কারণে তার ওপর আমল পরিত্যাগের কোন সুযোগ নেই।

ঘ. ইসলামী শরী'আতে 'যান্ন'-কে সরাসরি দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন শারঈ হুকুমসমূহ বাস্তবায়নের মূল স্থান হ'ল আদালত। কিন্তু কেউ কি নিশ্চয়তা দিতে পারে যে, আদালত থেকে প্রত্যেক বিচারক যে হুকুম প্রদান করেন তা শতভাগ সঠিক? যেমন রাসূল (ছা.) বলেন, إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة

---

১৫৭. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং : ২২৮।
১৫৮. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং : ২৩০।

من النار 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা আমার নিকট বিবাদ মিমাংসার জন্য এসে থাক। তোমাদের এক পক্ষ অন্য পক্ষ অপেক্ষা দলীল-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে অধিক পারদর্শী হ'তে পারে। অতএব আমি যেভাবে (তোমাদের বক্তব্য) শুনি সেই মোতাবেক ফয়ছালা দেয়ার পর যদি কাউকে তার অন্য ভাইয়ের হক্ব দিয়ে দেই, তাহ'লে সে যেন তা গ্রহণ না করে। কেননা, আমি তার জন্য জাহান্নামের একটি অংশই পৃথক করে দিচ্ছি।'[১৫৯] অর্থাৎ রাসূল (ছা.) নিজেই যদি তাঁর বিচার শতভাগ সঠিক বা 'ক্বাতঈ' হওয়ার নিশ্চয়তা না দেন, তবে অন্যদের ক্ষেত্রে তা কিভাবে অকাট্য নিশ্চয়তা বহন করবে? সুতরাং বিচারিক আদালতগুলো 'যান্ন' বা প্রবল ধারণা ভিত্তিক দলীলের আলোকেই পরিচালিত হয়, যা সুপরিজ্ঞাত বিষয়।

দ্বিতীয়ত, আদালত সাক্ষ্য ও অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে রায় প্রদান করে থাকে। কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, সাক্ষ্য কখনও ভুল হ'তে পারে কিংবা সাক্ষ্যদাতা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েও সাক্ষ্য দিতে পারে। কিন্তু তারপরও সাক্ষীর সততার ওপর আস্থা রাখা হয়। পৃথিবীর মুসলিম, অমুসলিম সমস্ত আদালত সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল, যা আদ্যোপান্ত 'যান্নী'। সাক্ষীর জন্য সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতাকে শর্ত করা হয় এজন্য যেন প্রবল ধারণার মাধ্যমে সঠিক বিষয়টি অবগত হওয়া যায়।

আল্লাহ বলেন, فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ 'কিন্তু যদি জানা যায় যে, তারা পাপে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে প্রথম দু'ব্যক্তি যাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করেছে তাদের থেকে অপর দু'ব্যক্তি এদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অতঃপর তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে, 'অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্য থেকে অধিক সত্য এবং আমরা সীমালঙ্ঘন করিনি; করলে অবশ্যই আমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব'।[১৬০] এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সাক্ষীর ভুল হ'তে পারে। ফলে সকল প্রকার সাক্ষ্য 'যান্নী', কিন্তু তা শারঈ আইনে দলীল হিসাবে পরিগৃহীত।[১৬১]

---

১৫৯. *ছহীহুল বুখারী*, হা/২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৯ প্রভৃতি; *ছহীহ মুসলিম*, হা/১৭১৩।
১৬০. সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত নং : ১০৭।
১৬১. ইসমাঈল সালাফী, *হুজ্জিয়াতে হাদীছ*, পৃ. ৩৩-৩৫।

ঙ. পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক তথ্যই পঞ্চন্দ্রেয় তথা মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণ করা সম্ভব। এমনকি পঞ্চন্দ্রেয় দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যও সব সময় নিশ্চয়তাবোধক অর্থ দেয় না। যেমন আমরা রাতের আসমানে খালি চোখে যে তারকার সংখ্যা প্রত্যক্ষ করি, তা সত্য ধারণা দেয় না। কেননা তারার প্রকৃত সংখ্যা আমাদের প্রত্যক্ষকৃত তারকার চেয়ে শত-কোটিগুণ বেশী, যা প্রমাণিত সত্য। অথচ আমরা তা স্বচক্ষেই দেখেছি। দূর পাহাড়ের বড় বড় বৃক্ষরাজি আমাদের চোখে ক্ষুদ্র শাখার মত দেখায়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। অতএব একান্ত স্বচক্ষে দেখা জিনিসও যখন ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, তখন সীমিত মানবীয় সামর্থ্য দিয়ে কোন বিষয়ে অকাট্য জ্ঞান লাভের দাবী করা সুকঠিন বিষয়।

চ. খবর ওয়াহিদ 'সুপ্রসিদ্ধ' (مشهور) না হওয়াই তার সঠিক না হওয়ার দলীল– এই দাবীর জবাবে ড. আলী জারীশাহ (১৯৩৫-২০১১খ্রি.) বলেন, কোন বিষয় সুপ্রসিদ্ধ হওয়ার সাথে তার সঠিক হওয়ার সম্পর্ক নেই, যেমন সম্পর্ক নেই সত্য এবং বাস্তবতার মাঝে। সত্য কখনও বাস্তব হ'তে পারে, আবার অবাস্তবও হ'তে পারে। তেমনি বাস্তবতা কখনও সত্য হ'তে পারে, আবার অসত্যও হ'তে পারে। অনুরূপভাবে সুপ্রসিদ্ধ বিষয় কখনও সঠিক হ'তে পারে, তেমনি বেঠিকও হ'তে পারে। আবার সঠিক বিষয় কখনও সুপ্রসিদ্ধ হ'তে পারে, আবার অপ্রসিদ্ধও হ'তে পারে।[১৬২]

ছ. আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছা.) সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার রাসূল তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা তোমরা বর্জন কর'।[১৬৩] সুতরাং তা যদি বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া যায়, তবে তার ওপরই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। তাকে অকাট্য এবং ধারণানির্ভর ভাগে বিভক্ত করে কিছু অংশকে স্বীকার করা এবং কিছু অংশ পরিত্যাগ করা সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্র নীতিবিরোধী।[১৬৪] আল্লাহ বলেন, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ 'তোমরা আল্লাহ্র কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর, আর কিছু অংশ অবিশ্বাস কর? তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে তাদের দুর্গতি ছাড়া কিছুই পাওয়ার নেই। আর ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে।'[১৬৫]

---

১৬২. ড. আলী জারীশাহ, *মাছাদিরুশ শারী'আহ আল-ইসলামিয়াহ*, পৃ. ৩৫।
১৬৩. সূরা হাশর, ৭ নং আয়াত।
১৬৪. ড. মুহাম্মাদ আলী আছ-ছাবূনী, *আস-সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ আল-মুতাহ্হারাহ*, পৃ. ৫৯-৬০।
১৬৫. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত নং : ৮৫।

২য় পরিচ্ছেদ

ইতিহাসগত সমালোচনা

সংশয়-১ : হাদীছের সংরক্ষণ পদ্ধতি ছিল শ্রুতি ও স্মৃতিবাহিত।

হাদীছ অস্বীকাকারী এবং প্রাচ্যবিদদের একটি সাধারণ যুক্তি হ'ল, হাদীছ মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে। অতএব এতে বর্ণনাকারী স্মৃতি বিভ্রাটের কারণে নিশ্চয়ই ভুল করবেন। মানুষ মাত্রই এমন ভুল হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং হাদীছ সংকলনের যুগ পর্যন্ত হাদীছ সঠিকভাবে সংরক্ষিত থাকতে পারে না। এজন্য হাদীছ শরী'আতের কোন দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

পর্যালোচনা :

ক. প্রাথমিক যুগে মুখস্থকরণ এবং শ্রুতিবর্ণনাই ছিল জ্ঞান সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম। বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে লেখনীকে মুখস্তকরণের চেয়ে অধিকতর বিশ্বস্ত এবং প্রামাণিক মনে হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হ'ল যে, লেখনীতেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে কিংবা সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করতে পারলে বিনষ্টও হয়ে যায়। এ জন্য মুহাদ্দিছগণকে দেখা যায় যে, তারা লেখনীর চেয়ে শ্রুতিবর্ণনাকে অধিক প্রাধান্য দিতেন। তারা বর্ণনাকারীদের বর্ণনা গ্রহণের সময় তাদের শ্রুত বর্ণনা (সিমা') সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করেছেন, অথচ লিখিত বর্ণনা (মুকাতাবা, মুনাওয়ালা) গ্রহণে মতবিরোধ করেছেন।[১৬৬] তারা কোন বর্ণনাকারীর নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণই করতেন না যতক্ষণ না তার স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে তারা আশ্বস্ত হতেন। এমনকি কেবল স্মৃতিশক্তির তারতম্যের কারণে তারা হাদীছকে 'ছহীহ' ও 'হাসান' দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। সুতরাং হাদীছ শাস্ত্রে 'স্মৃতিশক্তি' কোন সাধারণ বিষয় নয় বরং এটি হাদীছ বর্ণনাকারীদের বর্ণনার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি বহুল ব্যবহৃত উপকরণ (Technical term)। মুহাদ্দিছগণ 'আসমাউর রিজাল' এবং 'জারাহ ও তা'দীল' শাস্ত্রের

---

১৬৬. ইবনে হাজার আসক্বালানী, *হাদিউস সারী মুকাদ্দামাতু ফাতহুল বারী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬।

উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে, যাতে বর্ণনাকারীদেরকে উক্ত মানদণ্ডে যাচাই করা সম্ভব হয়। কারও স্মৃতিশক্তি যদি ত্রুটিপূর্ণ এবং দুর্বল হত, তবে তার হাদীছ নিয়মতান্ত্রিকভাবেই গৃহীত হ'ত না, যদি না অপর কোন শক্তিশালী হাদীছ তার সপক্ষে না থাকত।

এখানে আরও লক্ষ্যণীয় যে, এসকল বর্ণনাকারীদের স্মৃতিশক্তিকে সাধারণ কিচ্ছা বর্ণনাকারীর মেধার সাথে তুলনা করার সুযোগ নেই। কেননা যারা হাদীছ মুখস্থ করতেন এবং অপরের কাছে পৌঁছে দিতেন তাদের নৈতিক অবস্থান এমন ছিল যে, তারা হৃদয়ের পূর্ণ আবেগ ও বিশ্বাস নিয়ে উপলব্ধি করতেন যে তাদের দায়িত্বটা কত গুরুত্বপূর্ণ। তারা জানতেন তাদের সামান্য অবহেলা ও ভুলের কারণে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরকে নিন্দিত হতে হবে। এই বিশ্বাস তাদেরকে এক প্রগাঢ় নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধে সর্বদা উজ্জীবিত রাখত। একজন সাংবাদিক কোন রাষ্ট্রপ্রধান সম্পর্কে সংবাদ তৈরী করার সময় যেমন কঠোর সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতা অবলম্বন করে থাকে, তার চেয়ে বহুগুণ দায়িত্বশীলতা ও অভিনিবেশ সহকারে ছাহাবী ও তাবেঈগণ তাদের প্রাণপুরুষ রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ প্রচার করেছেন। এই মনস্তাত্ত্বিক বাস্ত বতাকে যারা অস্বীকার করেন, তারা যেন দিনের আলোকে হস্ততালু দিয়ে আড়াল করতে চান।[১৬৭]

ছাহাবীগণ রাসূল (ছা.)-এর প্রতিটি পদক্ষেপের অনুসরণ করতেন। এমনকি হাদীছ বর্ণনার সময় যে ভঙ্গিতে তিনি বর্ণনা করেছেন, সেই বর্ণনাভঙ্গিকে পর্যন্ত তারা প্রজন্ম পরম্পরায় নকল করতেন। যা হাদীছ শাস্ত্রে 'মুসালসাল হাদীছ'[১৬৮] নামে পরিচিত। তারা কোন হাদীছের অর্থ বুঝতে না

---

১৬৭. Muhammad Taqi Usmani, *The Authority of Sunnah*, p. 86-88.

১৬৮. এই হাদীছের উদাহরণ হ'ল যেমন আনাস (রা.) রাসূল (ছা.) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره، وشره، وحلوه، ومر ، قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته، فقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره 'কোন ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না সে তাক্বদীরের ভাল-মন্দ এবং তার মিষ্টতা ও তিক্ততার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে। আনাস (রা.) বলেন, অতঃপর রাসূল (ছা.) তাঁর নিজের দাড়ি ধরলেন এবং বললেন, আমি তাক্বদীরের ভাল-মন্দ এবং তার মিষ্টতা ও তিক্ততা প্রতি বিশ্বাস করি'। হাদীছটি উল্লেখের সময় আনাস (রা.) নিজেও রাসূল (ছা.)-এর অনুকরণে দাড়ি ধরেন। অতঃপর পরবর্তী সমস্ত রাবী যখন হাদীছটি বর্ণনা করতেন তখন একইভাবে নিজেদের দাড়ি ধারণ করতেন। রাসূল (ছা.)-এর কথা ও বাচনভঙ্গি এভাবে হুবহু নকল করার পদ্ধতিকে মুসালসাল হাদীছ বলা হয়। ইমাম আল-হাকিম (৪০৫হি.) এই উদাহরণটি

পারলে তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করে স্পষ্ট হয়ে নিতেন। তারা খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন কিভাবে ও কোন পরিবেশে রাসূল (ছা.) কী বলেছেন এবং কী করেছেন। সুতরাং তারা প্রত্যেকেই স্বয়ং ছিলেন হাদীছের লিখিত পাণ্ডুলিপির সমতুল্য। কেবল একটি নয় বরং শত শত লিখিত পাণ্ডুলিপি। মানাযির আহসান গিলানী (১৮৯২-১৯৫৬খ্রি.) তাই যথার্থই বলেছেন, ছাহাবীদের সংখ্যা এবং তাদের মুখস্থশক্তি এবং আমলের উপর তাদের চূড়ান্ত আগ্রহের বাস্তবতাকে সামনে রাখলে এটা বলা মোটেও বাড়াবাড়ি হবে না যে, আমাদের ঐ ইতিহাস যার নাম হাদীছ, তার পূর্ণাঙ্গ এবং অপূর্ণাঙ্গ জীবন্ত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা রাসূল (ছা.)-এর যুগেই লাখের কোঠায় পৌঁছে গিয়েছিল।[১৬৯]

অতএব এটি ভাবার কোন অবকাশ নেই যে, হাদীছ শাস্ত্র প্রাথমিক যুগে লিখিত সংকলিত না হওয়ায় তা সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয় নি; বরং তৎকালীন সমাজে মুখস্থকরণই যে সবচেয়ে শক্তিশালী ও নিরাপদ মাধ্যম ছিল, তার বড় প্রমাণ হ'ল মুহাদ্দিছগণ শ্রুতিবর্ণনাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছেন এবং স্মৃতিশক্তিকে হাদীছ বর্ণনাকারীদের প্রধানতম যোগ্যতা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।[১৭০]

উছূলবিদ বা ইসলামী আইনজ্ঞদের নিকটও লিখিত হাদীছের তুলনায় শ্রুত হাদীছের গুরুত্বই অধিক। যেমন ইমাম আমেদী বলেন, أن تكون رواية أحد الخبرين عن سماع من النبي عليه السلام، والرواية الأخرى عن كتاب، فرواية السماع أولى لبعدها عن تطرق التصحيف والغلط. 'দুটি হাদীছের মধ্যে একটি হাদীছ যদি হয় রাসূল (ছা.)-এর নিকট থেকে শ্রুত এবং অপরটি হয় কিতাবে লিপিবদ্ধ; তবে ভুল এবং ওলট-পালট হওয়ার সম্ভবনা থেকে দূরবর্তী হওয়ার কারণে শ্রুত বর্ণনাটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে'।[১৭১]

সুতরাং লেখনী জ্ঞান সংরক্ষণের একমাত্র মাধ্যম নয় এবং সর্বোত্তম মাধ্যমও নয়। বরং মুখস্থকরণ ও হৃদয়াঙ্গমই জ্ঞান সংরক্ষণের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। বিশেষ করে প্রাচীনকালে যখন লেখনীর কোন প্রচলন

তাঁর স্তর পর্যন্ত বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতাসহ প্রদান করেছেন (*মা'রিফাতু উলূমিল হাদীছ* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় প্রকাশ : ১৯৭৭খ্রি.), পৃ. ৩১-৩২)।

১৬৯. মানাযির আহসান গিলানী, *তাদবীনে হাদীছ*, পৃ. ৪৪।

১৭০. Muhammad Taqi Usmani, *The Authority of Sunnah*, p. 88.

১৭১. আবুল হাসান আল-আমিদী, *আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮৪।

ছিল না, তখন শ্রুতি থেকে স্মৃতিতে ধারণ করাই একমাত্র এবং সর্বাধিক শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ. জ্ঞান সংরক্ষণের জন্য লিপিবদ্ধকরণ শ্রুতিবর্ণনার চেয়ে অধিকতর নিশ্চয়তা বহন করে না। কেননা জ্ঞান সংরক্ষণের সঠিক উপায় হ'ল, একজন সুপরিচিত ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি অপর একজন সুপরিচিত ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট তা পৌঁছে দেবেন, সেটা শ্রুতিবর্ণনার ভিত্তিতে হোক, কিংবা লেখনীর ভিত্তিতে হোক। যদি দু'টি একত্রিত হয় তবে নিঃসন্দেহে তা সংরক্ষণের অধিকতর শক্তিশালী উপায়। কিন্তু যদি ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা হারিয়ে যায়, তবে শ্রুতিবর্ণনা বা লেখনীর কোন মূল্য থাকে না; বরং এক্ষেত্রে যদি লেখক ছাড়া শুধুমাত্র লেখনী থাকে, তবে তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হয় না। কেননা লেখকের নাম-পরিচয় ছাড়া লেখনীর কোনই মূল্য নেই। যার বাস্তব প্রমাণ হ'ল ইহূদী এবং খৃষ্টানগণ, যারা তাওরাত ও ইঞ্জিল লিপিবদ্ধ করত, কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা না থাকায় তারা কিতাবের মধ্যে নানা বিকৃতি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটিয়েছিল। এমনকি এর লেখকদের পরিচয়ও সঠিকভাবে জানা যায় না। ফলে এই কিতাবদ্বয়ের কোন কিছুই আমাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না বরং তা আমরা মূল আল্লাহ প্রেরিত কিতাবের বিরোধী বলে বিশ্বাস করি।[১৭২] আল্লাহ নিজেই তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ 'অতঃপর দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা নিজেদের হাতে কিতাব লেখে এবং বলে যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আগত। যাতে তার বিনিময়ে সামান্য কিছু অর্থ রোজগার করতে পারে। অতএব দুর্ভোগ, তাদের হস্ত যা লিপিবদ্ধ করেছে তার জন্য এবং দুর্ভোগ তাদের উপার্জনের জন্য।'[১৭৩] এজন্য মুহাদ্দিছগণ সর্বাগ্রে বর্ণনাকারীর পরিচয়, তার বিশ্বস্ততা এবং মুখস্থ ও হৃদয়াঙ্গমের শক্তি যাচাই করতেন, তারপর তার বর্ণনা গ্রহণ করতেন।

গ. শুধু হাদীছের ক্ষেত্রেই নয়, বরং প্রাচীন আরবী কবিতা, বিভিন্ন জাতির ইতিহাস, বংশলতিকা প্রভৃতি সংরক্ষণেও তৎকালীন আরব সমাজ সব সময় শ্রুতি বর্ণনার ওপর নির্ভরশীল ছিল। উদাহরণস্বরূপ আরব কবিদের

---

১৭২. দ্র. আব্দুল গনী আব্দুল খালিক, *হুজ্জিয়াতুল হাদীছ*, পৃ. ৩৯৯।
১৭৩. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত : ৭৯।

কবিতাসমূহও ৩য় শতাব্দী হিজরীর পূর্বে গ্রন্থাবদ্ধ হয়নি। এগুলো মানুষের স্মৃতিতে কিংবা কারো ব্যক্তিগত চিরকুটে সংরক্ষিত ছিল। পরবর্তী প্রজন্মে আল-আসমারী (২১৩হি.), আবূ উবাইদাহ (১৫৭হি.) প্রমুখের মাধ্যমে তা গ্রন্থাবদ্ধ হয়।[১৭৪] শুধুমাত্র ইসলামী জ্ঞান ও কবিতার ক্ষেত্রেই নয় বরং ইতিহাস, ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন ও কলার বিভিন্ন শাখাতেও তা সমভাবে মূল্যায়িত হত।[১৭৫] এজন্য মুসলিম সমাজে আগাগোড়াই স্মৃতিনির্ভর জ্ঞান প্রাধান্য পেয়েছে। এমনকি আধুনিক যুগে লেখনীর যাবতীয় উপায়-উপকরণ উপস্থিত এবং মুখস্থকরণের প্রয়োজনীয়তা নিতান্তই গৌণ; কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা বিশ্বে লক্ষ-কোটি কুরআনের পূর্ণ হাফেয রয়েছে এবং প্রতিনিয়ত তৈরী হচ্ছে। সুতরাং যে যুগে লিখিত সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল অপ্রচলিত এবং মুখস্থকরণই ছিল জ্ঞান সংরক্ষণের প্রধান মাধ্যম, সে যুগে হাদীছ মুখস্থকরণের মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয়েছিল, তাতে বিস্ময়ের কি রয়েছে? সমগ্র কুরআন মুখস্থকরণ যদি লক্ষ-কোটি মানুষের পক্ষে এই যুগেই সম্ভব হয়, তবে যে যুগ ছিল নিখাঁদ স্মৃতি নির্ভরতার যুগ, সে যুগে হাদীছ মুখস্থ রাখা কী এতই সুকঠিন ব্যাপার ছিল?

ঘ. পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিছগণ হাদীছ লিখিতভাবে সংকলিত হওয়ার পরও শ্রুত বস্তুকে একচেটিয়াভাবে প্রাধান্য দিতেন। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'ল ২য় শতকের শুরু থেকেই প্রায় প্রত্যেক মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছের লিখিত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত থাকলেও তারা অপরের নিকট হাদীছ বর্ণনা করতেন 'আমাদেরকে বলেছেন' (أخبرنا) কিংবা 'আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন' (حدثنا) প্রভৃতি শ্রুতিবাচক শব্দ দ্বারা। অর্থাৎ তারা পুস্তকের চেয়ে ব্যক্তিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন। তারা পাণ্ডুলিপি নির্ভর জ্ঞান এবং এতদসংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তির সম্ভবনা দূর করার জন্য পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি হাদীছটি বর্ণনাকারী উস্তাদ থেকে স্বকর্ণে শ্রবণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। এজন্য হাদীছ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থের বা পাণ্ডুলিপির উদ্ধৃতি প্রদানের নিয়ম ছিল না। বরং বর্ণনাকারী শিক্ষকের নাম উল্লেখ করার নিয়ম ছিল। মুহাদ্দিছদের পরিভাষায় 'আমাদেরকে বলেছেন' (أخبرنا) কিংবা 'আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন' (حدثنا) পরিভাষাটির অর্থ হ'ল আমি তাঁর পুস্ত

---

১৭৪. Gregor Schoeler, *The Genesis of Literature in Islam: From the Aural to the Read*, p. 5.

১৭৫. Ibid, p. 54-120, 122-123.

কটি তাঁর নিজের কাছে বা তাঁর অমুক ছাত্রের কাছে পড়ে স্বকর্ণে শুনে তা থেকে হাদীছটি উদ্ধৃত করছি।[১৭৬]

এজন্য ইমাম বুখারী (২৫৬হি.) তাঁর গ্রন্থে হাদীছ বর্ণনার সময় ইমাম মালিক সূত্রে অনেক হাদীছ বর্ণনা করলেও কোথাও মুওয়াত্ত্বা মালিক গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেননি, বরং সরাসরি যারা ইমাম মালিকের মুখ থেকে শুনেছেন তাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ ছহীহ বুখারীর একটি হাদীছ - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريـــرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: فيه ساعة، لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئا، إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها 'আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনু মাসলামা, তিনি মালিক থেকে, তিনি আবুয যিনাদ থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ছা.) শুক্রবারের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই দিনের মধ্যে একটি সময় রয়েছে কোন মুসলিম যদি সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ছালাতরত অবস্থায় আল্লাহ্র নিকট কিছু প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ তাকে তা প্রদান করেন। রাসূল (ছা.) হাত দিয়ে ইঙ্গিত করেন যে, এই সুযোগটি স্বল্প সময়ের জন্য।'[১৭৭]

একই হাদীছ ইমাম মুসলিম (২৫৬হি.) যখন উল্লেখ করছেন, তখন তিনি সনদ বর্ণনা করছেন এভাবে যে وحدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس عن أبي الزنـــاد، عـــن الأعرج، عن أبي هريرة অর্থাৎ তিনি দুইটি সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করছেন একটি হ'ল ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া থেকে যিনি ইমাম মালিকের নিকট হাদীছটি পাঠ করে ইমাম মুসলিমের নিকট বর্ণনা করেছেন আর অপর সূত্রে কুতাইবা ইবনু সাঈদ ইমাম মালিকের নিকট থেকে শ্রবণ করে তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন।[১৭৮] এখানেও দেখা যায় ইমাম মুসলিম 'মুওয়াত্ত্বা মালিক' কিতাব থেকে উদ্ধৃতি না

---

১৭৬. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *দিরাসাতুল ফীল হাদীছ আন-নববী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৭-৫৯৪; ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *হাদীসের নামে জালিয়াতি* (ঝিনাইদহ : আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৩য় প্রকাশ : ২০০৮খ্রি.), পৃ. ৯১-৯২।

১৭৭. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৯৩৫।

১৭৮. *ছহীহুল মুসলিম*, হা/৮৫২।

দিয়ে সরাসরি বর্ণনাকারীর শ্রুতির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অথচ সেই বর্ণনাকারী নিজেই বলছেন যে, তিনি ইমাম মালিকের নিকট হাদীছটি লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠ করেছিলেন।

অনুরূপভাবে আবূ দাঊদ (২৭৫হি.)[১৭৯], আত-তিরমিযী (২৭৯হি.)[১৮০], আন-নাসাঈ (৩০৩হি.)[১৮১], ইবনু হিব্বান (৩৫৩হি.)[১৮২], আত-তাবারানী (৩৬০হি.)[১৮৩] সকলেই হাদীছটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছেন কিন্তু কেউই 'মুওয়াত্ত্বা মালিক' কিতাব থেকে উদ্ধৃতি দেন নি। এমনকি পঞ্চম শতকের মুহাদ্দিছ আবূ বকর আল-বায়হাক্বী (৪৫৮হি.) হাদীছটি কয়েকটি সূত্রে ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু কোথাও 'মুওয়াত্ত্বা মালিক'-এর উদ্ধৃতি দেননি। যেমন : وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا عبد الله هو القعنبي - عن مالك وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا علي بن عيسى، ثنا موسى بن محمد الذهلي، ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك প্রভৃতি সনদ[১৮৪]।

এ সকল সনদে ইমাম বায়হাক্বী ধারাবাহিক অন্তত ৮টি স্তরের বর্ণনাকারীর নাম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তারা সকলেই (أخبرنا) কিংবা (حدثنا) শব্দ দ্বারা শ্রুতিবর্ণনা করেছেন। এর অর্থ তারা কেবল মৌখিকভাবে শুনেছেন তা নয়, বরং পুস্তকটি ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীকে বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে শুনেছেন কিংবা বর্ণনাকারী তাঁর নিকট নিজেই পাঠ করেছেন। এভাবে প্রত্যেকেই তাঁর ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর নিকট সরাসরি শ্রবণ করেছেন কিংবা তাঁর নিকট পুস্তকটি পাঠ করেছেন। এটাই হ'ল মর্মার্থ। কেননা ইমাম মালিকের

---

১৭৯. *সুনান আবী দাঊদ*, হা/১০৪৬।
১৮০. *সুনানুত তিরমিযী*, হা/৪৯১।
১৮১. *আস-সুনানুল কুবরা*, হা/১৭৬০।
১৮২. *ছহীহ ইবনু হিব্বান*, হা/২৭৭২।
১৮৩. *কিতাবুদ দু'আ*, হা/১৭০।
১৮৪. আল-বায়হাক্বী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা/৫৯৯৮।

'মুওয়াত্তা' কিতাবটি তখন বাজারে কিনতে পাওয়া যেত। বাজার থেকে সেই পাণ্ডুলিপি কিনে সরাসরি তার উদ্ধৃতি দিয়েই মুহাদ্দিছগণ হাদীছটি উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু সতর্কতাবশত এবং লিপিবদ্ধ বস্তুতে ভুল-ভ্রান্তি থাকার আশংকায় তারা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির ওপর এককভাবে নির্ভর করেননি; বরং ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি প্রজন্মে পাণ্ডুলিপিটি পাঠকারী কিংবা শ্রবণকারীদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর এভাবে মূল পুস্তকটি উপস্থিত থাকলেও মুহাদ্দিছগণ নিয়মতান্ত্রিকভাবেই পুস্তকের উদ্ধৃতি না দিয়ে শ্রুতির উদ্ধৃতি দিতেন।

স্মৃতিনির্ভর এ পদ্ধতি বর্তমান যুগে প্রচলিত গ্রন্থের নাম এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করে যে তথ্যসূত্র প্রদান করা হয়, তার চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম ও নিরাপদ। যার প্রমাণ হ'ল- ইহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মগ্রন্থ সংকলন করতেন। কিন্তু তবুও তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃত হয়ে পড়েছে এবং তাতে এত বেশী ভুল রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যায় না। যে কোন ইহুদী ও খৃষ্টান পণ্ডিত এ কথা একবাক্যে স্বীকার করেন;[১৮৫] কিন্তু মুসলমানরা তাদের ধর্মগ্রন্থে এই ভুল-ভ্রান্তি ও বিকৃতি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেননা তারা মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করতেন।

এছাড়া এখান থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, হাদীছ ৩য় শতকে লিপিবদ্ধ হয় নি, বরং ১ম শতাব্দী থেকেই লিখিতভাবে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু মুহাদ্দিছগণ সে পাণ্ডুলিপিকে তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহার না করে বর্ণনাকারীদেরকে তথ্যসূত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন। মুহাদ্দিছদের এই পদ্ধতি না জানার কারণে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাবশত ধারণা করা হয় যে, হাদীছ শত শত বছর ধরে কেবল শ্রুতিবর্ণনার ভিত্তিতেই সংরক্ষিত হয়েছে।

ঙ. আধুনিক যুগে প্রচলিত উৎস সমালোচনা (Source criticism) পদ্ধতি ব্যবহার করে একদল প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত হাদীছ শাস্ত্রের বিশুদ্ধতাকে অস্বীকার করেছেন এ কারণে যে, তা শ্রুতিনির্ভর বর্ণনা।[১৮৬] তাদের নিকট মুহাদ্দিছগণের

---

১৮৫. ড. আযিয়া আলী ত্বহা, *মানহাজিয়াতু জামঈস সুন্নাহ ওয়া জামঈল আনাজীল* (কুয়েত : দারুল বুহূছ আল-ইলমিয়াহ, ১৯৭৮খ্রি.), পৃ. ১৬৮; ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, *হাদীসের নামে জালিয়াতি*, পৃ. ৯৫।

১৮৬. John Wansbrough, *The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History* (Oxford: Oxford, UP, 1978); Patricia Crone and Michael Cook, *Hagarism*; Albrecht Noth, *The Early Arabic Historical Tradition: A Source-Critical Study*, trans. Michael Bonner (Princeton: The Darwin Press, Inc., 1994).

গৃহীত অবিচ্ছিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত শ্রুত বর্ণনা (Verbal source) হাদীছের ঐতিহাসিক সত্যতা নিশ্চিত করে না। এর পরিবর্তে তারা দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণ (Visual source) তথা প্রত্নতাত্ত্বিক, লৈখিক[১৮৭] প্রভৃতি প্রমাণকে সত্যতা নির্ণয়ের মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন। ফলে হাদীছ সম্পর্কে তাদের গবেষণা ধারা পরিণত হয়েছে অতি সংকীর্ণ ও বাস্তবতাবিরোধী। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পারিপার্শ্বিকতাকে সঠিকভাবে বিবেচনায় না এনে কেবল দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রমাণকে একমাত্র অবলম্বন করার অসহিষ্ণু, সংশয়বাদী এবং একদেশদর্শী নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে তারা অবলীলায় ইতিহাসের এক জাজ্বল্যমান বাস্ত বতাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন[১৮৮] এবং কাল্পনিক অবস্থান থেকে সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করেছেন। যার ফলে প্রমাণ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাদের পক্ষে কেবল ধারণার বশবর্তী হয়ে এবং পক্ষপাতমূলকভাবে হাদীছ শাস্ত্রকে বিতর্কিত করা সম্ভব হয়েছে। অথচ এর বিপরীতে মুহাদ্দিছগণের নীতি ছিল অনেক বেশী বাস্তবতাভিত্তিক, নমনীয় এবং বহুদেশদর্শী। মুখস্থকরণ বা শ্রুতিনির্ভরতাকে তারা কখনও যেমন অগ্রাহ্য করেননি, তেমনি একচেটিয়াভাবে গ্রহণও করেননি। কেননা তারা ছিলেন সেই যুগের এবং সেই সমাজের সন্তান। তারা ভালভাবেই জানতেন তৎকালীন শ্রুতিনির্ভর জ্ঞান বিনিময়ের আদ্যপান্ত। ফলে তারা সমকালীন প্রেক্ষাপট থেকে সর্বাধিক উপযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতেই হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করেছেন এবং তাদের গবেষণাকে ঢালাও মন্তব্য ও উৎকট সারলীকরণ থেকে মুক্ত রেখেছেন। মূলত তারাই ছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম নির্মোহ বিশ্লেষণমূলক গবেষণা ধারার আবিষ্কারক।

---

১৮৭. অনেক সময় লিখিত প্রমাণও তাদের কাছে যথেষ্ট হয় নি। ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে লিখিত রাসূল (ছা.)-এ চিঠিসমূহকেও তারা শব্দগত সমালোচনা (Textual criticism) তথা প্রাচীন লিপিবিজ্ঞান (Palaeography), স্থানিক বিবরণ (Topography) প্রভৃতি গবেষণা সূত্রে ফেলে বানোয়াট প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। দ্র. W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (Oxford: Clarendon Press, 1956) p. 346; R. B. Serjeant, *Early Arabic Prose*, *Cambridge History of Arabic Literature: Arabic Literature to the End of the Umayyad Period* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1983) p. 152; Albrecht Noth, *The Early Arabic Historical Tradition: A Source-Critical Study*, p. 7.

১৮৮. Sarah Zubair Mirza, *Oral Tradition and Scribal Conventions in the Documents attributed to the prophet Muhammad* (Unpublished Doctoral Thesis) (University of Michigan, 2010), p. 281.

অন্যদিকে প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতগণ ইতিহাস বিশ্লেষণের যে সূত্র গ্রহণ করেছেন তাতেও কেবল লিখিত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই প্রাথমিক উপাত্ত হিসাবে গৃহীত। ফলে তারা হাদীছের চূড়ান্ত লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে আরও যে সকল ধাপ (আমল, মুখস্থকরণ, ব্যক্তিগত পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ প্রভৃতি) ছিল তা বেমালুম এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন কিংবা তার দূরবর্তী ব্যাখ্যা দিয়ে তথ্যবিকৃতি ঘটিয়েছেন। দুঃখের বিষয় সমকালীন মুসলিম পণ্ডিতগণও এতে প্রভাবিত হয়ে প্রাচ্যবিদদের মত খণ্ডন করার সময় মুখস্থকরণ পদ্ধতির চেয়ে লেখনীর মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকেই অধিক গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করেছেন। অথচ এটা ছিল সর্বশেষ ধাপ, যার প্রাথমিক ধাপগুলো ছিল হাদীছ মুখস্থকরণ, হাদীছের উপর আমল। আর তা ধারাবাহিকভাবে এক প্রজন্ম থেকে অপর প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছিল। সুতরাং লিখিত সংকলনের পূর্বে হাদীছ সংরক্ষণের এ দু'টি মৌলিক মাধ্যম (Device)-কে আমাদেরকে সক্রিয় বিবেচনায় রাখতে হবে। নতুবা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় গভীর শূন্যতার সৃষ্টি হবে। আর মূলত এ বিষয়টি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে না পারার দরুণই প্রাচ্যবিদসহ অনেকের মনে এমন ধারণা তৈরী হয়েছে যে, হাদীছ যেহেতু রাসূল (ছা.)-এর মৃত্যুর প্রায় ২০০ বছর পর সংকলিত হয়েছে, সুতরাং তা ইমাম বুখারী ও তৎকালীন মুহাদ্দিছদের নিজস্ব রচনা। যা সর্বৈব ইতিহাস অজ্ঞতার ফসল।

চ. প্রাচ্যবিদদের কেউ কেউ প্রমাণ করেছেন যে, প্রাথমিক যুগে জ্ঞান সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রধানত মৌখিকভাবে হ'লেও লেখনীর প্রচলনও সমভাবে প্রচলিত ছিল। আমেরিকান প্রাচ্যবিদ ড. নাবিয়া এ্যাবোট (১৮৯৭-১৯৮১খ্রি.) তাঁর *Studies in Arabic literary papyri* গ্রন্থের ২য় খণ্ডে তিনি প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসমূহ বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ছাহাবীগণ মৌখিকভাবে ছাড়াও হাদীছ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতেন।[১৮৯] এই গবেষণায় তিনি দেখিয়েছেন যে, হাদীছের আনুষ্ঠানিকভাবে সংকলন শুরু হওয়ার পূর্বে তথা ১ম শতাব্দী হিজরীর পূর্বেই অধিকাংশ হাদীছ কারও না কারও দ্বারা এবং কোন না কোন স্থানে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।[১৯০] তিনি বলেন, Oral and written transmission went hand in hand almost from the start, that the tradition of Muhammad as trasmitted by his

---

১৮৯. Nabia Abbott, *Studies in Arabic Literary Papyri : Quranic Commentary and Tradition*, vol. 2, p. 6-7.
১৯০. Ibid, vol. 2, p. 39.

companions and their successors were, as a rule, scrupulously scrutinized at each step of the transmission 'মৌখিক এবং লিখিত আকারে হাদীছ বর্ণনার চল প্রায় শুরু থেকে হাত ধরাধরি করে চলে আসছিল। প্রতিটি যুগে ছাহাবী বা তাবেঈগণ থেকে বর্ণিত মুহাম্মাদ (ছা.)-এর হাদীছসমূহ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বর্ণনা করা হ'ত।'[১৯১]

একইভাবে অপর জার্মান প্রাচ্যবিদ গ্রেগর শোয়েলার (জন্ম : ১৯৪৪) তাঁর *The Genesis of Literature in Islam: From the Aural to the Read* গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রথমত মৌখিকভাবে ও শ্রুতিনির্ভর পদ্ধতিতে জ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর অর্থ এই নয় যে, লেখনীর প্রচলন তখন ছিল না। বরং লেখনীকে প্রাথমিক যুগে দেখা হত স্মৃতিশক্তির সহায়ক (Mnemonic aid) হিসেবে।[১৯২] তিনি বলেন যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের যুগে তথা সপ্তম থেকে দশম খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে শিক্ষাদান এবং জ্ঞান বিতরণের পদ্ধতি হিসাবে একদিকে যেমন শ্রুতিনির্ভর পদ্ধতি ব্যবহৃত হ'ত, অপরদিকে লিখিত পদ্ধতিও ব্যবহৃত হ'ত। অতঃপর ধীরে ধীরে সময়ের বিবর্তনে এই চর্চার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং মৌখিক জ্ঞান বিতরণ পদ্ধতি লিখিত পদ্ধতিতে এসে স্থায়িত্ব লাভ করে।[১৯৩] তিনি সফলভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলামী সাহিত্যের বিশাল সম্ভারের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ ব্যক্তিগতভাবে এবং শুধুমাত্র মৌখিক শুনানীর মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। বস্তুত ইসলামী জ্ঞান মৌখিক ও লিখিত উভয় পদ্ধতির সমন্বয়ে পরিচালিত হ'ত এবং ধারাবাহিকভাবে সময়ের বিবর্তনে তা রূপান্তরিত হয়েছে মৌখিক থেকে লিখিত রূপে।[১৯৪]

সুতরাং প্রাথমিক যুগে কেবলমাত্র শ্রুতিবাহিত পদ্ধতির সাহায্যে হাদীছ সংরক্ষিত হয়েছে- এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, যা স্বয়ং প্রাচ্যবিদরাই খণ্ডন করেছেন।

---

১৯১. Ibid, vol. 2, p. 2.

১৯২. Gregor Schoeler, *The Genesis of Literature in Islam: From the Aural to the Read*, p. 2-3.

১৯৩. Ibid, p. 7, 123.

১৯৪. Ibid, p. 125.

সংশয়-২ : হাদীছ হ'ল অনারবদের ষড়যন্ত্রের ফসল।

আসলাম জয়রাজপুরী, তামান্না ইমাদী প্রমুখ ব্যক্তি হাদীছ শাস্ত্রকে অনারব মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রমূলক উদ্ভাবন দাবী করেছেন।[১৯৫] তামান্না ইমাদী বলেন, '..অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, মুনাফিকরা 'রাসূল (ছা.) বলেছেন'-এর আওয়াজ এতই বুলন্দ করল এবং মানুষকে হাদীছ জমা করার ব্যাপারে এমনভাবে প্ররোচিত করল যে, মুসলিম দেশসমূহে শত-সহস্র হাদীছ বর্ণনার হিড়িক পড়ল এবং লক্ষ লক্ষ হাদীছ সংকলনকারী সৃষ্টি হল। ফলে মানুষের দৃষ্টি কুরআন থেকে এতটা দূরে সরে গেল যে, আলিম, ফক্বীহ এবং মুফতীগণ কুরআন থেকে মাসআলা গ্রহণের পরিবর্তে হাদীছের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে লাগলেন।...এভাবেই হাদীছকে কুরআনের সমমান সম্পন্ন বানিয়ে দেয়া হল'।[১৯৬]

পর্যালোচনা :

সম্ভবত হাদীছ শাস্ত্রের বিখ্যাত ছয়টি গ্রন্থের সংকলকগণ তথা ইমাম বুখারী (২৫৬হি.), মুসলিম (২৬১হি.), আবূ দাঊদ (২৭৫হি.), তিরমিযী (২৭৯হি.), নাসাঈ (৩০৩হি.) এবং ইবনু মাজাহ (২৭৩হি.) খোরাসানের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ায় এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হয়েছে। নিম্নে তাদের ধারণা খণ্ডন করা হ'ল।

ক. উমর (রা.)-এর যুগে ২৩ হিজরীতে পারস্য ও খোরাসান অঞ্চল মুসলমানদের করায়ত্ত্ব হয়। অতঃপর ধীরে ধীরে সেখানকার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীর শুরুতে যখন হাদীছ সংকলনকর্ম আরম্ভ হয়, তখন ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে অনারব মুসলমানদের অংশগ্রহণ ছিল নিতান্তই নগণ্য। আব্বাসীয় আমলে অনারব বার্মাকীরা কিছুটা ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল, কিন্তু তারা আরবী ভাষা সম্পর্কেই বিশেষ জ্ঞান রাখত না, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র খেদমত করা তো দূরের কথা। সুতরাং প্রাথমিক যুগে হাদীছ সংকলনকর্মে যেখানে অনারব মুসলমানদের কোন অংশগ্রহণ নেই, সেখানে ষড়যন্ত্র থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। দ্বিতীয়ত হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগে আরব মুহাদ্দিছগণ যে সকল হাদীছ

---

১৯৫. তামান্না ইমাদী, *ই'জাযুল কুরআন ওয়া ইখতিলাফে ক্বিরাআত*, পৃ. ২২৫, ইসমাঈল সালাফী, *হুজ্জিয়াতে হাদীছ*, পৃ. ৪২।

১৯৬. তামান্না ইমাদী, *ই'জাযুল কুরআন ওয়া ইখতিলাফে ক্বিরাআত*, পৃ. ২৩০-২৩১।

সংগ্রহ ও সংকলন করেছিলেন তাদের সূত্র থেকে সংগৃহীত হাদীছগুলিই অনারব মুহাদ্দিছগণ তাঁদের স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছিলেন। অর্থাৎ তাদের সংকলিত গ্রন্থের হাদীছসমূহ ২য় শতকে সংকলিত হাদীছগ্রন্থসমূহে পূর্ব থেকেই সংরক্ষিত ছিল। তারা কেবল নতুনভাবে বিন্যাস করেছিলেন। এটি ছিল ইসলামের প্রভাবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে শুরু হওয়া ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এক অনন্য সাধারণ নির্দশন, যা মুসলিম উম্মাহ্‌র ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সুতরাং এতে ষড়যন্ত্র খোঁজা নিতান্তই অবান্তর ও ইতিহাস অজ্ঞতার ফসল।[১৯৭]

খ. সন্দেহ নেই যে, পরবর্তীকালে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আরবদের তুলনায় অনারবগণই বেশী অগ্রসর হয়েছিলেন। ফলে পারস্য-খোরাসান ও আন্দালুসিয়ার যমীনে এমন অসংখ্য মুসলিম বিদ্বানের জন্ম হয়েছিল, যারা ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারে আরবদের থেকেও অগ্রসরতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। এর কারণ হিসাবে ইবনু খালদূন (৮০৮হি.) উল্লেখ করেন, আরবদের মধ্যে বেদুঈন জীবনব্যবস্থা এবং সরলতা বিদ্যমান ছিল। এজন্য শাস্ত্র ও শিল্পকলায় তারা তেমন পারদর্শী ছিল না। তার প্রয়োজনও তাদের হ'ত না। কিন্তু অনারব মুসলমানরা এই নতুন দ্বীনকে জানা এবং আরব সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে আরবী ভাষা ও শিল্পকলার সাথে পরিচিত হ'তে লাগল। শত সহস্র মাইল পাড়ি দিয়ে তাঁরা আরবদের নিকট দ্বীনে জ্ঞান আহরণ করতে লাগল। অতঃপর যুগ পরিক্রমায় তাদের হাত ধরেই বিশেষত আরবী ব্যকরণ, উছূলুল ফিক্‌হ, উছূলুত তাফসীর, উছূলুল হাদীছ ইত্যাদি শাস্ত্রের জন্ম হয়। আর এভাবেই তাদের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে জ্ঞানচর্চার নানা দিক ও বিভাগ উন্মুক্ত হয়েছিল।[১৯৮] কিন্তু তাদের এই জ্ঞানচর্চার পিছনে কোন প্রকার ষড়যন্ত্র নিহিত ছিল–এই মন্তব্য আধুনিককালের কিছু হাদীছ অস্বীকারকারী এবং প্রাচ্যবিদ ব্যতীত বিগত হাজার বছরে কোন একজন বিদ্বানও উচ্চারণ করেননি। স্বয়ং তৎকালীন আরবগণই যেখানে তাদের বিরুদ্ধে অনারবদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বেখবর ছিলেন, সেখানে এত বছর পর আবিষ্কৃত এই অভিনব তথ্যের কী মূল্য থাকতে পারে?

গ. যিয়াউদ্দীন ইছলাহী ১ম শতাব্দী হিজরী থেকে শুরু করে ৮ম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত হাদীছ সংকলনে ব্যাপৃত ৭০ জন মুহাদ্দিছের জীবনী উল্লেখ করেছেন,

---

১৯৭. মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, *হুজ্জিয়াতে হাদীছ*, পৃ. ৪১-৪৪।

১৯৮. ইবনু খালদূন, *মুকাদ্দামাহ ইবনু খালদূন*, বঙ্গানুবাদ : গোলাম সামদানী কোরায়শী (ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ৩য় মুদ্রণ : ২০১৫খ্রি.), ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৬-৩৪৯।

যার মধ্যে মাত্র ১২ জন হ'লেন অনারব।[১৯৯] তাছাড়া ইমাম বুখারী (২৫৬হি.) এবং ইমাম ইবনু মাজাহ (২৭৩হি.) ব্যতীত কুতুবে ছিত্তাহ্র বাকি ইমামগণের জন্ম খোরাসানে হ'লেও তাঁরা আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন। যেমন ইমাম মুসলিম ছিলেন 'বনূ কুশাইর' গোত্রের এবং আবূ দাউদ ও তিরমিযী ছিলেন যথাক্রমে 'বনূ আয্দ', 'বনূ সালীম' গোত্রের। আর ইমাম নাসাঈ'র গোত্র সম্পর্কে না জানা গেলেও ঐতিহাসিকগণ তাঁকে আরব বংশোদ্ভূত উল্লেখ করেছেন।[২০০] সুতরাং বংশগত পরিচয় নিয়ে কোন বিভ্রান্তির অবকাশ নেই, আর না অতীতকালে কেউ কখনও প্রশ্ন তুলেছেন। ইসলাম প্রসারের সেই যুগে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে ইসলামের কেন্দ্রভূমি আরবের মাটিতে এসে মানুষ দ্বীন শিক্ষা করেছে। কেউ আরবের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কেউবা জীবনের সিংহভাগ আরবের মাটিতে কাটিয়ে শেষ জীবনে নিজ শহরে ফিরে গেছেন। কারও বংশপরিচয় তাকে জ্ঞানার্জনে বাধার সৃষ্টি করেনি। এটি ছিল জাতি-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে ইসলামের আন্তর্জাতিকতাবাদ এবং বহুজাতিক সৌন্দর্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত।

সংশয়-৩ : ছাহাবীগণ সকলেই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন না।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের দাবী হ'ল, ছাহাবীগণ সকলে আস্থাভাজন ছিলেন না। তারাও আমাদের মত মানুষ ছিলেন। সুতরাং তারাও ভুল বা মিথ্যা বলতে পারেন। তাদের মধ্যে অনেকে মুনাফিক ও কবীরা গুনাহগারও ছিলেন। সুতরাং তাদের ওপর কি একচেটিয়াভাবে নির্ভর করা যায়? [২০১] ড. আহমাদ আমীন বলেন, ويظهر أن الصحابة أنفسهم في زمنهم كان يضع بعضهم بعضاً موضع النقد، وينزلون بعضاً منزلة أسمى من بعض 'এটা সুস্পষ্ট যে, ছাহাবীরা তাদের যুগে নিজেরাই একে অপরের সমালোচনা করতেন এবং (বিশ্বস্ততার ব্যাপারে) কতিপয়কে কতিপয়ের উপরে স্থান দিতেন।'[২০২]

---

১৯৯. যিয়াউদ্দীন ইছলাহী, *তাযকিরাতুল মুহাদ্দিছীন* (লাহোর : দারুল বালাগ, ২০১৪খ্রি.)। দ্র. ১ম ও ২য় খণ্ড।

২০০. ছফীউর রহমান মুবারকপুরী, *ইনকারে হাদীছ হক্ব ইয়া বাতিল* (হায়দারাবাদ : তাওহীদ ওয়া সুন্নাহ ফাউণ্ডেশন, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ১৮-২০।

২০১. মাহমূদ আবূ রাইয়াহ, *আযওয়াউন আলাস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ*, পৃ. ৩১২, ৩২৬, ৩২৭।

২০২. ড. আহমাদ আমীন, *ফাজরুল ইসলাম*, পৃ. ২১৬।

পর্যালোচনা :

ক. সকল মুসলিম বিদ্বান একমত যে, ছাহাবীগণ প্রত্যেকেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ইবনু আব্দিল বার্র (৪৬৩হি.) বলেন, كان الصحابة رضى الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول 'ছাহাবীদের (নৈতিক) অবস্থান সম্পর্কে চুল-চেরা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই কেননা মুসলমানদের মধ্যে হক্বপন্থীগণ তথা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তারা প্রত্যেকেই ন্যায়পরায়ণ।'[২০৩] ইবনু কাছীর বলেন, والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة ... وقول المعتزلة : الصحابة عدول إلا من قاتل علياً قول باطل مرذول ومـــردود 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ'র নিকট ছাহাবীগণ প্রত্যেকেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন .. মু'তাযিলাদের এই কথা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভিত্তিহীন যে, ছাহাবীরা ন্যায়পরায়ণ, তবে যারা আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তারা ব্যতীত।'[২০৪]

ছাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছা.)-এর সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত। কেননা আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর রাসূল (ছা.)-এর সাহচর্যের জন্য নির্বাচন করেছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমেই কুরআন ও সুন্নাহ তথা ইসলামী শরী'আহ মানবজাতির নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরাই এই দ্বীনকে পৃথিবীর বুকে বিজয়ী করেছিলেন এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে দ্বীনকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং দ্বীনের প্রতি তাদের দরদ ও দায়িত্বশীলতা এবং আল্লাহ ও রাসূল (ছা.)-এর প্রতি তাদের ভালবাসা ছিল প্রশ্নাতীত। সুতরাং তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আর উষ্ট্রের যুদ্ধে এবং ছিফ্ফীনের যুদ্ধে তাদের মাঝে যে বিবাদ ঘটেছিল, তা এক অনিচ্ছাকৃত সংঘাত ছিল কিংবা তাদের ইজতিহাদগত ভুল ছিল। এতে তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা ক্ষুণ্ন হয় না।[২০৫]

---

২০৩. ইবনু আব্দিল বার্র, *আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাল আছহাব* (বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৯২খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯।

২০৪. ইবনু কাছীর, *আল-বা'ইছুল হাছীছ*, পৃ. ১৮১-১৮২।

২০৫. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ৪৮; ইবনু কাছীর, *আল-বা'ইছুল হাছীছ*, পৃ. ১৮২-১৮৩।

আল্লাহ বলেন, مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ 'মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফেরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকুকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহ্র করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে তাদের চেহারায় সিজদার প্রভাব থেকে।'[২০৬] এই আয়াতে আল্লাহ স্বয়ং ছাহাবীদের ন্যায়পরায়ণতার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এছাড়া ছাহাবীদের সপক্ষে অনেক জায়গায় সাক্ষ্য দিয়েছেন রাসূল (ছা.)। যার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীছটি হ'ল, خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم 'আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি। অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী। অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী।'[২০৭] এই হাদীছে একই সাথে তাবেঈদের ব্যাপারেও সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে।

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।'[২০৮] এই আয়াতটিতে আল্লাহ একইসাথে ছাহাবী এবং তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে অনুসরণকারী তাবেঈদের প্রশংসা করেছেন, যা তাদের সততার জন্য সাক্ষ্য হিসাবে যথেষ্ট।

সুতরাং সরাসরি আল্লাহ এবং রাসূল (ছা.) কর্তৃক সততার সাক্ষ্যপ্রাপ্ত ছাহাবীদের সম্পর্কে শরী'আতের ব্যাপারে মিথ্যা ও খেয়ানতের সন্দেহ করা এবং তাদের ওপর কোন অপবাদ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিহ্বা আড়ষ্ঠ হওয়া উচিৎ। ইবনুছ ছালাহ (৬৪৩হি.) বলেন, إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك بإجماع العلماء الذين

---

২০৬. সূরা আল-ফাত্হ, আয়াত : ২৯।
২০৭. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৩৬৫০-৩৬৫১; *ছহীহ মুসলিম*, হা/২৫৩৩।
২০৮. সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত : ১০০।

يعتد بهم في الإجماع، إحسانا للظن بهم، ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر، وكأن الله – سبحانه وتعالى – أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة 'মুসলিম উম্মাহ সকল ছাহাবীর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছে। এছাড়া যাদেরকে ফিতনা স্পর্শ করেছে (তথা উষ্ট্রের যুদ্ধ ও ছিফ্ফীনের যুদ্ধ প্রভৃতি) তাদের ব্যাপারেও ঐক্যমত পোষণ করেছেন এমন বিদ্বানগণ, যাদের ইজমা' গ্রহণযোগ্য হিসাবে পরিগণিত। তাদের প্রতি সুধারণা এবং (মুসলিম উম্মাহ্র জন্য) তাদের অবদানকে বিবেচনায় রেখে এই ঐক্যমত হয়েছে। যেন আল্লাহ নিজেই এই ইজমা'র পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, কেননা তারা ছিলেন শরী'আতের ধারক ও বাহক।'[২০৯]

খ. ছাহাবীগণ পরস্পরের সত্যবাদিতা সম্পর্কে সন্দেহ করতেন বা একে অপরের মিথ্যুক বলতেন- এ মর্মে যত বর্ণনা এসেছে তার একটিও বিশুদ্ধ নয়, বরং শী'আদের তৈরীকৃত। বরং এ বিষয়ে সঠিক বক্তব্য হ'ল, যখনই তাঁরা কোন ছাহাবীর নিকট হাদীছ শ্রবণ করতেন সাথে সাথে তা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নিতেন, কখনও সন্দেহ পোষণ করতেন না।[২১০] যেমন আল বারা ইবনু আযিব (রা.) বলেন, ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ، فيحدث الشاهد الغائب 'আমাদের সকলেই রাসূল (ছা.) হ'তে হাদীছ শুনেছে তা নয়, কেননা আমাদের কৃষিখামার ছিল, কাজকর্ম ছিল। কিন্তু সেই যুগে মানুষ মিথ্যা কথা বলত না এবং তারা উপস্থিতরা অনুপস্থিতদের নিকট হাদীছ পৌঁছে দিত।'[২১১] আনাস (রা.) বলেন, ليس كل ما نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه , ولكن حدثنا أصحابنا , ونحن قوم لا يكذب بعضنا بعضا 'আমরা যে সকল হাদীছ তোমাদের নিকট বর্ণনা করি, তার প্রতিটিই রাসূল (ছা.)-এর নিকট থেকে শুনেছি এমন নয়। বরং আমাদের সাথীরা আমাদের কাছে বর্ণনা করতেন। আর আমরা এমন কওম ছিলাম যারা একে অপরকে মিথ্যুক বলত না।'[২১২]

---

২০৯. ইবনুছ ছালাহ, *মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ*, পৃ. ২৯৫।
২১০. আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ২৬৩।
২১১. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ৩৮৫।
২১২. তদেব, পৃ. ৩৮৫।

তবে কিছু বর্ণনা এসেছে যেমন, আল-ওয়ালিদ ইবনু উক্ববা (রা.)[২১৩] যিনি বনু মুস্তালিক গোত্র থেকে ফিরে মিথ্যাভাবে রাসূল (ছা.)-কে বলেছিলেন যে, তারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এবং আব্দুর রহমান ইবনু উদাইস আল-বালভী (রা.) [২১৪] যিনি ফিতনার উদ্ভবকালে ওছমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে হাদীছ রচনা করে রাসূল (ছা.)-এর নামে মিথ্যাচার করেছিলেন। কিন্তু এ বর্ণনাগুলির সনদ দুর্বল, যা গ্রহণযোগ্য নয়।[২১৫] আর যদি বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্যও হয়ে থাকে, তবুও এমন দু'একজনের জন্য বাকী প্রায় লক্ষাধিক ছাহাবীর ন্যায়পরায়ণতা ক্ষুণ্ন হয় না। আর হাদীছ গ্রন্থসমূহে এই দু'জন ছাহাবীর বর্ণনাও ১টির বেশী পাওয়া যায় না।[২১৬] হাদীছ অস্বীকারকারীদের ধারণামতে যদি তারা মিথ্যুক হয়ে থাকেন এবং মিথ্যা হাদীছ বর্ণনা করে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই হাদীছ সংকলকরা সে হাদীছগুলি তাদের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করতেন। কিন্তু তা দেখা যায় না। এখান থেকে অধিকতর প্রমাণিত হয় যে, মুহাদ্দিছদের গৃহীত নীতি সঠিক।

এছাড়া আয়েশা (রা.)-এর সম্মুখে আবুদ দারদা (রা.)- এর একটি মন্তব্য لا وتر لمن أدركـــه الصـــبح 'সকাল হয়ে গেলে তার জন্য আর বিতর নেই'– উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, كذب أبو الدرداء 'আব্দুদ দারদা মিথ্যা বলেছে'।[২১৭] এটি মিথ্যা অর্থ ভুল করা। কেননা এটি আবূ দারদার একটি নিজস্ব মন্তব্য ছিল। আর কেউ নিজের মত পেশ করলে তাকে মিথ্যুক বলা অপ্রাসঙ্গিক। অতএব এখানে আবূ দারদা (রা.) ভুল করেছেন, এই অর্থ নিতে হবে।[২১৮]

---

২১৩. ইবনু সা'দ, *আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১০১; ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-ইছাবাহ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮১; আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৩।

২১৪. ইবনু সা'দ, *আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-ইছাবাহ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮১।

২১৫. নিহাদ আব্দুল হালীম উবাইদ, *আল-ওয়াযউ ফিল হাদীছ ওয়া আছারুহুস সাইয়িআহ আলাল উম্মাহ* (অপ্রকাশিত মাস্টার্স থিসিস) (মক্কা : জামি'আতুল মালিক আব্দুল আযীয, তাবি), পৃ. ১৯৪-২১১।

২১৬. মুসনাদ আহমাদে আল-ওয়ালিদ ইবনু উক্ববা (রা.) থেকে ১টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে (হা/১৬৩৭৯, যার সূত্র যঈফ এবং আব্দুর রহমান ইবনু উদাইস (রা.) থেকে ১টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে ইমাম ত্ববারাণীর 'মু'জামুল আওসাত্ব' গ্রন্থে (হা/৩২৮৯)। এর সনদও দুর্বল।

২১৭. *মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাক*, হা/৪৬০৩।

২১৮. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *মানহাজুন নাক্বদ ইনদাল মুহাদ্দিছীন* (রিয়াদ : মাকতাবাতুল কাওছার, ১৯৯০খ্রি.), পৃ. ১২১।

গ. রাসূল (ছা.)-এর যুগে যারা মুনাফিক ছিল তারা ছাহাবীর সংজ্ঞায় পড়ে না। কেননা তারা বাহ্যিকভাবে ঈমান প্রকাশ করলেও অন্তরে কুফরী পোষণ করত। সুতরাং তারা ছাহাবী নয়। আর এই মুনাফিকদের সম্পর্কে রাসূল (ছা.) যেমন জানতেন, তেমনি ছাহাবীরাও অবগত ছিলেন। কুরআন তাদের চাল-চলন সম্পর্কে খুঁটিনাটি সবকিছু জানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং মুনাফিকদের পক্ষে রাসূল (ছা.) ও তাঁর ছাহাবীদের চোখ এড়িয়ে থাকার কোন সুযোগ ছিল না।[২১৯]

ঘ. ছাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ কবীরা গুনাহগার ছিলেন যেমন আয়েশা (রা.)-কে অপবাদদানকারীগণ, যেমন হাস্‌সান ইবনু ছাবিত, মিসতাহ ইবনু আছাছাহ এবং হামনা বিনতু জাহাশ। রাসূল (ছা.) তাদের ওপর হদের শাস্তি আরোপ করেছিলেন।[২২০] তারা ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত গণ্য হবে কি না এ বিষয়ে অধিকাংশ ফক্বীহ মত পোষণ করেছেন যে, যদি এমন অপরাধী তওবা করে, তবে সে আর ফাসিক হিসাবে গণ্য হবে না এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর এজন্য মুহাদ্দিছগণ হাস্‌সান ইবনু ছাবিত এবং হামনা বিনতু জাহশের হাদীছ তাঁদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সুতরাং ফাসিক এবং কবীরা গুণাহগার যদি তওবা করে তবে সে বিশ্বস্ত হিসাবে গণ্য হবে।[২২১]

ঙ. ছাহাবীদেরও মানবীয় ভুল-ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক–এই প্রশ্নের জবাবে ড. মুছত্বফা আল আ'যামী (২০১৭খ্রি.) বলেন, যারা এই যুক্তি প্রদান করেন, মূলত তারাই মানবীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক দাবী অস্বীকার করেন। কেননা তারা মানুষের অন্তরে পরিচর্যার প্রভাব উপলব্ধি করতে পারেন না, মানবহৃদয়ের পরিশুদ্ধিতে ধর্মীয় অনুভূতি এবং শিক্ষার গভীর প্রভাবকে গুরুত্ব দেন না। মানবহৃদয় কোন জড় পদার্থের মত প্রাণহীন নয়। বরং হৃদয় যখন বিশুদ্ধ ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তাওহীদের আক্বীদায় সিঞ্চিত হয়, তখন তা এমনকি ফিরিশতাদের মর্যাদা থেকেও উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হয়। আবার যখন তা অপবিত্র হয়ে যায়, তখন শয়তানের চেয়ে নিম্নস্তরে পৌঁছে যায়। অর্থাৎ মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'ল তা স্থিতিস্থাপক, যা কোন দেশ-কাল-পাত্র দিয়ে সরল সূত্রে পরিমাপ করা যায় না। অতএব ছাহাবীদের অবস্থানকে অন্য কারও সাথে তুলনা করা বা অন্যদের অবস্থানকে ছাহাবীদের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। কেননা তাদের অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর

---

২১৯. তদেব, পৃ. ১১০-১১১।
২২০. *সুনানুত তিরমিযী*, হা/৩১৮০-৩১৮১।
২২১. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *মানহাজুন নাক্বদ ইনদাল মুহাদ্দিছীন*, পৃ. ১১৭-১১৮।

নবীর সহচর হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর এই দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।

এর অর্থ এই নয় যে, আমরা তাদের ন্যায়পরায়ণতাকে সাধারণ স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে তাদের মধ্যে মানবীয় ভুল-ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা নাকচ করছি। কিন্তু ছাহাবীদের এই প্রজন্ম হাদীছ বর্ণনায় অতীব সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যমে এই স্বীকৃতি আমাদের নিকট থেকে আদায় করে নিয়েছেন। এরূপ অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا، فليتبوأ مقعده من النار 'তোমাদের নিকট আমি অনেক হাদীছ বর্ণনা করতাম। কিন্তু রাসূল (ছা.)-এর এই কথাটি আমাকে বাঁধাগ্রস্থ করে – 'যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাচার করল সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়।'[২২২] আব্দুর রহমান ইবনু আবী লায়লা বলেন আমি যায়েদ ইবনু আরক্বাম (রা.)- কে বললাম, আমাদেরকে রাসূল (ছা.)-এর কিছু হাদীছ শোনান। তিনি বললেন, كبرنا ونسينا، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد 'আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং (অনেক কিছুই) ভুলে গেছি। রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ বর্ণনা করা খুবই কঠিন দায়িত্ব।'[২২৩]

তবে ছাহাবীদের যদি কখনও হাদীছ বর্ণনায় ভুল হ'ত, তখন অপর ছাহাবীরাই তা সংশোধন করে দিতেন। যেমন আয়েশা (রা.) অনেক ছাহাবীকে সংশোধন করে দিয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ রাসূল (ছা.)-এর কতবার ওমরা আদায় করেছিলেন এ সম্পর্কে ইবনু উমার (রা.) বলেন যে, তিনি চার বার ওমরা আদায় করেছিলেন এবং এর মধ্যে একবার ছিল রজব মাসে। একথা আয়েশা (রা.) জানতে পারলে তিনি বললেন, রাসূল (ছা.) কখনও রজব মাসে ওমরা আদায় করেননি।[২২৪] অনুরূপভাবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ইবনু আব্বাস (রা.)-এর একটি ভুল সংশোধন করে দেন যখন তিনি বলেছিলেন, রাসূল (ছা.) মায়মূনা (রা.)-কে বিবাহ করেছিলেন মুহরিম অবস্থায়।[২২৫]

---

২২২. *ছহীহুল বুখারী*, হা/১০৮।
২২৩. *সুনান ইবনু মাজাহ*, হা/২৫, সনদ ছহীহ।
২২৪. *ছহীহুল বুখারী*, হা/১৭৭৬-১৭৭৭।
২২৫. ইবনু রজব, *শারহু ইলালিত তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪।

এ সকল উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, সকল ছাহাবীর ন্যায়পরায়ণতার উপর আস্থা রাখার অর্থ তারা মানবীয় সকল ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে মনে করা নয়। তবে রাসূল (ছা.)-এর পরিচর্যার ফসল হিসাবে তারা এ সকল ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য সদা তৎপর থাকতেন। মুহাদ্দিছগণ যারা ছাহাবীদের সকলকে ন্যায়পরায়ণ ঘোষণা করেছেন, তারাও কিন্তু ছাহাবীদের এ ধরনের কোন ভুল থাকাকে অস্বীকার করেননি; বরং এমন ভুল হ'লে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ সকল ভুল তাদের ন্যায়পরায়ণতায় কোন প্রভাব ফেলে না, যার দলীল আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।[২২৬]

চ. ছাহাবীরা একে অপরের নিকট কখনও কখনও প্রমাণ চাইতেন যেমন আবূ বকর (রা.) মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.)-এর নিকট থেকে সাক্ষী চেয়েছেন এবং উমার (রা.) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.)-এর নিকট সাক্ষী তলব করেছিলেন। এই প্রমাণ চাওয়ার অর্থ তারা মিথ্যা বলতে পারেন এমন সন্দেহ করা নয়। বরং এর পিছনে বিশেষ হিকমত নিহিত ছিল। আর তা হ'ল, তাঁরা হাদীছ গ্রহণে বিশেষ সতর্কতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার নীতি মুসলমানদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, হাদীছের মর্ম বোঝা এবং তা থেকে হুকুম-আহকাম বের করা, কিংবা কোনো হাদীছ মানসূখ হয়েছে কি না তা জানার ক্ষেত্রে ছাহাবীদের সকলেই সম পর্যায়ের ছিলেন না। মানবীয় দৃষ্টিকোন থেকে এই জ্ঞানগত পার্থক্য থাকবেই। ফলে কোন হাদীছ বর্ণিত হ'লে তা সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে কখনও তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন এবং সাক্ষী তলব করেছেন, যাতে হাদীছটির পূর্বাপর সম্পর্কে জানা যায় এবং ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হ'লে সংশোধন করে দেওয়া যায়। এর মধ্যে সত্যাসত্য যাচাইয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না।[২২৭]

---

২২৬. দ্র. ড. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *মানহাজুন নাক্বদ ইনদাল মুহাদ্দিছীন*, পৃ. ১২৩-১২৬।
২২৭. দ্র. আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ২৬৪-২৬৬।

সংশয়-৪ : সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী আবূ হুরায়রা (রা.) নির্ভরযোগ্য নন। তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং দেরীতে ইসলাম গ্রহণকারী। এতদসত্ত্বেও তাঁর সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী হওয়া অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যা তার নির্ভরযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) ৫৩৭৫টি হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী, যা সকল ছাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক। এজন্য হাদীছ অস্বীকারকারীগণ তাঁর প্রতিই সবচেয়ে বেশী খড়গহস্ত। তাঁর বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ করা হয়েছে। যেমন : (১) তিনি ছিলেন নিরক্ষর, যিনি লিখতে বা পড়তে জানতেন না। (২) তিনি খায়বার যুদ্ধের পর ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রাসূল (ছা.)-এর সঙ্গ পেয়েছিলেন মাত্র ৩ বছর। অথচ তিনি সর্বাধিক বর্ণনাকারী কীভাবে হলেন? (৩) ছাহাবীগণ তাঁর অধিক হাদীছ বর্ণনার সমালোচনা করতেন। (৪) তিনি ছিলেন মৃগীরোগী এবং স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ প্রভৃতি। তাঁর বিরুদ্ধে ভব্যতার সমস্ত সীমারেখা অতিক্রম করে একটি পুস্তক রচনা করেছেন মাহমূদ আবূ রাইয়াহ যার নাম তাচ্ছিল্য করে রাখা হয়েছে شيخ المضيرة أبـــو هريـــرة 'মযীরাহ' খাদ্যের ভক্ষক আবূ হুরায়রা'। প্রাচ্যবিদ গোল্ডজিহার সর্বপ্রথম তাঁর বিরুদ্ধে এই সমালোচনামূলক অবস্থান নেন। অতঃপর ড. আহমাদ আমীন তাঁর 'ফাজরুল ইসলাম' গ্রন্থে এই সমালোচনার পরিধি দীর্ঘ করেন।

পর্যালোচনা :

আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করা হয়েছে তাঁর অধিকাংশই তাঁর ব্যক্তিজীবন নিয়ে কুরুচিপূর্ণ সমালোচনায় পূর্ণ। এ সকল সমালোচনার দীর্ঘ জবাব প্রদান করেছেন ড. মুছত্বফা আস-সিবাঈ, আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী, ড. উজাজ আল-খত্বীব প্রমুখ।[২২৮] নিম্নে মৌলিক কয়েকটি সমালোচনা খণ্ডন করা হ'ল।

---

২২৮. দ্র. আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ২৯৮-৩৬১; আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী, *আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ*, পৃ. ১৪০-২২৭; ড. উজাজ আল-খত্বীব, *আবু হুরায়রা রাবিয়াতুল ইসলাম* (আবিদীন : মাকতাবা ওয়াহাবাহ, ১৯৮২খ্রি.), পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৭৬; যিয়াউর রহমান আল-আ'যামী, *আবূ হুরায়রা ফী যূয়ী' মারভিয়াতিহি বি শাওয়াহিদিহা ওয়া হালি ইনফিরাদিহা* (অপ্রকাশিত এম.এ. থিসিস) (মক্কা : জামি'আহ মালিক আব্দুল আযীয, ১৯৭২-১৯৭৩খ্রি.), পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৭০০; আব্দুল মুনঈম আল-ইয্যী, *দিফাউন আন আবী হুরায়রা* (বৈরূত : দারুল কলম, ২য় প্রকাশ : ১৯৮১খ্রি.), পৃষ্ঠাসংখ্যা : ৫১৪; আব্দুল কাদির আস-সিন্দী, *দিফাউন আন আবী হুরায়রা* (মদীনা :

ক. নিরক্ষরতা তৎকালীন আরব জাতির একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ছিল। স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (ছা.) নিরক্ষর ছিলেন। ছাহাবীগণ যারা হাদীছ বর্ণনা করতেন তারা অধিকাংশই স্মৃতি থেকে হাদীছ বর্ণনা করতেন। নিয়মাতান্ত্রিকভাবে কেউ লিপিবদ্ধ করতেন না, একমাত্র আব্দুল্লাহ ইবুন আমর ইবনুল আছ (রা.) ব্যতীত। হাদীছ শাস্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিমাত্রেরই এই তথ্য জানা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, আবূ হুরায়রা (রা.) অত্যন্ত স্মৃতিধর ও মর্যাদাবান ছাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূল (ছা.)-এর মসজিদেই অবস্থান করতেন এবং রাসূল (ছা.)-এর সাথে আমৃত্যু প্রতিমুহূর্তে সঙ্গ দিয়েছেন। রাসূল (ছা.) তাঁর জন্য বিশেষ দো'আ করেছিলেন। যেমন আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه؟ قال: ابسط رداءك فبسطته، قال: فغرف بيديه، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده 'আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আপনার নিকট হ'তে অনেক হাদীছ শুনি কিন্তু ভুলে যাই।' তিনি বললেন, তোমার চাদর মেলে ধর। আমি তা মেলে ধরলাম। তিনি দু'হাত একত্রিত করে তাতে কিছু ঢেলে দেয়ার মত করে বললেন, এটা তোমার বুকের সাথে লাগাও। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। এরপর থেকে আমি আর কিছুই ভুলে যাই নি।'[২২৯]

ছাহাবী ইবনু উমার (রা.) বলেন, أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه 'হে আবূ হুরায়রা! তুমি আমাদের মধ্যে রাসূল (ছা.)-এর সর্বাধিক সান্নিধ্য লাভকারী ব্যক্তি এবং তাঁর হাদীছ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ব্যক্তি।'[২৩০] আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর জানাযার সাথে যাত্রার সময় ইবনু উমার (রা.) বলেছিলেন, كان ممن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين 'তিনি হ'লেন মুসলমানদের জন্য রাসূল (ছা.)-এর হাদীছসমূহ হেফাযতকারী।'[২৩১]

দারুল বুখারী, ১৯৯৭খ্রি.), পৃষ্ঠাসংখ্যা : ১৯২; মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হাওয়া, *আবু হুরায়রা আছ-ছাহাবী আল-মুফতারা আলাইহ* (কায়রো : দারুশ শা'ব, তাবি), পৃষ্ঠাসংখ্যা : ২৪২।

২২৯. *ছহীহুল বুখারী*, হা/১১৯, ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৯২-২৪৯৩।

২৩০. *মুসনাদ আহমাদ*, হা/৪৪৫৩, *সুনানুত তিরমিযী*, হা/৩৮৩৬, সনদ ছহীহ।

২৩১. ইবনু সা'দ, *আত-তাবাক্বাতুল কুবরা*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৪; ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।

একদা মদীনায় প্রখ্যাত ছাহাবী আবূ আইয়ুব আল-আনসারী (রা.)-কে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণনা করতে দেখে জিজ্ঞাসা করা হ'ল আপনি রাসূল (ছা.)-এর এত মর্যাদাবান ছাহাবী হয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) হ'তে বর্ণনা করছেন? তিনি বললেন, لأن أحدث عن أبي هريرة أحب إلي مـــن أن أحدث عن النبي صـــلى الله عليـــه وســـلم 'আমার কাছে রাসূল (ছা.) থেকে (সরাসরি) বর্ণনা করার চেয়ে আবূ হুরায়রা থেকে হাদীছ বর্ণনা করা অধিক প্রিয়তর।'[২৩২] অর্থাৎ আবূ হুরায়রা (রা.) অধিক হাদীছ জানতেন বলে তিনি নিজে সরাসরি বর্ণনার চেয়ে তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মদীনার প্রখ্যাত তাবেঈ বিদ্বান আবূ ছালিহ আস-সাম্মান (১০১হি.) বলেন, كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يكن بأفضلهم 'আবূ হুরায়রা (রা.) ছাহাবীদের মধ্যে সর্বোত্তম না হ'লেও সর্বাধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন।'[২৩৩]

ইমাম আশ-শাফেঈ (২০৪হি.) বলেন, أبو هريرة أحفظ مـــن روى الحديث في دهره 'আবূ হুরায়রা তাঁর যুগে হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীছের হাফিয।'[২৩৪]

ইমাম আল-বুখারী (২৫৬হি.) বলেন, روى عنه نحو الثمانمائة من أهل العلم، وكان أحفظ من روى الحديث في عصـــره '(ছাহাবী এবং তাবেঈদের মধ্যে) প্রায় ৮ শত বিদ্বান তাঁর নিকট হ'তে হাদীছ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর যুগের হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীছের হাফিয।'[২৩৫]

ইমাম আল-হাকিম আন-নায়সাপুরী (৪০৫হি.) বলেন, قد تحريـــت الابتداء من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه لحفظه لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشهادة الصحابة والتابعين له بذلك، فإن كل من طلب حفـــظ

২৩২. *মুসতাদরাক হাকিম*, হা/৬১৭৫।
২৩৩. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৬।
২৩৪. আশ-শাফেঈ, *আর-রিসালাহ*, পৃ. ২৭৮।
২৩৫. ইবনু আব্দিল বার্র, *আল-ইসতী'আব*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৭১; ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, *আল-ইছাবাহ*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩।

الحديث من أول الإسلام وإلى عصرنا هذا فإنهم من أتباعه وشـــيعته إن هـــو أولهم وأحقهم باسم الحفظ 'আমি আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মর্যাদাসমূহের বর্ণনা সর্বাগ্রে নিয়ে এসেছি যেহেতু তিনি রাসূল (ছা.)-এর হাদীছের হাফিয ছিলেন এবং ছাহাবী ও তাবেঈগণ এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ইসলামের শুরু থেকে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত প্রত্যেক যে ব্যক্তি হাদীছ সংরক্ষণের অভিপ্রায় রাখে, তারা তাঁরই দল ও জোটভুক্ত। তিনি 'হিফয' (মুখস্থকরণ ও সংরক্ষণ) শব্দটির জন্য সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তি।'[২৩৬] অতঃপর তিনি যায়দ ইবনু ছাবিত, আবূ আইয়ূব আল-আনছারী, উবাই ইবনু কা'ব সহ ২৮ জন ছাহাবীর নাম এনেছেন যারা তাঁর সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

হাফিয আয-যাহাবী (৭৪৮হি.) বলেন, وكان حفـــظ أبي هريـــرة الخارق من معجزات النبـــوة 'আবূ হুরায়রা (রা.)-এর স্মৃতিশক্তি ছিল রাসূল (ছা.)-এর একটি মু'জিযা।'[২৩৭] তিনি বলেন, احتج المسلمون قديما وحـــديثا بحديثه، لحفظه، وجلالته، وإتقانه، وفقهه 'পূর্বে ও পরে সকল যুগে মুসলমানরা তাঁর হাদীছকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাঁর মুখস্থশক্তি, মর্যাদা, সূক্ষ্মতা এবং বিজ্ঞতার কারণে।'[২৩৮] অন্যত্র বলেন, إليه المنتهى في حفظ ما سمعه مـــن الرسول –عليه السلام– وأدائه بحروفـــه 'রাসূল (ছা.) হ'তে শ্রুত হাদীছসমূহ মুখস্থ করা এবং তা শব্দে শব্দে বর্ণনা করার ব্যাপারে তিনি হ'লেন সর্বোচ্চ শিখরে।'[২৩৯] তিনি আরও বলেন, وقد كان أبو هريرة وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث 'আবূ হুরায়রা (রা.) ছিলেন অটুট মুখস্থশক্তির অধিকারী। আমরা জানি না যে তিনি কোন হাদীছ বর্ণনায় ভুল করেছেন।'[২৪০]

ইবনু কাছীর (৭৭৪হি.) বলেন, وقد كان أبو هريرة من الصـــدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظـــيم 'আবূ

২৩৬. *মুসতাদরাক হাকিম*, হা/৬১৭৩-এর আলোচনা।
২৩৭. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৪।
২৩৮. তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৯।
২৩৯. তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১৯।
২৪০. তদেব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২১।

হুরায়রা সত্যবাদিতা, স্মৃতিশক্তি, দ্বীনদারী, ইবাদত, দুনিয়াত্যাগী মনোভাব এবং সৎ আমলের দিক থেকে অনেক উঁচু অবস্থানে ছিলেন।'[২৪১]

তিনি নিজে হাদীছ লিপিবদ্ধ না করলেও তাঁর নিকট থেকে কয়েকজন তাবেঈ হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। ড. মুছত্বফা আল-আ'যামী (২০১৭খ্রি.) বাশীর ইবনু নাহীক, হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহসহ ১০ জন তাবেঈর নাম উল্লেখ করেছেন যারা তাঁর নিকট থেকে কোন না কোন সময় হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।[২৪২]

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহে আবূ হুরায়রা (রা.)-এর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে ছাহাবী, তাবেঈ এবং পরবর্তী যুগের বিদ্বানদের এই ভূঁয়সী প্রশংসা এবং সাক্ষ্যই প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ সংরক্ষণে তিনি কি বিশাল ভুমিকা পালন করেছিলেন। সুতরাং তিনি নিজে হাদীছ লিপিবদ্ধ করেননি, এটি তার বিরুদ্ধে আপত্তির কোন কারণ হ'তে পারে না।

খ. ইসলাম গ্রহণ দেরীতে করলেও ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (ছা.)-এর সাথেই থাকতেন এবং তাঁর সাথে সর্বদা চলা-ফেরা করতেন। তাঁর সাথে হজ্জে গমন করেছিলেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই থাকতেন।[২৪৩] সুতরাং তাঁর অবস্থানকালীন মেয়াদ কম হ'লেও তিনি একাধারে দীর্ঘ সময় রাসূল (ছা.)-এর সান্নিধ্যে কাটিয়েছিলেন। ফলে তাঁর পক্ষে রাসূল (ছা.)-এর নিকট থেকে অসংখ্য হাদীছ শোনার সুযোগ হয়েছিল। যেমন এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ (রা.)। একদা তাঁর নিকট এক ব্যক্তি আবূ হুরায়রা (রা.) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে জিজ্ঞাসা করল, আবূ হুরায়রা (রা.) বেশী হাদীছ জানেন না আপনারা?...তখন তিনি আবূ হুরায়রা (রা.) সম্পর্কে বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যা শুনেছেন যা আমরা শুনিনি এবং তিনি যা জেনেছেন যা আমরা জানতে পারিনি– এমন সব ব্যাপারে তাঁর প্রতি কোন সন্দেহ পোষণ করা যাবে না। আমরা লোকেরা ছিলাম ব্যস্ত এবং পরমুখাপেক্ষী। আমাদের বাড়ী ছিল, পরিবার ছিল। আমরা রাসূল (ছা.)-এর নিকট দিনের একটা সময় আসতাম এবং চলে যেতাম। কিন্তু আবূ হুরায়রা ছিলেন দরিদ্র মানুষ। তার না ছিল অর্থসম্পদ, আর না ছিল পরিবার, সন্তান-সন্ততি। অতঃপর তিনি বলেন, إنما كانت يده مع يد النبي صلى الله عليـــه

২৪১. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১১০।
২৪২. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *দিরাসাতুন ফীল হাদীছ আন-নববী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬-৯৯।
২৪৩. ইবনু কাছীর, *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১০৮-১০৯।

وسلم، وكان يدور معه حيثما دار، ولا يشك أنه قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع، ولم يتهمه أحد منا أنه تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل 'তাঁর হাত থাকত সবসময় রাসূল (ছা.)-এর হাতের সাথে অর্থাৎ তিনি রাসূল (ছা.)-এর অন্তরঙ্গ থাকতেন এবং যেখানেই তিনি যেতেন তিনি তাঁর সাথে যেতেন। সুতরাং এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশের কিছু নেই যে তিনি যা জানেন তা আমরা জানি না এবং যা তিনি শুনেছেন তা আমরা শুনিনি। আমাদের মধ্যে কেউ তার প্রতি এই অপবাদ দেননি যে, তুমি রাসূল (ছা.) সম্পর্কে এমন কথা বল যা তিনি বলেননি।'[২৪৪]

আবূ হুরায়রা (রা.) নিজেই বলেন, লোকে বলে আবূ হুরায়রা অধিক হাদীছ বর্ণনা করে। (জেনে রাখ,) কিতাবে এই আয়াত যদি না থাকত, তবে আমি একটি হাদীছও পেশ করতাম না। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ 'আমি যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও পথনির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পরও যারা তা গোপন রাখে, তাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করে।'[২৪৫] (প্রকৃত ঘটনা এই যে,) আমার মুহাজির ভাইরা বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ে এবং আমার আনছার ভাইয়েরা জমা-জমির কাজে মশগুল থাকত। আর আবূ হুরায়রা খেয়ে না খেয়ে রাসূল (ছা.)-এর নিবিড় সাহচর্যে থাকত। ফলে সে উপস্থিত থাকত (এমন জায়গায়) যেখানে তারা উপস্থিত থাকত না এবং সে আয়ত্তে রাখত (এমন হাদীছ), যা তারা রাখত না।'[২৪৬]

দ্বিতীয়ত, তিনি নিজে হাদীছ শ্রবণের জন্য অত্যন্ত সজাগ এবং উদগ্রীব থাকতেন। তিনি বলেন, صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين لم أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن 'আমি রাসূল (ছা.)-এর সঙ্গ পেয়েছিলাম ৩ বছর। আমার জীবনে হাদীছ মুখস্ত করার আগ্রহ এই তিন বছরের চেয়ে বেশী আর কখনও ছিল না।'[২৪৭] রাসূল (ছা.)

২৪৪. *মুসতাদরাক হাকিম*, হা/৬১৭২।
২৪৫. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত : ১৫৯।
২৪৬. *ছহীহুল বুখারী*, হা/১১৮, ২০৪৭, *ছহীহ মুসলিম*, হা/২৪৯২-২৪৯৩।
২৪৭. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৩৫৯১

স্বয়ং তাঁর প্রশংসা করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা রাসূল (ছা.)-কে প্রশ্ন করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের ব্যাপারে কে সবচেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান হবে? রাসূল (ছা.) বললেন, আবূ হুরায়রা! আমি মনে করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার পূর্বে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। কেননা আমি দেখেছি হাদীছের প্রতি তোমার বিশেষ ঝোঁক রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হবে সেই ব্যক্তি যে একনিষ্ঠচিত্তে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।[২৪৮] উবাই ইবনু কা'ব (রা.) বলেন, كان أبو هريرة جريئا على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أشياء لا نسأله عنها 'আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূল (ছা.)-এর নিকট একজন সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁকে এমন সব প্রশ্ন করতেন, যা আমরা করতে পারতাম না।'[২৪৯]

তৃতীয়ত, তিনি রাসূল (ছা.)-এর সাথে তিনটি বছর কাটিয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর জীবনের শেষ বছরসমূহ। মদীনায় তখন সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবেও স্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল। ফলে রাসূল (ছা.) তাঁর উম্মতের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদানের অখণ্ড অবসর পেয়েছিলেন। আর আবূ হুরায়রা (রা.) এই মহাগুরুত্বপূর্ণ সময়টি তাঁর সাথে অবস্থান করায় তাঁর প্রতিটি নকল ও হারকাত স্বচক্ষে দেখেছিলেন ও স্বকর্ণে শুনেছিলেন এবং তা সংরক্ষণ করেছিলেন। ফলে এই তিনটি বছর তাঁর নিকট বহু বছরের সমতুল্য ছিল। ফলে তাঁর হাদীছ বর্ণনার সংখ্যাও অনেক বেশী হয়েছিল। অন্যদিকে তিন বছর অর্থ আরবী মাস অনুযায়ী ১০৬২দিন। এর বিপরীতে তাঁর বর্ণিত মোট হাদীছ সংখ্যা সর্বমোট ৫৩৭৪টি।[২৫০] অর্থাৎ গড়ে তিনি প্রতিদিন ৫টি হাদীছ শুনেছেন, যার মধ্যে কথ্য, কর্মগত ও স্বীকৃতিমূলক হাদীছ সবই রয়েছে। সুতরাং সবমিলিয়ে এই সংখ্যা মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না। উপরন্তু হাদীছের এই সমষ্টিগত সংখ্যাটি কেবল ছহীহ হাদীছের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর মধ্যে জাল ও যঈফ বর্ণনাও সন্নিবেশিত রয়েছে। আরও রয়েছে এমন হাদীছ, যা বহু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। রয়েছে এমন হাদীছ যা তিনি সরাসরি রাসূল (ছা.) হ'তে শ্রবণ করেননি বরং অপরাপর ছাহাবীদের মাধ্যমে জেনেছেন। সুতরাং এগুলো যদি বাদ দেয়া হয় তবে হাদীছের মূল সংখ্যাও অনেক কমে যাবে। ছহীহুল

---

২৪৮. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৯৯, ৬৫৭০।
২৪৯. *মুসতাদরাক হাকিম*, হা/৬১৬৬।
২৫০. ইবনুল জাওযী, *তালক্বীহু ফুহূমি আহলিল আছার* (বৈরূত : দারুল আরকাম, ১৯৯৭খ্রি.), পৃ. ২৬৩।

বুখারীতে তাঁর বর্ণিত পুনরুল্লেখসহ মোট হাদীছের সংখ্যা ৪৪৬টি, যা এক মজলিসেই পাঠ করে শোনানো সম্ভব।[২৫১] এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যারা তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা নিয়ে আপত্তি তুলেছেন তারা কেবল সংখ্যাই গণনা করেছেন, পারিপার্শ্বিকতা খতিয়ে দেখেননি। নতুবা তাঁর সম্পর্কে এই আপত্তি তুলতেন না।

ড. মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান আ'যামী (জন্ম : ১৯৪৩খ্রি.) তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত মোট হাদীছ সংখ্যা তাঁর অনুসন্ধান মোতাবেক পুনরাবৃত্তি ছাড়া ১৩৩৬টি। এর মধ্যে আবূ হুরায়রা (রা.) এককভাবে বর্ণনা করেছেন ২২০টি হাদীছ।[২৫২] সম্প্রতি অপর একজন গবেষক উল্লেখ করেছেন যে, কুতুবে ছিত্তাহ্-এ তাঁর এককভাবে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ১০টি এবং সামগ্রিকভাবে মোট ৪২টি।[২৫৩] অর্থাৎ মাত্র এই কয়েকটি হাদীছ তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া তাঁর বর্ণিত বাকি সকল হাদীছ অন্যান্য ছাহাবী থেকেও বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই পরিসংখ্যান জানার পর আবূ হুরায়রা (রা.)-এর অধিক বর্ণনা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

মুহাম্মাদ রশীদ রিযা (১৯৩৫খ্রি.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর অধিক হাদীছ বর্ণনার সাতটি কারণ উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও তিনি উল্লেখ করেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রসঙ্গক্রমে কিংবা প্রসঙ্গহীনভাবে হাদীছ বর্ণনা করতেন যাতে মানুষ জ্ঞান আহরণ করতে পারে। যেখানে অন্য ছাহাবীদের ক্ষেত্রে দেখা যেত তারা সাধারণত প্রয়োজন সাপেক্ষে কিংবা কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'লে হাদীছ বর্ণনা করতেন। তাছাড়া তিনি রাসূল (ছা.) হ'তে সরাসরি বর্ণনা ছাড়াও অন্যান্য ছাহাবীদের সূত্রেও অনেক হাদীছ বর্ণনা করেছেন, যে সকল হাদীছ তাঁর ইসলামগ্রহণের পূর্বেই রাসূল (ছা.) হ'তে তাঁরা শুনেছিলেন। মোটকথা তিনি হাদীছের প্রচার ও প্রসারকেই তিনি তাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান করে নিয়েছিলেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় বেশী হয়েছে।[২৫৪]

---

২৫১. যিয়াউর রহমান আল-আ'যামী, *আবূ হুরায়রা ফী যূয়ী' মারভিয়াতিহি বি শাওয়াহিদিহা ওয়া হালি ইনফিরাদিহা*, পৃ. ৭-৮।

২৫২. মুহাম্মাদ রশীদ রিযা, *আস-সুন্নাহ ওয়া ছিহ্হাতুহা ওয়াশ শারী'আহ ওয়া মাতানাতুহা* (কায়রো : মাজাল্লাতুল মানার, ১৯তম খণ্ড, শা'বান/১৩৩৪হি.) পৃ. ২৫।

২৫৩. মুহসিন নাবীল, *দিফাউন আন আবী হুরায়রা (রা.)*, দ্র. http://www.dd-sunnah.net/records/view/action/view/id/1779/

২৫৪. মুহাম্মাদ রশীদ রিযা, *আস-সুন্নাহ ওয়া ছিহ্হাতুহা ওয়াশ শারী'আহ ওয়া মাতানাতুহা*, পৃ. ২৫।

গ. আবূ হুরায়রা (রা.) বহু সংখ্যক হাদীছ বর্ণনার কারণে কতিপয় ছাহাবী ও তাবেঈ তাঁর প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছিলেন, যা আমরা উপরে উল্লেখিত হাদীছসমূহে লক্ষ্য করেছি। আর এই সন্দেহের জবাব আবূ হুরায়রা (রা.) নিজেই প্রদান করেছিলেন, যা ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। ড. আস-সিবাঈ (১৯৬৪খ্রি.) বলেন, এটা স্বাভাবিক যে অনেক পরে ইসলাম গ্রহণ সত্ত্বেও এত অধিক হাদীছ বর্ণনার কারণে কিছু তাবেঈ এবং শহর থেকে দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী ছাহাবীর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। তারা ভেবেছিলেন যে, বড় বড় ছাহাবীগণ যত হাদীছ বর্ণনা করেন না তার চেয়ে বেশী বর্ণনা করেন আবূ হুরায়রা (রা.)। এটা কীভাবে? এই প্রশ্ন তাঁরা আবূ হুরায়রা (রা.)-কে সরাসরি করেছিলেন। তাঁর প্রতি কুধারণা বা মিথ্যারোপ করার জন্য নয়, বরং জানার কৌতুহল থেকে করেছিলেন। অতঃপর যখন আবূ হুরায়রা (রা.) জবাব দিলেন তাঁরা খুশীমনে স্বীকার করে নিলেন।[২৫৫] সুতরাং এই সন্দেহ আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল না। নতুবা ২৫ জন ছাহাবীসহ প্রায় ৮ শত বর্ণনাকারী কিভাবে তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন, যদি তাঁর সত্যবাদিতার উপর আস্থা না রাখেন? তিনিই সেই ছাহাবী যাকে মর্যাদাবান ছাহাবীগণ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। যেমন একবার আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি একটি ফৎওয়া জানার জন্য আসলে তিনি তাঁকে বললেন, এ বিষয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। তুমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) এবং আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নিকট যাও। অতঃপর লোকটি এসে তাঁদের দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলে ইবনু আব্বাস (রা.) বললেন, أفته يا أبا هريرة، فقد جاءتك معضلة 'হে আবূ হুরায়রা! আপনি ফৎওয়াটি দিন, আপনার নিকট প্রশ্ন এসেছে।' অতঃপর তিনি ফৎওয়া দানের পর ইবনু আব্বাস (রা.) তাঁর সমর্থনে বললেন, مثل ذلك 'এটাই ফৎওয়া।'[২৫৬]

সুতরাং তাঁর বিশ্বস্ততার প্রতি কোন ছাহাবী বা তাবেঈ কুধারণা পোষণ করবেন, তা অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, আয়েশা (রা.), ইবনু আব্বাস (রা.) প্রমুখ তাঁর কিছু হাদীছ গ্রহণ করেননি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন; বরং এটি হাদীছের মর্ম বোঝার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য কিংবা

---

২৫৫. আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ৩১১-৩১২।
২৫৬. *মুওয়াত্ত্বা মালিক*, তাহক্বীক : মুছত্বফা আল-আ'যামী, হা/২১১০।

হাদীছ বর্ণনায় ভুল করলে তা সংশোধন করে দেয়ার প্রয়াস ছিল মাত্র। অনুরূপভাবে উমার (রা.) কর্তৃক তাঁর অধিক হাদীছ বর্ণনার প্রতি নিষেধাজ্ঞাস্বরূপ যে সকল হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সনদসূত্র দুর্বল, যা ইতোপূর্বে গত হয়েছে। আর যদি এ সকল বর্ণনা ছহীহও ধরে নেয়া হয়, তবে এর পিছনে উমার (রা.)-এর বিশেষ হিকমত ছিল যে, মানুষ যেন রাসূল (ছা.)-এর হাদীছকে ক্রীড়ার বস্তু হিসাবে পরিণত না করে এবং যাচাই-বাছাই বিহীনভাবে গ্রহণ না করে। তিনি এর দ্বারা কখনই আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেননি।

ঘ. আবূ হুরায়রা (রা.) অধিক হাদীছ বর্ণনা করার সুযোগে হাদীছ জালকারীরা তাঁর নামে অসংখ্য হাদীছ জাল করার সুযোগ পেয়েছে মর্মে প্রাচ্যবিদ গোল্ডজিহার এবং ড. আহমাদ আমীন প্রমুখ যে অভিযোগ করেছেন, তার উত্তরে বলা যায় যে, হাদীছ জালকারীদের এই তৎপরতা আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সাথেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং আয়েশা (রা.), ইবনু আব্বাস (রা.), ইবনু উমার (রা.) প্রমুখের নামেও অসংখ্য জাল হাদীছ রচনা করা হয়েছে। এর জন্য আবূ হুরায়রা (রা.) বা বিশেষ কোন ছাহাবী দায়ী নন। বরং জালকারীরাই দায়ী। আর তাদের এই অপকর্মের কারণে কোন ছাহাবীর হাদীছকে সন্দেহ ও সংশয়পূর্ণ চিহ্নিত করা অমূলক।

ঙ. তাঁকে মৃগীরোগী এবং স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন হিসাবে আখ্যায়িত করার মাধ্যমে প্রাচ্যবিদ গোল্ডজিহার[২৫৭] ঠিক একই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে পদ্ধতিতে প্রাচ্যবিদরা রাসূল (ছা.)-এর অহী প্রাপ্তিকেও মৃগীরোগের ফলশ্রুতি হিসাবে অপবাদ দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রা.) তাঁর নিজের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, (অনেক সময়) মিম্বর এবং আয়েশা (রা.)-এর হুজরার মাঝখানে ক্ষুধায় আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম। লোকেরা বলাবলি করত আবূ হুরায়রাকে পাগলামী বা মৃগীরোগ ধরেছে। অথচ আমি পাগল ছিলাম না; বরং ক্ষুধার তাড়নায় আমার এরূপ অবস্থা হ'ত।[২৫৮] এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে প্রাচ্যবিদগণ তাঁকে রোগী এবং হালকা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করার যে প্রয়াস চালিয়েছেন, তা খুবই দুঃখজনক। আহলুছ ছুফ্ফার অধিবাসী হিসাবে তিনি রাসূল (ছা.)-এর খেদমতে থেকে যৎসামান্য খানা পেলেই তাতে সন্তুষ্ট থাকতেন এবং হাদীছ শ্রবণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে কোথাও যেতেন না। এজন্য কখনও তিনি উপোস থাকতে থাকতে পেটে পাথর

---

২৫৭. আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ২৯৩।
২৫৮. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৭৩২৪।

চাপা দিয়েও রাখতেন।[২৫৯] এসবের কিছুর মধ্যে তাঁর দুনিয়াত্যাগী এবং পরহেযগারিতার ভাবমূর্তিই ফুটে ওঠে। অথচ একে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে প্রাচ্যবিদগণ যে অপবাদ প্রদান করেছেন, তা শুধু তাদের ইসলাম বিদ্বেষী অবস্থানকেই প্রকট করে।

সংশয়-৫ : মুজতাহিদ ইমামগণ হাদীছকে গুরুত্ব প্রদান করেন নি। ইমাম আবূ হানীফা হাদীছকে গুরুত্ব দিতেন না। ইমাম মালিকও হাদীছের পরিবর্তে নিজ শহরে প্রচলিত আমলকে গুরুত্ব দিতেন।

হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (১৫০হি.)-এর শর্তাবলী কঠোর ছিল এবং ইমাম মালিক (১৭৯হি.) মদীনাবাসীর আমলকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতেন। যদি তারা হাদীছকে ইসলামী শরী'আতের উৎসই মনে করতেন, তবে তারা এই নীতি কেন গ্রহণ করেছিলেন? প্রাচ্যবিদ এবং হাদীছ অস্বীকারকারীগণ এই সূত্র ধরে হাদীছ ইসলামী শরী'আতের উৎস নয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

পর্যালোচনা :

ক. ইমাম আবূ হানীফা বা ইমাম মালিকসহ কোন ইমামই হাদীছ পরিত্যাগের জন্য কিংবা তার প্রতি গুরুত্বহীনতার জন্য এ সকল শর্তারোপ করেননি; বরং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে অধিকতর নিশ্চিত হওয়া। ড. রিফ'আত ফাওযী বলেন, 'দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতে বিদ্বানদের কাউকে কিছু হাদীছ পরিত্যাগ করতে দেখা যায়, যেমন কোন হাদীছ ছাহাবীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ না হ'লে বা তাঁরা দলীল হিসাবে গ্রহণ না করলে, কিংবা কোন কোন শহরে তার ওপর আমল না করা হ'লে বিশেষত মদীনায় আমল না করা হ'লে। এক্ষেত্রে তারা হাদীছের পরিবর্তে ছাহাবীদের বক্তব্য কিংবা মদীনাবাসীর আমলকে গ্রহণ করতেন। তাদের এই নীতি গ্রহণের পিছনে দু'টি কারণ প্রণিধানযোগ্য : (১) তাঁরা ছাহাবীদের বক্তব্য এবং মদীনাবাসীর আমল এই জন্য প্রাধান্য দিতেন না যে, তা সুন্নাহ্‌র মত মর্যাদাবান ও গুরুত্বপূর্ণ। বরং তারা হাদীছটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হয়েছিলেন এবং তাদের কাছে মনে হয়েছিল যে, হাদীছটি রাসূল (ছা.)-এর নয়। হয়ত হাদীছের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন বিচ্ছিন্নতা আছে। (২) তাঁরা মূলত

২৫৯. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৬৪৫২।

রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণের জন্যই এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন। কেননা তারা যখন মদীনাবাসীর আমল বা কোন ছাহাবীর বক্তব্যকে গ্রহণ করেন, তখন তা এই বিশ্বাস থেকে গ্রহণ করেন যে আমলটি নিশ্চয়ই রাসূল (ছা.)-এর সূত্রে তাদের নিকট পৌঁছেছে কিংবা ছাহাবী নিশ্চয়ই রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ থেকেই আমলটি গ্রহণ করেছিলেন।[২৬০]

খ. যদি হাদীছকে গুরুত্বহীনই মনে করবেন, তবে কেন ইমাম মালিক (১৭৯হি.) তাঁর বিখ্যাত হাদীছগ্রন্থ 'মুওয়াত্ত্বা মালিক' সংকলন করলেন? অনুরূপভাবে ইমাম আবূ হানীফা (১৫০হি.) নিজে কোন হাদীছগ্রন্থ সংকলন না করলেও তাঁর বর্ণিত হাদীছ পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে।[২৬১] সুতরাং তাঁরা হাদীছকে ইসলামী শরী'আতের অপরিহার্য দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নতুবা তাঁরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসরণীয় ইমাম হওয়ারই যোগ্য হ'তেন না।

গ. হাদীছ সম্পর্কে বিস্তর অবগতি থাকা সত্ত্বেও ইমাম আবূ হানীফা (১৫০হি.) হ'তে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা কম হওয়ার কারণ ছিল তিনি হাদীছ থেকে ফিকহী মাসআলা নির্ণয়ে অধিক ব্যস্ত থাকতেন। একই কারণে ইমাম মালিক (১৭৯হি.) এবং ইমাম শাফেঈ (২০৪হি.)-ও তাঁদের অবগতির তুলনায় অনেক কম হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমনভাবে আবূ বকর এবং উমার (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা কম, অথচ তাঁদের সমসাময়িক অন্যদের বর্ণনা অনেক বেশী।[২৬২]

ঘ. একথা অনস্বীকার্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (১৫০হি.) হাদীছের ব্যাপারে কম মনোযোগী ছিলেন মর্মে বিদ্বানদের মধ্যে প্রাথমিক যুগ থেকেই একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে।[২৬৩] যেমন খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.) তাঁর 'তারীখু বাগদাদ'-এ এমন অনেক বর্ণনা এনেছেন যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হাদীছের ব্যাপারে গুরুত্বহীনতা প্রকাশ করেছেন, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে

---

২৬০. ড. রিফ'আত ফাওযী, *তাওছীকুস সুন্নাহ ফীল ক্বারনিছ ছানী আল-হিজরী*, পৃ. ১৪-১৫।

২৬১. আবূ ইউসূফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, আবু নাঈম আল-আস্ফাহানী সহ বেশ কয়েকজন বিদ্বান ইমাম আবূ হানীফা বর্ণিত হাদীছ সমূহের সংকলন করেন 'আল-মুসনাদ' নামে। আবুল মুআইয়িদ মুহাম্মাদ ইবনু মাহমূদ আল-খাওয়ারিযিমী (৬৬৫হি.) এমন মোট ১৫টি মুসনাদ একত্রে জমা করে সংকলন করেন جامع المسانيد।

২৬২. আবূ যাহু, *আল-হাদীছু ওয়াল মুহাদ্দিছূন*, পৃ. ২৮৪-২৮৫।

২৬৩. ড. মুহাম্মাদ বালতাজী, *মানাহিজুত তাশরী' আল-ইসলামী ফিল ক্বারনিছ ছানী আল-হিজরী* (কায়রো : দারুস সালাম, ২০০৭খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১-২২৩।

হাদীছের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করেছেন।[২৬৪] তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (১৫০হি.) চার শতেরও বেশী হাদীছ পরিত্যাগ করেছেন। তিনি ওয়াক্বী‘ ইবনুল জার্রাহ (১৯৭হি.) হ’তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি দেখেছি আবূ হানীফা ২০০টি হাদীছ পরিত্যাগ করেছেন।[২৬৫] অনুরূপভাবে ইবনু আবী শায়বাহ (২৩৫হি.) তাঁর ‘আল-মুছান্নাফ’ গ্রন্থে كتاب الرد على أبي حنيفة অধ্যায়ে هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم অনুচ্ছেদে ১২৫টি মাসআলা উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি হাদীছ বিরোধী ফৎওয়া প্রদান করেছেন।[২৬৬] এছাড়া ইমাম আবূ হানীফার সংগৃহীত হাদীছও অতি অল্পসংখ্যক দাবী করেছেন অনেক বিদ্বান। যেমন ইবনু হিব্বান (৩৫৪হি.) বলেন, তিনি মাত্র ১৩০টি হাদীছ বর্ণনা করেছিলেন।[২৬৭] ইবনু খালদূন (৮০৮খ্রি.) বলেন, أبو حنيفة رضي الله تعـــالى عنه يقال بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو نحوهـــا ‘আবূ হানীফা (রা.) সম্পর্কে বলা হয় যে, তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ১৭টি বা অনুরূপ।’[২৬৮]

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, প্রথমত, ইমাম আবূ হানীফা (১৫০খ্রি.) আহলুর রায় বা রায়পন্থী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি ফিকহী মাসআলা নির্ণয়ে অধিক মশগুল থাকা এবং ক্বিয়াস বা রায় অবলম্বনের কারণে সমকালীন মুহাদ্দিছদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। ফলে একদল মানুষ তাঁর গুণগ্রাহী যেমন ছিল, তেমনি তাঁর প্রতি বিরাগভাজন মানুষের সংখ্যাও কম ছিল না। খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.) তাঁর প্রতি বিরাগভাজনদের এ সকল মতামত কেবল একজন ঐতিহাসিক হিসাবে স্বীয় গ্রন্থে একত্রিত করেছেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফার মর্যাদাহানী করতে চেয়েছেন, তা নয়।[২৬৯]

দ্বিতীয়ত, এ সকল মন্তব্যের অধিকাংশেরই সত্যতা নিশ্চিত হওয়া যায় না এবং সুস্থ বিবেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্যও মনে হয় না। আর সত্যতা নিশ্চিত

---

২৬৪. খত্বীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৫-৩৯৪।

২৬৫. তদেব, পৃ. ৩৯০।

২৬৬. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭-৩২৫।

২৬৭. ইবনু হিব্বান, *আল-মাজরূহীন* (আলেপ্পো : দারুল ওয়াঈ‘, ১৩৯৬হি.), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৩।

২৬৮. ইবনু খালদূন, *তারীখু ইবনু খালদূন* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ : ১৯৮৮খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬১।

২৬৯. ইবনু হাজার আল-হায়ছামী আল-মাক্কী, *আল-খাইরাতুল হিসান ফী মানাক্বিবিল ইমাম আল-আ‘যাম*, (মিসর : মাতবা‘আতুস সা‘আদাহ, ১৩২৪হি.), পৃ. ৭৯।

হ'লেও তা প্রমাণের ভার মতামত প্রকাশকারীদের উপরই বর্তাবে। কেননা আমাদের দৃষ্টিতে এ সকল মন্তব্য যথার্থ নয়। এর কারণ হ'ল ইমাম আবূ হানীফা (১৫০হি.) থেকে অসংখ্য এমন মত প্রকাশিত হয়েছে, যা হাদীছের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা প্রকাশ করে। খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.) স্বয়ং এমন অনেক মত উদ্ধৃত করেছেন যা হাদীছের পক্ষে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে। যেমন তিনি ইবনুছ ছাবাহ হ'তে বর্ণনা করেন, وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، وإن كان عن الصحابة والتابعين، وإلا قاس وأحسن القياس 'যখনই তাঁর সম্মুখে কোন মাসআলায় ছহীহ হাদীছ পেশ করা হ'ত তিনি তার অনুসরণ করতেন এমনকি যদি তা কোন ছাহাবী বা তাবেঈ'র বক্তব্য হয়। নতুবা তিনি ক্বিয়াস করতেন এবং যথার্থভাবেই করতেন।'[২৭০] তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, সুফিয়ান আছ-ছাওরী (১৬১হি.)-কে ফিকহী বিষয়ে তাঁর নীতি সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (১৫০হি.) বলেন, آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت بقول أصحابه 'আমি ফিক্বহী বিষয়ে প্রথমত কিতাবুল্লাহ থেকে হুকুম গ্রহণ করি। যদি আল্লাহ্র কিতাবে না পাওয়া যায় তবে রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ থেকে হুকুম গ্রহণ করি। আর যদি আল্লাহ্র কিতাবেও না পাওয়া যায় এবং রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহেও না পাওয়া যায়, তবে আমি ছাহাবীদের বক্তব্য থেকে দলীল গ্রহণ করি...।'[২৭১] এছাড়া তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত মত হ'ল– إذا صح الحديث فهو مذهبي 'যখন কোন হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হবে, তখন সেটিই আমার মাযহাব।' সুতরাং হাদীছ ও সুন্নাহ্র প্রতি এমন বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণকারী একজন ব্যক্তি হাদীছের প্রতি তাচ্ছিল্য করবেন এবং গুরুত্বহীনতা প্রকাশ করবেন, তা অবিশ্বাস্য। অতএব সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাঁর সম্পর্কে সবচেয়ে ন্যায়ানুগ কথা হবে তিনি কখনও ছহীহ হাদীছ পাওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে তা পরিত্যাগ করেননি। ইবনু তায়মিয়া (৭২৮হি.) বলেন, ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من

---

২৭০. খত্বীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৪০।
২৭১. তদেব, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫।

أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى 'যে ব্যক্তি আবূ হানীফা অথবা ইসলামের অন্যান্য ইমামদের সম্পর্কে ধারণা করে যে, তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করেছেন, ক্বিয়াস বা অন্য কোন কারণে, সে নিঃসন্দেহে তাদের ব্যাপারে ভুল ধারণা করেছে এবং তাদের সম্পর্কে কুধারণা কিংবা স্বেচ্ছাচারিতামূলক মন্তব্য করেছে।'[২৭২]

তৃতীয়ত, ওয়াক্বী' ইবনুল জার্রাহ (১৯৭হি.), ইবনু আবী শায়বাহ (২৩৫হি.) প্রমুখের মতে তিনি যে সকল মাসআলায় হাদীছের বিরোধিতা করেছেন, তা তাঁর ইচ্ছাকৃত ছিল না। বরং হয়ত সে বিষয়ক হাদীছগুলি তাঁর শর্ত মোতাবেক ছহীহ প্রমাণিত হয়নি কিংবা হাদীছটি তাঁর নিকট পৌঁছেনি কিংবা হাদীছটি কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হওয়ায় গ্রহণ করেননি। খবর ওয়াহিদের গ্রহণে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক শর্তসমূহ গ্রহণও এর পিছনে একটি বড় কারণ ছিল।[২৭৩] বিশেষত বাগদাদে হাদীছ জালকরণের ফিৎনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ইরাক পরিণত হয়েছিল হাদীছ জালকারীদের নিরাপদ আশ্রয়ে। এমনকি ইরাককে বলা হ'ত دار ضرب الحديث 'হাদীছ ভাঙ্গার কেন্দ্র'। ফলে স্বভাবতই এই পরিস্থিতি তাঁকে হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে অতীব সতর্ক দৃষ্টি রাখতে এবং হাদীছ গ্রহণে কঠিন শর্তারোপ করতে বাধ্য করেছিল, যেন দ্বীনের মধ্যে বাতিল বক্তব্য ও আমলের অনুপ্রবেশ না ঘটে। আর সম্ভবত এজন্যই তিনি হাদীছ সংগ্রহের কাজে অন্যদের মত তেমন একটা সফরে বের হননি।[২৭৪] সর্বোপরি হাদীছ সম্পর্কে তাঁর গৃহীত নীতিতে কিছু ভুল থাকতেই পারে। ইয়াযীদ ইবনু হারূন বলেন, أبو حنيفة رجل من الناس، خطؤه كخطأ الناس وصوابه كصواب الناس 'ইমাম আবূ হানীফা (১৫০হি.) একজন মানুষ। মানুষ হিসাবে তিনি ভুলও করেছেন এবং ঠিকও করেছেন।'[২৭৫] কিন্তু এ কারণে

২৭২. ইবনু তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৩০৪।

২৭৩. ইবনু তায়মিয়া, *রফ'উল মালাম আন আইম্মাতিল আ'লাম*, পৃ. ৯-৩৪; আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ৪২০-৪২১; ড. মুহাম্মাদ কাসিম আব্দুহু আল-হারিছী, *মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা বায়নাল মুহাদ্দিছীন* (মক্কা : মাতাবিউছ ছাফা, ১৪১৩হি.), পৃ. ৩১৮।

২৭৪. আবূ যাহূ, *আল-হাদীছু ওয়াল মুহাদ্দিছূন*, পৃ. ২৪০; আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ৪০৪।

২৭৫. খত্বীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৬।

তাঁকে হাদীছ বিরোধী কিংবা হাদীছের প্রতি কম গুরুত্ব প্রদর্শনকারী হিসাবে সাব্যস্ত করা যায় না।

চতুর্থত, পূর্ববর্তী বিদ্বানগণ যেমন ইবনু হিব্বান (৩৫৪হি.), ইবনু খালদূন (৮০৮খ্রি.) প্রমুখ বিদ্বানের মতানুযায়ী তিনি অতি স্বল্পসংখ্যক হাদীছ অবগত ছিলেন, তা বিস্ময়কর। বাগদাদকে জাল হাদীছ রচনার সূতিকাগার যখন বলা হয়েছে, তখন নিশ্চিতভাবে সেখানে হাদীছ বর্ণনার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফার মত একজন বিখ্যাত অনুসরণীয় ইমাম এবং ফক্বীহের হাদীছ সম্পর্কে অবগতি না থাকা বাস্তবতার বিপরীত প্রতীয়মান হয়। বিশেষত তাঁর নিজস্ব কোন রচনা না থাকলেও তাঁর বর্ণিত হাদীছসমূহ তাঁর ছাত্রগণ সংকলন করেছেন, যা আবুল মুআইয়িদ মুহাম্মাদ ইবনু মাহমূদ আল-খাওয়ারিযিমী (৬৬৫হি.) একত্রে সংকলন করেছেন جامع مسانيد الإمام الأعظم শিরোনামে। এটি ১৫টি মুসনাদের সংকলন এবং প্রায় পাঁচ শত হাদীছ সংকলিত হয়েছে।[২৭৬] এছাড়া ইমাম আবূ হানীফার ছাত্র ও শিষ্যদের হাদীছ গ্রন্থ সংকলন থেকেও প্রতীয়মান হয় যে কূফায় হাদীছের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বিশেষ করে ইবনু মাসঊদ (রা.), আলী (রা.), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা.) প্রমুখ ছাহাবী যে শহরে অবস্থান করেছিলেন, বিশিষ্ট তাবেঈ মাসরূক ইবনু আজদা', আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ, আলক্বামাহ প্রমুখ তাবেঈ যে শহরের বাসিন্দা ছিলেন, সেই শহরে হাদীছের এমন দৈন্যদশা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে হিজাযের মত হাদীছ বর্ণনার ব্যাপক প্রচলন ছিল না বলে সম্ভবত কূফায় তুলনামূলক হাদীছের প্রসার কম হয়েছিল।[২৭৭]

---

২৭৬. ইণ্ডিয়ার হায়দারাবাদ, দাক্ষিণাত্য থেকে ২ খণ্ডে প্রকাশিত। প্রকাশকাল : ১৩৩২ হিজরী।

২৭৭. আবূ যাহূ, *আল-হাদীছু ওয়াল মুহাদ্দিছূন*, পৃ. ২৮৪-২৮৫; আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ৪১৪-৪১৫; মুবাশ্শির হোসাইন, *আহাদীছে আহকাম আওর ফুকাহায়ে ইরাক্ব* (ইসলামাবাদ : ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ, ২০১৫খ্রি.), পৃ. ২৭৯-২৮০।

৩য় পরিচ্ছেদ

যুক্তিবাদী সমালোচনা

সংশয়-১ : রাসূল (ছা.)-এর আনুগত্য কেবল তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রযোজ্য।

সমকালীন যুগের একজন লেখক মুহাম্মাদ ইবনু দীব শাহরূর বলেন, রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ হ'ল ছাহাবীদের জন্য ৭ম শতাব্দীর সমাজব্যবস্থার উপর প্রযোজ্য নীতিমালা। তাই একবিংশ শতাব্দীতে তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর অগ্রগতি সাধন করতে চাইলে অবশ্যই বাস্তবধর্মী (Pragmatic) এবং চলমান সমাজব্যবস্থার উপযোগী ব্যাখ্যা (Contextual Interpretation)-এর মাধ্যমে ইসলামের বিধানসমূহ ঢেলে সাজাতে হবে।[২৭৮] তিনি আরও বলেন, কুরআনই হ'ল একমাত্র অহী, যা অপরিবর্তনীয়। আর হাদীছ হ'ল মানবীয় ইজতিহাদের নাম। রাসূল (ছা.) ছিলেন প্রথম মুজতাহিদ। হাদীছ হ'ল তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ, যা কালের বিবর্তনে পরিবর্তনীয়।[২৭৯] এছাড়া খাজা আহমাদ দ্বীন, জামাল বান্না প্রমুখও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[২৮০]

পর্যালোচনা :

রাসূল (ছা.)-এর জীবদ্দশায় তাঁর সুন্নাহ বলবৎ থাকা এবং তাঁর মৃত্যুর পর তা বাতিল হওয়ার এই অভিনব দাবী এতই অগ্রহণযোগ্য যে, এর সপক্ষে দূরতম দলীলও নেই এবং সাধারণ যুক্তিবোধও তা সমর্থন করে না। নিরেট বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রসূত এই দাবীর সাথে ইসলামের আক্বীদা-বিশ্বাস, মূলনীতি ও কর্মধারার কোন সম্পর্ক নেই। নিম্নে এর জবাব উপস্থাপিত হ'ল।

---

২৭৮. মুহাম্মাদ দীব শাহরূর, *আল-কিতাব ওয়াল কুরআন : কিরাআহ মু'আছারাহ*, পৃ. ৫৫০।

২৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭১-৫৭২।

২৮০. দ্র. ড. খাদিম ইলাহী বখশ, *আল-কুরআনিউন ওয়া শুবহাতুহুম হাওলাস সুন্নাহ*, পৃ. ২৩০-২৩১; ড. আদনান মাহমূদ যুরযূর, *আস-সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ ওয়া উলূমুহা বাইনা আহলিস সুন্নাহ ওয়াশ শী'আহ আল-ইমামিয়াহ* (আম্মান : দারুল আ'লাম, ২০০৮খ্রি.), পৃ. ১০৪।

ক. কুরআন ও সুন্নাহ মানবজাতির জন্য চূড়ান্ত জীবনবিধান হিসাবে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। রাসূল (ছা.) ছিলেন শেষনবী এবং তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে অহী অবতরণের ধারা পরিসমাপ্ত হয়েছে। অতঃপর তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ দ্বীনের পূর্ণতা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং এই দ্বীন নিছক রাসূল (ছা.)-এর ব্যক্তিজীবনের জন্য কিংবা তাঁর সমকালীন মানুষদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করা হয়নি; বরং তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সমগ্র মানবজাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ এবং অবধারিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।'[২৮১] এই আয়াতসমূহে আল্লাহ কেবল ছাহাবীদেরকে সম্বোধন করেননি; বরং সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করেছেন। ইবনুল কাইয়িম (৭৫২খ্রি.) বলেন, وإن قالوا: بل كان ذلك للصحابة فقط، قالوا الباطل، وخصصوا خطاب الله بدعوى كاذبة، إذ خطابه تعالى بالآيات التي ذكرها عموم لكل مسلم في الأبد، ولزمهم مع هذه العظيمة أن دين الإسلام غير كامل عندنا 'যদি তারা বলে যে, এই সম্বোধন কেবল ছাহাবীদের জন্য, তাহ'লে এ কথা বাতিল। তারা আল্লাহ্র সম্বোধনকে সীমায়িত করেছে মিথ্যা দাবী তুলে। কেননা এ সকল আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ চিরকাল যত মুসলিম আসবে তাদের সকলকে সম্বোধন করেছেন। আর তাদের এই ভয়ংকর দাবী তাদের জন্য এটা বিশ্বাস করা আবশ্যক করে দেয় যে, ইসলাম আমাদের নিকট অপূর্ণাঙ্গ ধর্ম।'[২৮২]

সুতরাং এই ধারণার কোন অবকাশ নেই যে, ইসলামী শরী'আত নির্দিষ্ট কোন জাতি বা যুগ কিংবা বিশেষ কোন পরিস্থিতির জন্য নাযিল করা হয়েছে।

খ. রাসূল (ছা.) কেবল একজন শাসক ছিলেন না যে তাঁর আনুগত্য কেবল তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে; বরং তিনি ছিলেন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বার্তাবাহক। তিনি শাসক হিসাবে আনুগত্য পাবার হক্বদার নন, বরং একজন রাসূল হিসাবে আনুগত্য পাবার হক্বদার। যদি তিনি কেবল শাসক হতেন, তবে তাঁর শাসনকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত তাঁর আনুগত্য সীমাবদ্ধ হওয়ার যুক্তি

২৮১. সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৩।
২৮২. ইবনুল কাইয়িম, *মুখতাছারুছ ছাওয়াঈক আল-মুরসালাহ*, পৃ. ৫৭০।

গ্রহণযোগ্য ছিল। কিন্তু তিনি যেহেতু একজন রাসূল, সেহেতু তিনি যতদিন মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে এবং মুহাম্মাদ (ছা.) তাঁদের রাসূল হিসাবে পরিগণিত হ'তে থাকবেন, ততদিন পর্যন্ত তিনি এই আনুগত্যের অধিকারী থাকবেন। এখন প্রশ্ন থাকে যে, রাসূল (ছা.)-এর রিসালাতের পরিধি কতটুকু? তিনি কি নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা পর্যন্ত রাসূল? কিংবা কোন নির্দিষ্ট জাতির রাসূল? এর উত্তরে আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا 'আর আমরা তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছি।'[২৮৩] তিনি আরও বলেন, قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا 'আপনি (মুহাম্মাদ) বলুন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল।'[২৮৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا 'তিনি বরকতময় যিনি তাঁর বান্দার ওপর ফুরকান নাযিল করেছেন যেন সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।'[২৮৫] সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 'হে মানবজাতি, অবশ্যই তোমাদের নিকট রাসূল এসেছে, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য সহকারে । সুতরাং তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর, তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি অবিশ্বাস কর, তবে (মনে রেখ) নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ্র। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।'[২৮৬]

এ আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, রাসূল (ছা.) কেবল একটি জনগোষ্ঠীর জন্য নন, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আর তাঁর রিসালাত নির্দিষ্ট একটি স্থান বা সময়ের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। বিশেষ করে সর্বশেষ আয়াতটিতে সকল মানবজাতিকে আহ্বান করা হয়েছে রাসূল (ছা.)-এর প্রতি ঈমান আনার জন্য। সুতরাং কারো পক্ষে বলার সুযোগ নেই যে, রাসূল (ছা.)-এর আনুগত্য কেবল তার নিজের সমকালীন সময়ের

---

২৮৩. সূরা সাবা, আয়াত : ২৮।
২৮৪. সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ১৫৮।
২৮৫. সূরা আল-ফুরক্বান, আয়াত : ১।
২৮৬. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৭০।

জন্য প্রযোজ্য; বরং সকল যুগের এবং সকল স্থানের মানুষের ওপর এই আনুগত্য অপরিহার্য হয়ে যায়।

গ. মুহাম্মাদ (ছা.) ছিলেন সর্বশেষ রাসূল। তাঁর পর আর কোন রাসূল আসবেন না। আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল ও শেষনবী। আল্লাহ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।'[২৮৭] অর্থাৎ মুহাম্মাদ (ছা.) নবীদের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী। পূর্ববর্তী নবীগণ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আগমন করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ (ছা.)-এর পর যেহেতু আর কোন নবী আসবেন না, সুতরাং তাঁর রিসালত সকল সীমানা অতিক্রম করে সকল জাতি ও সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাসূল (ছা.) বলেন, كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون 'বনু ইসরাঈলের নবীগণ তাঁদের উম্মাহদের শাসন করতেন। যখন কোন একজন নবী মারা যেতেন, তখন অন্য একজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ'তেন। আর আমার পরে কোন নবী নেই। তবে অনেক খলীফা হবে।'[২৮৮] সুতরাং যদি রাসূল (ছা.)-এর মৃত্যুর সাথে তাঁর রিসালাতের পরিসমাপ্তি ঘটে, তবে মানুষ রিসালাতের হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হবে। সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূল (ছা.) কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য রাসূল। আর যদি তিনি সর্বযুগের নবী হন তবে এ কথা বলার আর সুযোগ থাকে না যে, তাঁর সুন্নাহ আধুনিক যুগের জন্য প্রযোজ্য নয় কিংবা এই যুগের মুসলমানরা রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ মানতে বাধ্য নয়।[২৮৯]

ঘ. কুরআনই যদি একমাত্র অপরিবর্তনীয় অহী হয়, তবে সেই অপরির্তনীয় অহি-ই রাসূল (ছা.)-এর নিঃশর্ত আনুগত্যের হুকুম দিয়েছে। সুতরাং কুরআনের হুকুমের মত সুন্নাহ্‌র হুকুম পালনও বলবৎ থাকবে। কেননা কুরআনের হুকুম কেবল মক্কা বা মদীনাবাসীদের জন্য নয়। এই হুকুম সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য। যেমন আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ

---

২৮৭. সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ৪০।
২৮৮. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৩৪৫৫; *ছহীহ মুসলিম*, হা/১৮৪২।
২৮৯. Taqi Usmani, *The Authority of Sunnah*, p. 61-65.

وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের।'[২৯০] এই আয়াতে এবং অন্যান্য বহু আয়াতে আল্লাহ্র আনুগত্যের সাথে রাসূল (ছা.)-এর আনুগত্যকে একত্রে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি আনুগত্যকে যদি স্থায়ী ধরা হয়, তবে অপরটিকে অস্থায়ী ধরে নেয়ার সুযোগ নেই। কেননা কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের মাঝে এমন বিভক্তির দেয়াল তোলার বিষয়ে সতর্ক করেছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا – أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় ও বলে যে, আমরা কতক নবীকে বিশ্বাস করি ও কতক নবীকে অবিশ্বাস করি, আর এভাবে তারা মধ্যবর্তী একটা পথ অবলম্বন করতে চায়। ওরাই হ'ল প্রকৃত কাফের। আর আমরা কাফেরদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।'[২৯১]

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাঝে কোন পার্থক্য করার সুযোগ নেই। কেননা যদি সাময়িক ও সীমিত হয় তবে উভয়ই হবে, যদি বিশ্বজনীন ও চিরস্থায়ী হয় তবে উভয়ই হবে।[২৯২] অর্থাৎ যদি হাদীছকে সীমিত সময়ের জন্য মনে করা হয়, তবে কুরআনও সীমিত সময়ের জন্য প্রমাণিত হবে।

ঙ. রাসূল (ছা.) যে আরবদের মাঝে প্রেরিত হয়েছিলেন তারা আরবী ভাষা সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখতেন। তারা কুরআনী বর্ণনার ধরন সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তারা অহী অবতরণের সময়কাল এবং প্রেক্ষাপটসমূহ সবকিছু স্বচক্ষে দেখেছেন। তারা সরাসরি রাসূল (ছা.)-এর মুখ থেকেই কুরআন শুনেছেন। তারা কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝার উপায়সমূহ খুব ভালভাবেই জানতেন। এতদসত্ত্বেও তারা কুরআন সম্পর্কে রাসূল (ছা.)-এর ব্যাখ্যা জানার মুখাপেক্ষী ছিল এবং তারা সেই ব্যাখ্যাকে শিরোধার্য হিসাবে গ্রহণ করতেন। সুতরাং এই

---

২৯০. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৫৯।
২৯১. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ১৫০-১৫১।
২৯২. আবুল আলা মওদূদী, *সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা*, বঙ্গানুবাদ : মুহাম্মাদ মূসা (ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ : ২০১২খ্রি.), পৃ. ২৮৪।

যুগের একজন সাধারণ মানুষ কীভাবে ভাবতে পারে যে, তার জন্য রাসূল (ছা.)-এর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই? অথচ সে ছাহাবীদের মত আরবী ভাষা ও তার ধরন সম্পর্কে অভিজ্ঞ নয় এবং ছাহাবীদের মত রাসূল (ছা.)-এর ওপর কুরআন নাযিল হওয়াও সে দেখে নি? সুতরাং ছাহাবীগণ যদি রাসূল (ছা.)-এর ব্যাখ্যার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন, তবে এই যুগের মানুষ আরও কত গুণ বেশী মুখাপেক্ষী হ'তে পারে, তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?[২৯৩]

চ. রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহও কুরআনের মত অপরিবর্তনীয় বিধান, যা মূলত আল্লাহরই প্রেরিত অহি। সুতরাং এতে কোন মানবীয় ইজতিহাদের সুযোগ নেই। এতে কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অধিকার কাউকে দেওয়া হয় নি। আল্লাহ বলেন, وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ 'আর আল্লাহ্র বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই।'[২৯৪] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ 'আল্লাহ্র বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন হয় না।'[২৯৫] তিনি আরও বলেন, وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ 'তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই।'[২৯৬]

ছ. রাসূল (ছা.)-এর এমন কোন সুন্নাহ নেই যা যুগের আবর্তনে পরিবর্তন করার প্রয়োজন রয়েছে; বরং স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সর্বক্ষেত্রে তা ব্যবহার্য। প্রতিটি যুগ ও সময়ে তা সমানভাবে প্রযোজ্য। আর এজন্যই 'ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান' হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিটি সুন্নাহ এমন সার্বজনীনতা রাখে যে তা কোন যুগ ও সময়ের বন্ধনে বাঁধা যায় না। যেমন রাসূল (ছা.) বলেছেন যে, أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس 'মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক প্রিয়পাত্র, যিনি মানুষের জন্য অধিক উপকারী।'[২৯৭] এখন প্রশ্ন হ'ল, রাসূল (ছা.)-এর এই নির্দেশনা প্রাচীন যুগের বলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কি তা অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করতে হবে? কখনই নয়। সুতরাং কোন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এই চিন্তাধারা পোষণ করা সম্ভব নয় যে, সুন্নাহ কেবল প্রাথমিক যুগের জন্য প্রযোজ্য।

---

২৯৩. Taqi Usmani, *The Authority of Sunnah*, p. 65-66.
২৯৪. সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ৩৪।
২৯৫. সূরা ইউনুস, আয়াত : ৬৪।
২৯৬. সূরা আল-আন'আম, আয়াত : ১১৫।
২৯৭. আত-ত্বাবারানী, *আল-মু'জামুছ ছাগীর*, হা/৮৬১। নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

সংশয়-২ : হাদীছ প্রায়শই পরস্পরবিরোধী।

হাদীছের মাঝে অসংখ্য স্ববিরোধিতা দেখা যায়। অতএব তা কখনও ইসলামী আইনের ভিত্তি হ'তে পারে না। হাদীছ অস্বীকারকারীগণ প্রায়শই এই যুক্তি প্রদান করে থাকেন। পাকিস্তানী লেখক গোলাম জিলানী বারক বলেন, 'হাদীছসমূহ এতই পরস্পরবিরোধী যে, কিয়ামত পর্যন্ত তাতে আসল তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। তবুও মোল্লারা চারিদিকে হৈ চৈ করছে এই বলে যে, হাদীছ আল্লাহ্র অহী।'[২৯৮]

পর্যালোচনা :

ক. কুরআন ও হাদীছ উভয়ই আল্লাহ্র প্রেরিত অহী হ'লে তার মধ্যে কোথাও কোন পরস্পরবিরোধিতা থাকতে পারে না এবং নেই-ও। যেমন আল্লাহ এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا 'আর যদি তা (কুরআন) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।'[২৯৯] সুতরাং মূল কিতাব তথা কুরআনে অসংগতি থাকবে না, অথচ ব্যাখ্যায় পরস্পরবিরোধিতা থাকবে–এটা অসম্ভব। এজন্য ইবনু খুযায়মাহ (৩১১হি.) বলেন, لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان ، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما 'আমি রাসূল (ছা.) হ'তে বর্ণিত এমন দু'টি হাদীছ সম্পর্কে জানি না যার সনদ ছহীহ অথচ পরস্পরবিরোধী। যার কাছে এমন কোন হাদীছ আছে, সে তা নিয়ে আসুক, আমি সামঞ্জস্যবিধান করে দেব।'[৩০০]

খ. হাদীছগ্রন্থসমূহ যারা অধ্যয়ন করেন, তারা জানেন যে, ফযীলত, আদব-আখলাক, মু'জিযাসমূহের বর্ণনা এবং জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনাসম্বলিত

---

২৯৮. গোলাম জিলানী বারক্ব, *দো ইসলাম*, পৃ. ৩৮১; গৃহীত : আব্দুর রঊফ ঝাণ্ডানগরী, *ছিয়ানাতে হাদীছ* (ঝাণ্ডানগর, নেপাল) : জামিআ' সিরাজুল উলূম, ২য় প্রকাশ : ১৯৮৭ খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২১-২২।

২৯৯. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৮২।

৩০০. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ৩৩২; ইবনুছ ছালাহ, *মুকাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ*, পৃ. ২৮৫।

হাদীছে কোন বৈপরীত্য হয় না। বাহ্যিক যে অল্পকিছু হাদীছে বৈপরীত্য দেখা যায় তা কেবল আহকামগত হাদীছে।[৩০১] আর এ বৈপরীত্যসমূহ সমন্বয়ের জন্য মুসলিম বিদ্বানগণ বহুপূর্বেই উদ্যোগ নিয়েছেন এবং এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন ইমাম শাফেঈ (২০৪হি.) রচিত اختلاف الحديث, ইবনু কুতায়বা আদ-দীনওয়ারী (২৭৪হি.) রচিত تأويل مختلف الحديث, আবূ জা'ফর আত-তাহাবী (৩২১হি.) রচিত شرح مشكل الآثار, আবূ বকর ইবনু ফাওরাক (৪০৬হি.) রচিত مشكل الحديث وبيانه, আবূ মুহাম্মাদ আল-ক্বাছারী (৬০৮হি.) রচিত شرح مشكل الحديث প্রভৃতি। এছাড়া মুহাদ্দিছগণ হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য উছূলুল হাদীছে যে সকল মূলনীতি ব্যবহার করেন, তার মধ্যেও বেশ কিছু পদ্ধতি (Device) ব্যবহার করেন শুধুমাত্র হাদীছ সমূহের আন্তবিরোধ দূরীকরণের জন্য। যেমন, الشاذ , المحفوظ, المنكر, المعروف, الناسخ, المنسوخ, المضطرب, المعلل, مختلف الحديث প্রভৃতি। সুতরাং বাহ্যিক বৈপরীত্য যদি কিছু থাকেও তবে তা নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ ব্যবস্থাও রয়েছে।

গ. প্রশ্ন হ'ল, কোন জিনিসের মধ্যে বাহ্যিকভাবে পারস্পরিক বৈপরীত্য অনুভূত হ'লেই কি তা বাতিল ও অগ্রণযোগ্য প্রমাণিত হয়? বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ঘোষিত বস্তু তথা আইন ও সংবিধান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাতে বহু ভুল ও স্ববিরোধিতা রয়েছে। এখন সে জন্য কি পুরো আইন ও সংবিধানকে বাতিল ঘোষণা করা হয়? এমনকি কুরআনেও এমন আয়াত অনেক রয়েছে যা বাহ্যত পরস্পরবিরোধী মনে হয়। হাদীছ অস্বীকারকারীগণ কি সেগুলিও বাতিলযোগ্য মনে করেন? যেমন : কুরআনের এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'আজ আমি তাদের মুখসমূহে মোহর মেরে দেব, এবং তাদের হাতসমূহ আমার সাথে কথা বলবে ও তাদের পা-সমূহ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যা তারা অর্জন করত।'[৩০২] এই আয়াতে কিয়ামতের দিন মুখের উপর মোহর

---

৩০১. আব্দুস সাত্তার হাম্মাদ, *হুজ্জিয়াতে হাদীছ* (লাহোর : দারুস সালাম, ২০০৬খ্রি.), পৃ. ৮৩.।

৩০২. সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ৬৫।

মেরে দেয়ার কথা এসেছে। অথচ অন্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের যবান তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। আল্লাহ বলেন, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 'যেদিন তাদের জিহ্বাগুলো, তাদের হাতগুলো ও তাদের পাগুলো তারা যা করত, সে ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে।'[৩০৩] অর্থাৎ এই দুই আয়াত বাহ্যত পরস্পরবিরোধী। এক্ষণে এর জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দাঁড় না করিয়ে চোখ বন্ধ করে আয়াতটি কি অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা যাবে? অবশ্যই নয়। মূলত মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধির কারণে কুরআন ও হাদীছের মধ্যে অনেক সময় এমন বৈপরীত্য অনুভূত হ'তে পারে। আর এই বৈপরীত্য দূরীকরণে মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ কিছু নীতিমালা অবলম্বন করে থাকেন। যেমন :

(১) কোন কোন বৈপরীত্য সাধারণ ব্যাখ্যার সাহায্যে দূর করা সম্ভব। যেমন : একটি হাদীছে এসেছে যে, لا عدوى ولا طيرة 'কোন রোগ সংক্রমণ নেই, কোন শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই।'[৩০৪] অপর হাদীছে এসেছে, فر من المجذوم فرارك من الأسد 'তুমি কুষ্ঠরোগী থেকে পলায়ন কর, যেভাবে সিংহ দেখলে পলায়ন করে থাক।'[৩০৫] অন্য হাদীছে এসেছে, لا توردوا الممرض على المصح 'রোগাক্রান্ত উট নীরোগ উটের সাথে মিশ্রিত করবে না।'[৩০৬] হাদীছগুলি বাহ্যত পরস্পরবিরোধী মনে হয়। এগুলো মধ্যে সমন্বয়ের জন্য বিদ্বানগণ বলেন, রোগসমূহ নিজ থেকে সংক্রামক নয়, কিন্তু আল্লাহ কোন সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ ব্যক্তির সাথে মেলামেশাকে রোগটি সংক্রামণের কারণ বানিয়ে দেন। এছাড়া আরও বিভিন্ন কারণে রোগটি হ'তে পারে। প্রথম হাদীছে রাসূল (ছা.) জাহিলী যুগের এই ধারণাকে নাকচ করে দিয়েছেন যে, রোগটি প্রকৃতিগতভাবে সংক্রামক। এজন্য তিনি অন্যত্র বলেছিলেন, فمن أعدى الأول 'তাহ'লে প্রথমটির (উট) মধ্যে কীভাবে এ রোগ সংক্রমিত হ'ল।'[৩০৭] আর দ্বিতীয় হাদীছে রাসূল (ছা.) বলেছেন যে, আল্লাহ মেলামেশাকে রোগের কারণ

৩০৩. সূরা আন-নূর, আয়াত : ২৪।
৩০৪. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৫৭৭২, ৫৭৭৬।
৩০৫. *মুসনাদ আহমাদ*, হা/৯৭২২, হাদীছ ছহীহ।
৩০৬. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৫৭৭৪।
৩০৭. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৫৭৭০।

বানিয়েছেন। সুতরাং ঐ ক্ষতি থেকে বেঁচে থাক যা অন্যের রোগের কারণে সৃষ্টি হয়।'[৩০৮]

(২) কখনও দু'টি পরস্পরবিরোধী হাদীছের মধ্যে একটির সনদ শক্তিশালী হয়, অপরটির দুর্বল হয়। সেক্ষেত্রে যঈফ হাদীছটি আমল অযোগ্য হয়ে যায়। তখন আর কোন বৈপরীত্য থাকে না।

(৩) কখনও দু'টি বাহ্যত বিরোধী মনে হ'লেও শরী'আতে দু'টি হাদীছের উপরই আমল করা বৈধ। জনগণের সুবিধার্থে রাসূল (ছা.) দু'টি আমলকে জায়েয করেছেন। যেমন : একটি হাদীছে এসেছে যে, রাসূল (ছা.) স্ত্রীমিলনের পর ছালাতের ন্যায় অযূ করতেন।[৩০৯] কিন্তু অপর হাদীছে এসেছে রাসূল (ছা.) পানিতে হাত না লাগিয়েই ঘুমিয়ে পড়তেন।[৩১০]

(৪) কখনও এমন বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায় যা ক্ষেত্রবিশেষে দু'টিই আমলযোগ্য। যেমন : একবার রাসূল (ছা.) এক কওমের আবর্জনার স্থলে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন।[৩১১] অথচ অন্য হাদীছে আয়েশা (রা.) বলেন যে, রাসূল (ছা.) কখনও দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন নি।[৩১২] এই দু'টি হাদীছের মাঝে সমন্বয় এভাবে করা হয় যে, রাসূল (ছা.) নিজ গৃহে কখনও দাঁড়িয়ে প্রসাব করতেন না যেমনটি আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অপর হাদীছে রাসূল (ছা.) এমন একটি স্থানে ছিলেন যেখানে বসে প্রস্রাব করার অবস্থা ছিল না, বরং তাতে অপবিত্রতা লেগে যেতে পারত অথবা রাসূল (ছা.)-এর অন্য কোন সমস্যা ছিল, যে কারণে তিনি বসতে পারেননি। এমন অবস্থা কারো হ'লে সে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে পারে।

(৫) যদি বিপরীতার্থক দু'টি হাদীছের মধ্যে কোনটি আগের এবং কোনটি পরের হুকুম তা জানা যায়, তবে প্রথম হুকুমটি মানসূখ বা রহিত হিসাবে ধর্তব্য হবে এবং দ্বিতীয়টির ওপর আমল করতে হবে। তিনটি দিক থেকে হাদীছ মানসূখ বা রহিতকরণ সাব্যস্ত হয়। (ক) রাসূল (ছা.) নিজেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেবেন। যেমন তিনি কবর যিয়ারত সম্পর্কে বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে প্রথমে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমাদেরকে যিয়ারতের অনুমতি দিচ্ছি। কেননা এখেকে আখেরাতের কথা

---

৩০৮. ইবনুছ ছালাহ, *মুকাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ*, পৃ. ২৮৪-২৮৫।
৩০৯. *ছহীহুল বুখারী*, হা/২৮৮।
৩১০. *সুনান ইবনু মাজাহ*, হা/৫৮১, সনদ ছহীহ।
৩১১. *ছহীহুল বুখারী*, হা/২৪৭১।
৩১২. *সুনানুত তিরমিযী*, হা/১২, সনদ ছহীহ।

স্মরণ হয়।[৩১৩] (খ) ছাহাবী নিজেই স্পষ্ট করে দেবেন। যেমন জাবির (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছা.)-এর শেষ আমল ছিল তিনি আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর অযূ করতেন না।[৩১৪] (গ) ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে অবগত হ'তে পারা। যেমন : শাদ্দাদ ইবনু আওস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছা.) বলেছেন, শিঙ্গা যে নেয় এবং শিঙ্গা যে করায় উভয়ের ছিয়াম নষ্ট হয়ে যায়।[৩১৫] কিন্তু ইবনু আব্বাস (রা.) অপর হাদীছে বলেন যে, রাসূল (ছা.) ইহরাম অবস্থায় এবং ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন।[৩১৬] এই হাদীছে ইবনু আব্বাস (রা.) যেহেতু বিদায় হজ্জে রাসূল (ছা.)-এর সাথে ছিলেন এবং শাদ্দাদ ইবনু আওস (রা.)-এর বর্ণনা মক্কা বিজয়ের সময়কালের প্রমাণিত হয়, সেহেতু ইবনু আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনাটি নাসিখ বা রহিতকারী এবং শাদ্দাদ ইবনু আওস (রা.)-এর বর্ণনাটি মানসূখ বা রহিত হিসাবে গণ্য হবে।

(৬) যদি নাসখের বিষয়টিও পরিষ্কার না বোঝা যায়, সেক্ষেত্রে যে কোন একটি হুকুমকে 'তারজীহ' বা অগ্রাধিকারদানের কিছু নীতি রয়েছে। যেমন : (ক) সনদের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার। (খ) মতন বা বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে অগ্রাধিকার (গ) باعتبار المدلول বা মর্মার্থের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার। (ঘ) باعتبار الأمور الخارجية বা পারিপার্শ্বিকতা ও প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার। মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ অগ্রাধিকার প্রদানের এরূপ প্রায় ৫০টি সম্ভাব্য দিক উল্লেখ করেছেন।

(৭) ব্যাখ্যা, সমন্বয়করণ, রহিতকরণ ও অগ্রাধিকার প্রদানের এই নীতিগুলো অবলম্বনের পরও যদি কোন হাদীছদ্বয়ের মাঝে বৈপরীত্য দূর না করা যায়, সেক্ষেত্রে উভয় হাদীছের ওপর আমল মুলতবী রাখতে হবে, যতক্ষণ না তার কোন ব্যাখ্যা না জানা যায়। আর এটি ঘটার সম্ভাবনা অতি বিরল।[৩১৭]

ঘ. ইসলামী শরী'আতের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, শারঈ বিধানগুলো নয় একই সাথে মানুষের জন্য আরোপ করা হয় নি; বরং ধীরে ধীরে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে এ সকল বিধান নাযিল হয়েছে এবং পূর্ণতা

---

৩১৩. *ছহীহ মুসলিম*, হা/৯৭৬-৯৭৭।
৩১৪. *সুনান আবী দাঊদ*, হা/১৯২, সনদ ছহীহ।
৩১৫. *সুনান আবী দাঊদ*, হা/২৩৬৯, সনদ ছহীহ।
৩১৬. *ছহীহুল বুখারী*, হা/১৯৩৮-১৯৩৯।
৩১৭. দ্র. আশ-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহূল*, ২য় খণ্ড, ২৫৭-২৭৩; ড. লুৎফী ইবনু মুহাম্মাদ আয-যুগাইর, *আত-তা'আরুয ফিল হাদীছ*, পৃ. ৩১৯-৩৮২।

লাভ করেছে। আর ধারাবাহিকভাবে যার গঠনকার্য সম্পন্ন হয়, তার ওপর কখনও বৈপরীত্য বা স্ববিরোধিতার হুকুম প্রদান করা যায় না।

ঙ. বিপরীতমুখী হাদীছসমূহের পরিমাণও এত স্বল্প যে পরিসংখ্যানে তা এক হাজার হাদীছের মধ্যে একটি হ'তে পারে। সুতরাং কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এই অতি স্বল্প ব্যতিক্রমের কারণে পুরো হাদীছের বিশাল ভাণ্ডারকে অস্বীকার করা কি যুক্তিসঙ্গত হ'তে পারে? তাছাড়া বিপরীতমুখী হাদীছগুলোর কারণে বৈপরীত্যহীন হাদীছ পরিত্যাগ করার দাবীও নেহায়েত মূর্খতার পরিচায়ক।

সংশয়-৩ : হাদীছ প্রায়শই বিবেক ও যুক্তিবিরোধী।

হাদীছ অস্বীকারকারীদের দাবী হ'ল, অনেক হাদীছ রয়েছে স্বাভাবিক মানবীয় বিবেক-বুদ্ধির বিরোধী। ইসলাম বিবেকসম্মত ধর্ম। অতএব বিবেকবিরুদ্ধ এ সকল হাদীছ গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে না। হাদীছের প্রতি সন্দেহবাদী কিছু ব্যক্তিও অনুরূপ ধারণা করেন যে, হাদীছের সনদ ছহীহ হ'লেও মতন যদি বিবেকবিরুদ্ধ হয়, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং সকল হাদীছকে আক্বল দিয়ে যাচাই করতে হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমেরও অনেক হাদীছ অস্বীকার করেন। তারা রাসূল (ছা.)-এর মু'জিযাসমূহ, তাঁর যাদুগ্রস্থ হওয়া, কবরের আযাব, শাফা'আতসহ বহু গায়েবী বিষয় অস্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, نأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل 'আমরা কেবল কিতাব থেকে এবং আক্বল বা বিবেক থেকে দলীল গ্রহণ করব।'[৩১৮] অতীতে মু'তাযিলাগণ এই যুক্তি পেশ করে বিশেষত অদৃশ্যের জ্ঞান বিষয়ক হাদীছসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং বর্তমানেও হাদীছ অস্বীকারকারীদের অধিকাংশই এই যুক্তি অবলম্বন করেন। মিসরীয় বিদ্বান মুহাম্মাদ আল-গায্যালী (১৯১৭-১৯৯৬খ্রি.) তাঁর প্রসিদ্ধ 'ফিকহুস সীরাহ' গ্রন্থের শুরুতে 'কিতাবুল ফিতান' সম্পর্কিত সকল হাদীছ অস্বীকার করেছেন। তিনি ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, কবরের আযাবও তিনি স্বীকার করেন না; অথচ ছহীহ বুখারীতে তা বর্ণিত হয়েছে! তাঁর বক্তব্য হ'ল, وأعرضت عن أحاديث أخرى توصف بالصحة؛ لأنّها- في فهمي لدين الله، وسياسة

---

৩১৮. মাহমূদ আবূ রাইয়াহ, *আযওয়াউন আলাস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ*, পৃ. ৩৫১।

الدعوة– لم تنسجم مع السياق العام 'এছাড়া আমি অন্যান্য কিছু হাদীছও পরিত্যাগ করেছি, যা কিনা ছহীহ বলে কথিত! কেননা আল্লাহ্‌র দ্বীন এবং দাওয়াতী কৌশলসমূহ সম্পর্কে এ সকল হাদীছ আমার বুঝ মোতাবেক সাধারণ পারিপার্শ্বিকতার সাথে মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।' [৩১৯]

পর্যালোচনা :

প্রথমেই জানা প্রয়োজন যে, রাসূল (ছা.) হ'তে বর্ণিত হাদীছকে নিরংকুশভাবে আক্বল তথা বুদ্ধি-বিবেক দিয়ে বিচার করার নীতি প্রাথমিক যুগের বিদ'আতী দলগুলো কর্তৃক উদ্ভাবিত। এই নীতি সর্বযুগে নবী-রাসূলদেরকে অস্বীকারকারী কাফের ও মুশরিকদের অনুসৃত নীতি। ইবনুল কাইয়িম (৭৫২হি.) বলেন, معارضة أمر الرسل أو خبرهم بالمعقولات إنما هي طريقة الكفار، .... ومن تأمل معارضة المشركين للرسل بالعقول وجدها أقوى من معارضة الجهمية 'রাসূলগণ এবং তাদের প্রদত্ত সংবাদসমূহকে বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা প্রতিরোধের চেষ্টা, এটি কাফেরদের অনুসৃত পথ। যদি কেউ রাসূলদের বিরোধিতায় মুশরিকদের বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা করে, তবে তা জাহমিয়া (নব্য বুদ্ধিবাদী দল)-দের থেকে অধিকতর শক্তিশালী পাবে।'[৩২০] ইবনু আবীল ইয (৭৯২হি.) বলেন, بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته، وما ظنه معقولا 'বরং প্রতিটি বিদ'আতী দল শরী'আতের নছসমূহ (কুরআন ও হাদীছ)- কে তাদের বিদ'আতী পথ ও মতের উপর স্থাপন করে, যাকে তারা বিবেকসম্মত ধারণা করে (অতঃপর যা বিবেকসম্মত মনে হয় তা গ্রহণ করে, আর যা বিবেকবিরুদ্ধ মনে হয়, তা বর্জন

---

৩১৯. মুহাম্মাদ আল-গায্‌যালী, *ফিকহুস সীরাহ* (দামিশক : দারুল কলম, ১৪২৭হি.), পৃ. ১২-১৪। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে হাদীছ অস্বীকারকারীদের মত আধুনিক যুগে কিছুসংখ্যক ইসলামপন্থী বিদ্বানও হাদীছকে রেওয়ায়েত দ্বারা যাচাইয়ের পরিবর্তে আক্বল ব্যবহারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তবে এক্ষেত্রে তাঁরা 'দিরায়াত', 'তাফাক্কুহ' 'খাছ যওক' বা বিশেষ রুচিবোধ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করলেও তা আক্বলকেই নির্দেশ করে। আবুল আ'লা মওদূদী (১৯৭৯খ্রি.), আমীন আহসান ইছলাহী (১৯৯৭খ্রি.) প্রমুখের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। দ্র. আবুল আ'লা মওদূদী, *তাফহীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১, আমীন আহসান ইছলাহী, *মাবাদী তাদাব্বুরে হাদীছ*, পৃ. ৯১-৯২, ৯৯; মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী, *হুজ্জিয়াতে হাদীছ*, পৃ. ১৪৯-১৫২)।

৩২০. ইবনুল কাইয়িম, *মুখতাছারুছ ছাওয়াঈক আল-মুরসালাহ*, পৃ. ১২৪।

করে)।[৩২১] অনুরূপভাবে আশ-শাত্বিবী (৭৯০হি.)-ও উল্লেখ করেছেন, فإن محصول مذهبهم تحكيم عقول الرجال دون الشرع، وهو أصل من الأصول التي بنى عليها أهل الابتداع في الدين، بحيث إن الشرع إن وافق آراءهم قبلوه، وإلا ردوه 'তাদের মতবাদের সারকথা হ'ল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে শরী'আতের ওপর স্থান দেয়া। এটাই হ'ল বিদ'আতীদের অন্যতম মূলনীতি যা তারা দ্বীনের মধ্যে প্রয়োগ করে। যদি শরী'আত তাদের মতের সাথে মিলে যায়, তবে গ্রহণ করে আর যদি না মিলে তবে বর্জন করে।'[৩২২]

সুতরাং বিদ্বানদের এ সকল বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীছ গ্রহণ ও বর্জনে আক্বল বা বুদ্ধিবৃত্তিকে চূড়ান্ত মানদণ্ডে পরিণত করা যুগে যুগে বিদ'আতী দলসমূহের অনুসৃত নীতি। সুতরাং বর্তমান যুগেও যারা এই দাবী তুলেছেন, তারা কোন না কোন সূত্রে এই দলসমূহের উত্তরসূরীর ভূমিকা পালন করছেন। নিম্নে তাদের যুক্তিসমূহ খণ্ডন করা হ'ল।

ক. নিঃসন্দেহে ইসলাম হ'ল ফিতরাতী বা প্রাকৃতিক নিয়ম সম্মত ধর্ম, যার সকল আইন ও বিধান মানুষের স্বাভাবিক ও সুস্থ বুদ্ধির অনুকূলে। যে দ্বীনের নিয়ম-কানূনসমূহ বিবেকবিরোধী, তা কখনও প্রাকৃতিক ধর্ম নয় বরং মনগড়া, কপোলকল্পিত ধর্ম। ফলে কেবল ইসলামের বিধানসমূহই নয়, বরং তার সকল চিন্তাধারাই বিবেকসম্মত। শরী'আতের সাথে সাথে ইসলাম তাই বুদ্ধিবৃত্তিকেও গুরুত্ব দিয়েছে। পবিত্র কুরআনের বারবার মানুষকে চিন্তা-গবেষণার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কখনও কখনও মানুষের বিবেক এবং অহীর মাঝে বাহ্যিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এর পেছনে যে কারণ তা হ'ল, আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান ও তথ্য লাভের জন্য যে সকল মাধ্যম দান করেছেন, তার প্রতিটির নিজস্ব একটি গণ্ডি রয়েছে এবং এই গণ্ডির মধ্যকার বিষয়বস্তুই কেবল সে ধারণ করতে পারে। ফলে তার গণ্ডির বাইরে এই মাধ্যমগুলো আর কার্যকর থাকে না। এই মাধ্যমগুলোর প্রথমটি হ'ল, পঞ্চন্দ্রেয় (The Five Senses)। এই জ্ঞান কম-বেশী পৃথিবীর সকল প্রাণীকূলকে আল্লাহ দান করেছেন, যা দ্বারা দৈনন্দিন সকল কর্ম সম্পাদিত হয়। কিন্তু এখানেই আল্লাহ জ্ঞানের সীমানা নির্ধারণ করে

---

৩২১. ইবনু আবিল ইয, *শারহুল আক্বীদাহ আত-তাহাভিয়াহ,* পৃ. ৩৫৪।
৩২২. আশ-শাত্বিবী, *আল-ই'তিছাম,* ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭২।

দেননি; বরং দ্বিতীয় পর্যায়ে পঞ্চেন্দ্রেয় বহির্ভূত অপর এক মাধ্যম দান করেছেন, আর তা হ'ল আক্বল বা বুদ্ধিবৃত্তি (Intellect)। একে ষষ্ঠেন্দ্রেয়ও বলা হয়। এই পর্যায়ের জ্ঞানই মানুষকে অন্যান্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা করে দিয়েছে। আর এর মাধ্যমেই সে পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে পরিভ্রমণ করতে পারে। কিন্তু এই আক্বলেরও একটি নির্দিষ্ট গণ্ডি রয়েছে, যার মধ্যকার সবকিছুকে সে আয়ত্ত্ব করতে পারে। কিন্তু তার বাইরে সে আর কর্মক্ষম থাকে না।[৩২৩] কিন্তু এখানেও আল্লাহ জ্ঞানের সীমানা নির্ধারণ করে দেননি। বরং এই তৃতীয় পর্যায়ের জন্য আল্লাহ জ্ঞানলাভের অপর একটি মাধ্যম দান করেছেন। আর তা হ'ল অহী (Revelation)। আর এটি মানুষের জন্য জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমানা হিসাবে পরিগণিত। আর এটিই হ'ল সেই স্থান, যেখানে এসে একজন মুমিন ব্যক্তি এবং একজন ঈমানহীন ব্যক্তির মাঝে পার্থক্যরেখা সূচিত হয়। একজন মুমিনের ঈমানের স্বীকৃতি বাস্তবায়িত হয় অহীর জ্ঞানের নিকট নিঃশর্ত আত্মসমার্পণের মাধ্যমে।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবন করা প্রয়োজন তা হ'ল, প্রথমত, আক্বলের সাথে অহীর জ্ঞান কখনই সমতুল্য নয়। কেননা একটি হ'ল সসীম জ্ঞান, অপরটি হ'ল চূড়ান্ত জ্ঞান। যেখানে আক্বল বা বুদ্ধিবৃত্তির সীমানা শেষ হয়ে যায়, ঠিক সেখান থেকে অহীর সীমানা শুরু হয়। সুতরাং যে পর্যায়ে এসে আমরা অহীর জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ি সেখানে বুদ্ধিবৃত্তির কোন অনুপ্রবেশ নেই এবং তা ব্যবহার করতে চাওয়াই হ'ল নির্বুদ্ধিতার কাজ। যদিও এর অর্থ

---

৩২৩. পবিত্র কুরআনের মানবীয় জ্ঞানের এই ধারাবাহিকতা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩৬)। এখানে জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে– শ্রবণ (বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রদত্ত সংবাদ), দর্শন (অভিজ্ঞতা) ও অন্তঃকরণ (বুদ্ধিবৃত্তি)। এই তিনটি উৎসই মূলত মানবীয় জ্ঞান তৈরী করে। আস-সিবাঈ (১৯৫৬খ্রি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, ইসলামে তিনটি উপায়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়– (১) বিশ্বস্ত সূত্রের সংবাদ, যা সংবাদদাতার সত্যবাদিতার কারণে শ্রোতা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে। যেমন আল্লাহ্র কিতাব এবং রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ। (২) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, যার যথার্থতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়েছে। (৩) বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান, যে বিষয়ে কোন বিশ্বস্ত সূত্রের সংবাদও নেই কিংবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও নেই। দ্র. আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ৩৫।

নয় যে, এক্ষেত্রে আক্বল ব্যবহার করা অর্থহীন। কিন্তু তা হ'তে হবে তার নিজস্ব গণ্ডি ও সীমারেখার মধ্যে।

দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসহ যে সকল আক্বলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান রয়েছে, তা সীমাহীন নয়, বরং তা 'যান্নী' বা প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তিশীল, যা ভুল বা সঠিক উভয়ই হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং অহীর অকাট্য এবং চূড়ান্ত জ্ঞানকে পরীক্ষা করার জন্য প্রবল ধারণাভিত্তিক জ্ঞানকে কোনভাবেই মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। কেননা আক্বল বা বৃদ্ধিবৃত্তির জন্য এমন কোন ধরাবাঁধা নীতি নেই, যার সাহায্যে সত্য বা মিথ্যা চূড়ান্তভাবে পার্থক্য করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, আক্বল এবং অহী উভয়ই মানুষের হেদায়েত বা পথনির্দেশ লাভের জন্য দু'টি মাধ্যম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ই পরস্পরের সহযোগী। অতএব উভয়ের মাঝে যদি কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তবে তা নিশ্চিতভাবে মৌলিক দ্বন্দ্ব নয়, বরং বাহ্যিক। এজন্য প্রথমে আক্বল এবং অহীর মাঝে সমন্বয়ের চেষ্টা চালাতে হবে। কিন্তু যদি সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, তবে একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। অর্থাৎ সেটি হ'ল অহী। কেননা আক্বল হ'ল 'যান্নী' বা প্রবল ধারণানির্ভর জ্ঞান এবং অহী হ'ল 'কাত্বঈ' বা অকাট্য জ্ঞান।[৩২৪]

আক্বল এবং অহী'র পার্থক্য সম্পর্কে এই মৌলিক বিষয়টি মাথায় রেখেই ইসলামী শরী'আতের বিধি-বিধানসমূহকে যাচাই করতে হবে। কেননা যে সকল ছহীহ হাদীছের সমালোচনা করা হয়েছে, তার অধিকাংশই এই কারণে যে, হাদীছ অস্বীকারকারীদের নিকট তা বাহ্যিকভাবে আক্বল বা আধুনিক বিজ্ঞানের খেলাফ প্রতীয়মান হয়। যদিও বাস্তবতায় তা মূলত অগভীর চিন্তাধারা এবং আক্বলের অপব্যবহার করারই ফলশ্রুতি। তারা এক্ষেত্রে মৌলিক যে ভুলটি করেন তা হ'ল, অহী এবং আক্বলকে তাঁরা সমমর্যাদার স্থানে বসিয়ে থাকেন কিংবা অহীর জ্ঞানের ওপর আক্বলকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

খ. মুহাদ্দিছগণ হাদীছের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য আক্বলের সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছেন, তবে তা যথারীতি নিজস্ব সীমারেখার মধ্যে। আব্দুর রহমান আল-

---

৩২৪. ড. মুহাম্মাদ আকরাম ওয়ারাক, *মুতুনে হাদীছ পর জাদীদ যেহেন কী ইশকালাত* (গুজরানওয়ালা : শরী'আহ একাডেমী, ২য় প্রকাশ : ২০১৬খ্রি.), পৃ. ৪০৯-৪১১। এ বিষয়ে বিশেষভাবে পাঠ্য হ'ল ইবনু তায়মিয়া (৭২৮হি.) রচিত গ্রন্থ درء تعارض العقل والنقل যা ১০ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

মু‘আল্লিমী (১৯৬৬খ্রি.) বলেন, হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাইয়ের সময় চারটি স্থানে মুহাদ্দিছগণ আক্বলের ব্যবহার করেছেন।[৩২৫] যথা :

(১) হাদীছটি শ্রবণ বা অবগত হওয়ার সময়। এসময় তারা হাদীছ বর্ণনাকারীর ভৌগলিক অবস্থান, বয়স, বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা সবকিছু যাচাই করেন অর্থাৎ তিনি সঠিকভাবে হাদীছটি শ্রবণ করেছেন কিনা তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার হাদীছ গ্রহণ করা হয় না। ‘মুরসাল’ ও ‘তাদলীস’ এক্ষেত্রে বড় দু’টি উদাহরণ। অর্থাৎ বর্ণনাকারী যত বড় পণ্ডিত ও নির্ভরযোগ্যই হন না কেন, যদি সঠিকভাবে শ্রবণ করেছেন বলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত না হয়, তবে তার হাদীছ অগ্রহণযোগ্য হয়।

(২) হাদীছটি বর্ণনাকালে। এই পর্যায়ে তারা বর্ণনাকারী কয়েকটি গুণ অনুসন্ধান করেন। যেমন : (ক) মুসলিম হওয়া। (খ) বয়ঃপ্রাপ্তি। (গ) বুদ্ধিসম্পন্নতা। (গ) সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা। (ঘ) মেধা বা সংরক্ষণ ক্ষমতা প্রভৃতি।

(৩) বর্ণনাকারীদের ওপর হুকুম আরোপ করার সময়। এই পর্যায়ে তারা বর্ণনাকারীদের বর্ণনাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক তুলনা করেন। যদি এমন হয় যে, কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনা অপর বর্ণনাকারীদের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তারা ঐ একক বর্ণনাকারীকে ‘মুনকার’, ‘মুযতারিব’ হিসাবে চিহ্নিত করেন। এভাবে তাঁরা বর্ণনাকারীদের বর্ণিত প্রতিটি হাদীছ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন এবং বৈপরীত্য অনুসন্ধান করেন।

(৪) হাদীছের ওপর শুদ্ধাশুদ্ধির হুকুম আরোপ করার সময়। এ পর্যায়ে তারা দেখেন যে, হাদীছের বিষয়বস্তু স্বতঃসিদ্ধ বিবেকের বিরোধী কি না। কেননা বিবেকের বিরোধিতা হাদীছ জাল হওয়ার অন্যতম নিদর্শন।[৩২৬] যেমন ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (৮৫২হি.) হাদীছ জাল হওয়ার আলামতসমূহ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, أن يخالف الحديث العقل ولا يقبل تأويلا ‘হাদীছটি এমন বিবেকবিরোধী হয়, যা কোন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।’[৩২৭]

---

৩২৫. আব্দুর রহমান আল-মু‘আল্লিমী, *আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ*, পৃ. ৬।
৩২৬. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ১৭।
৩২৭. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, *আন-নুকাত আলা কিতাবি ইবনিছ ছালাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।

অর্থাৎ মুহাদ্দিছগণ হাদীছ যাচাইয়ের সময় বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করেন না– এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে হাদীছ অস্বীকারকারীদের সাথে মুহাদ্দিছদের নীতির পার্থক্য হ'ল তারা আক্বল ব্যবহারের ক্ষেত্রে কখনও সীমা অতিক্রম করেন না বা স্বেচ্ছাচারিতামূলক সারলীকরণ করেন না। বরং কোন হাদীছ বিবেকবিরোধী মনে হ'লে বর্ণনাকারীদের বিশ্বাসযোগ্যতা পুণঃনিরীক্ষণ করেন। অতঃপর যদি সবদিক থেকে হাদীছটি ত্রুটিমুক্ত পান, তবে আক্বলকে নাক্বল তথা অহীর জ্ঞানের অনুবর্তী করে দেন এবং হাদীছটির পক্ষে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর মাধ্যমে সমন্বয় করেন। কেননা অহী হ'ল অকাট্য জ্ঞান এবং আক্বল হ'ল প্রবল ধারণানির্ভর অনিশ্চিত জ্ঞান, যা কখনও অহীর ওপর প্রাধান্য পেতে পারে না। যেমন আশ-শাত্বিবী (৭৯০হি.) বলেন, إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل 'যদি শারঈ বিধানে নাক্বল (অহী) এবং আক্বল (বুদ্ধিবৃত্তি) পরস্পরকে শক্তিশালী করে, তবুও শর্ত হ'ল নক্বলকে অগ্রগণ্য করতে হবে। ফলে তা হবে অনুসরণীয় এবং আক্বলকে পশ্চাদগামী করা হবে এবং তা হবে অনুসারী। আর বিতর্কের ক্ষেত্রে আক্বলকে উন্মুক্তভাবে ব্যবহার করা যাবে না, নক্বল যতটুকু শিথিলতা দিয়েছে ততটুকু ব্যতিরিকে।'[৩২৮] অর্থাৎ আক্বলকে সর্বদা ব্যবহার করতে হবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে রেখে।

গ. মুহাদ্দিছরা হাদীছের শুদ্ধশুদ্ধি যাচাইয়ে আক্বলের চেয়ে বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ত তার ওপর অধিকতর নির্ভর করেছেন কেন?- এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় মানুষের আক্বল পূর্ণাঙ্গ নয়। আক্বলের ব্যবহারও বহুমুখী এবং প্রাসঙ্গিকতাভেদে পরিবর্তনশীল। ফলে যে কোন তথ্যের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাইয়ে মানুষের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির চেয়ে মুহাদ্দিছদের নিকট তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য কোন ঘটনার সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষী যা বর্ণনা করেন তাকে তারা সর্বাধিক প্রাধান্য দেন। জ্ঞান সংরক্ষণে এটিই তাদের নিকট সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি। একই দৃষ্টান্ত দেখা যায় পৃথিবীর সকল আদালত ও বিচারব্যবস্থার ক্ষেত্রে। এ সকল আদালতসমূহও প্রধানত সত্য সাক্ষ্যের ওপর নির্ভরশীল। আশ-শাত্বিবী (৭৯০হি.) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ الاعتصام

৩২৮. আশ-শাত্বিবী, *আল-মুওয়াফাক্বাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।

গ্রন্থের ১০ম অধ্যায়ে আক্বলের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের আক্বল বা বুদ্ধিবৃত্তির জন্য একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যা সে অতিক্রম করতে পারে না। সে তার প্রতিটি কাংখিত বস্তুকে নিজের বোধগম্যতার অধীনস্ত করতে পারে না। যদি তা করতে পারত, তবে অতীত ও বর্তমানে কি ঘটছে না ঘটছে সবকিছুই বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি মহান প্রভুরই সমকক্ষ হয়ে যেত। আর যদি সে সব বুঝেই ফেলত, তবে কীভাবে বুঝত? কেননা আল্লাহ্র জ্ঞানের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, কিন্তু মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। যা সসীম তা কখনও অসীমের সমকক্ষ হ'তে পারে না।'[৩২৯]

দ্বিতীয়ত, আক্বল দ্বারা হাদীছ যাচাই করতে গেলে অবশ্যই তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হ'ত। যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ফিকহী গ্রন্থসমূহ। এসব গ্রন্থের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ইজতিহাদী বিধান নিয়ে বিদ্বানদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ আক্বলী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রায় প্রদান করেছেন। হাদীছের ক্ষেত্রেও যদি এমন নিজস্ব বিবেক অনুযায়ী শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাইয়ের সুযোগ দেয়া হ'ত, তবে হাদীছ শাস্ত্রের অস্তিত্বই বিপন্ন হওয়ার সম্মুখীন হ'ত। এজন্য তাঁরা এ সকল যুক্তিভিত্তিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকার জন্য হাদীছ যাচাইয়ের সময় অত্যন্ত সচেতনভাবে আক্বলের ব্যবহারকে সর্বব্যাপী হ'তে দেন নি, বরং তা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে রেখেছেন।

আস-সিবাঈ (১৯৫৬খ্রি.) এই বিতর্কের বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেছেন। তিনি হাদীছ অস্বীকারকারীদের নিকট প্রশ্ন রেখেছেন যে, হাদীছ যাচাইয়ে তারা যে আক্বলকে প্রাধান্য দিতে বলছেন, সেটি কোন আক্বল?

দার্শনিকদের আক্বল? তাদের মধ্যে অসংখ্য মতভেদ রয়েছে। পূর্ববর্তীদের সাথে পরবর্তীদের মিল নেই।

সাহিত্যিকদের আক্বল? তারা তো কেবল গল্প-কাহিনী নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

---

৩২৯. أن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه لا تتعداه، و لم يجعل لها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب. ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكون، إذ لو كان كيف كان يكون، فمعلومات الله لا تتناهى. ومعلومات العبد متناهية. والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى. -আশ-শাত্বিবী, *আল-ই'তিছাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩১।

চিকিৎসক, প্রকৌশলী কিংবা গণিতজ্ঞদের আক্বল? তাদের সাথে শারঈ বিধানের সম্পর্ক কী?

মুহাদ্দিছদের আক্বল? তার ওপর তো যুক্তিবাদীরা বিশ্বাস করে না, বরং তা অগভীর এবং সরল আবেগ বলে তাচ্ছিল্য করেন।

ফক্বীহদের আক্বল? তাদের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য মাযহাব। আর তাদের বুদ্ধিবৃত্তিও তো যুক্তিবাদীদের নিকট মুহাদ্দিছদের মতই অগভীর!

ধর্মহীনদের আক্বল? তারাও অসংখ্য দলে বিভক্ত। কারো সাথে কারো চিন্তাধারার মিল নেই।

এখন যদি তারা বলেন যে, আমরা মুমিনদের আক্বলের ওপর আস্থা রাখি যারা এক আল্লাহ এবং ইসলামের প্রতি বিশ্বাস রাখেন। তবে প্রশ্ন আসবে, কোন মাযহাবের মুমিনদের আক্বল উদ্দেশ্য? যদি বলা হয় সুন্নীগণ, তবে শী'আ' বা মু'তাযিলারা এতে একমত হবে না। যদি বলা হয় শীআ'গণ, তবে সুন্নীরা তাতে একমত হবে না। যদি বলা হয় মু'তাযিলাগণ, তবে কোন অধিকাংশ মুসলমান তাতে একমত হবে না। সুতরাং কোন আক্বলকে তারা মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করবেন?

অতএব সারকথা হ'ল, আক্বল ব্যবহারে মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহদের নীতিই গ্রহণযোগ্য। কেননা তারা হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাইয়ে নির্দিষ্ট সীমারেখা মেনে আক্বলের ব্যবহার করেছেন, যতটুকু শরী'আহ অনুমতি দেয় এবং আত্মপ্রতারিত যুক্তিবাদীরা ব্যতীত অন্যান্য বিজ্ঞ বিদ্বানদের গৃহীত নীতি অনুমোদন করে।[৩৩০]

ঘ. মুহাদ্দিছগণ যে সকল হাদীছ ছহীহ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন, তাতে এমন কোন হাদীছ নেই যা সুস্থ বিবেকের বিরোধী। তবে কোন কোন হাদীছ হয়ত ব্যাখ্যা না জানার কারণে আশ্চর্যবোধক মনে হ'তে পারে। কিন্তু যখন এ সকল

৩৩০. আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ৩৯-৪১। অন্যত্র তিনি বলেন, ولا أدري أي عقل يريدون أن يحكموه ويعطوه من السلطة أكثر مِمَّا أعطاه علماؤنا في قواعدهم الدقيقة؟ ليس عندنا عقل واحد نقيس به الأمور، بل العقول متفاوتة، والمقاييس مختلفة، والمواهب متباينة، فما لا يعقله فلان ولايفهمه، قد يراه آخر معقولاً مفهوماً। দ্র. তদেব, পৃ. ২৭৮।

হাদীছ বিশুদ্ধ প্রমাণিত হবে, তখন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। কেননা কোন কিছু বোধগম্য না হ'লেই তা বিবেকবিরোধী হয় না। আবার আজকে যা বিবেকবিরোধী মনে হয়, আগামীকাল তা বিবেকবিরোধী না-ও থাকতে পারে। বিবেকের কাছে আশ্চর্যজনক হওয়াটা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার। সংস্কৃতি এবং পরিবেশ ভেদে তা পরিবর্তনশীলও। এর কোন নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতিও নেই। যেমন এককালে কোন প্রাণী বিহীন যান হতে পারে, তা ভাবনার অতীত ছিল। কিন্তু আজকের যুগে তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শতবছর পূর্বেও গ্রামের মানুষের কাছে বেতারযন্ত্র ছিল বিস্ময়কর বস্তু। তারা এটিকে শহরবাসীদের বানানো মিথ্যাচার গণ্য করত। এমনকি বেতারযন্ত্র যখন তাদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হ'ল তবুও তারা বিশ্বাস করল না। তারা ভাবল এই যন্ত্রের মধ্যে বসে আসলে জীন-ভুত কথা বলছে। ঠিক যেমনভাবে আজও শিশুরা ধারণা করে যে এর মধ্যে কোন মানুষ বসে রয়েছে যে কথা বলছে। সুতরাং ইসলামের মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই যা বিবেক অস্বীকার করে। তবে তাতে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা আমাদের নিকট বিস্ময়কর ও কল্পনাতীত অনুভূত হ'তে পারে। যেমন মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনাসমূহ, গায়েবী অন্যান্য বিষয়সমূহ। কিন্তু একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হ'ল সে নিজের সীমাবদ্ধ বুদ্ধির ভিত্তিতে তা সরাসরি অস্বীকার করে না; বরং সঠিক সূত্র থেকে তার সত্যতা যাচাই করে দেখে। অতঃপর সত্যতা পেলে তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। আর এজন্য আল্লাহ সূরা বাক্বারাহ্র শুরুতে মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলেছেন, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ 'যারা গায়েবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন *(আয়াত : ৩)*।'

আস-সিবাঈ (১৯৫৬খ্রি.) বলেন, কিছু মানুষ এমন আছে যে, তারা বিবেকবিরোধী হওয়া আর বিস্ময়কর হওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য করে না। তার দু'টি বিষয়কে একই মনে করে অস্বীকার করার জন্য তৎপর হয়। অথচ কোন বিষয় বিবেকবিরোধী তখনই মনে হয়, যখন তা অসম্ভব হয়। কিন্তু যে বস্তুটি বিস্ময়কর হয় তা আমাদের বোধের অগম্য হওয়ার কারণে সৃষ্ট হয়। সুতরাং অসম্ভব এবং অবোধগম্য– এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা গতকাল অসম্ভব ছিল, কিন্তু আজ তা বাস্তবে রূপলাভ করেছে। যেমন আজকের যুগে মানুষ চন্দ্রে গমন করছে, অথচ মধ্যযুগে যদি কেউ এ কথা বলত, তবে নিশ্চিতভাবে তাকে পাগল মনে করা হ'ত। কিন্তু আজকের যুগে তা অতি স্বাভাবিক। সুতরাং মানবীয় বিবেক-বুদ্ধিকে সর্বেসর্বা ভাবার কোন কারণ নেই।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখি হাদীছ অস্বীকারকারীরা যে সকল হাদীছ নিয়ে সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছেন, তা হয় প্রাচীন যুগের কোন সম্প্রদায়ের কাহিনী কিংবা গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদবিষয়ক হাদীছ। যেমন মাহমূদ আবূ রাইয়াহ একটি হাদীছকে উদাহরণস্বরূপ নিয়ে এসেছেন, আবূ হুরায়রা ও আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছ– إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 'জান্নাতের মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার ছায়া দিয়ে একজন আরোহী ব্যক্তি যদি একশত বছরও যাত্রা করে তবুও সে অতিক্রম করতে পারবে না।'[৩৩১] মাহমূদ আবূ রাইয়া এই হাদীছটির বিষয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন এবং বর্ণনাকারী আবূ হুরায়রা (রা.)- কে প্রকারান্তরে মিথ্যুক প্রমাণিত করতে চেয়েছেন। এখন প্রশ্ন হ'ল, এই হাদীছে বিস্ময় বোধ করার কী রয়েছে? জান্নাত কি অদৃশ্যের বিষয় নয়? আমরা সেই জগৎ সম্পর্কে আল্লাহ যতটুকু জানিয়েছেন ততটুকুর বাইরে কী জানি? যে বিষয়টি আমাদের সীমাবদ্ধ কল্পনারই বাইরের বস্তু তা কীভাবে আমরা নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে অস্বীকার করতে পারি? বরং এ বিষয়ে সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যার পরিবর্তে মানবীয় বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটানোই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। যে অন্ধ কখনও পৃথিবীর আলো দেখে নি, সে কি হাতির বিবরণ শুনে তার বাস্তবতা অনুমান করতে পারবে? উপরন্তু সেই ব্যক্তি যদি নিজের মত করে হাতির আকার কল্পনা করে তা নিয়ে আবার বিতর্ক শুরু করে, তবে তার ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে?

৬. আক্বলকে প্রাধান্য দান করে যদি অদৃশ্যবিষয়ক হাদীছগুলি অস্বীকার করা হয়, তবে তা কুরআনে বর্ণিত গায়েবী বিষয়গুলিকেও অস্বীকার করা অপরিহার্য করে দেয়। যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছা.)-এর হাতের ইশারায় চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল,[৩৩২] সুলায়মান (আ.) তাঁর রাজত্বের পশু-পাখি, জিনদের ভাষা বুঝতেন এবং তারা তাঁর অনুগত ছিল।[৩৩৩] এ সকল বিষয় কি হাদীছ অস্বীকারকারীগণ স্বীকার করবেন? এটি যদি স্বাভাবিক বুদ্ধি বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য হয়, তবে একইরূপ বিষয় রাসূল (ছা.) কর্তৃক হাদীছ হিসাবে বর্ণিত হ'লে তা বিশ্বাসযোগ্য হবে না কেন?

---

৩৩১. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৩২৫১-৩২৫২।
৩৩২. সূরা আল-ক্বামার, আয়াত : ৫৪।
৩৩৩. সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত : ৭৯-৮১, আন-নামল, আয়াত : ১৫-৪৪।

চ. ছহীহ হাদীছ কখনওবা বোধের অতীত (مخالف الفهم) হ'তে পারে, কিন্তু বিবেকের বিরোধী (مخالف العقل) হয় না। ইবনু তায়মিয়া (৭২৮হি.) বলেন, 'আমি সাধ্যমত শরী'আতের দলীলসমূহ সম্পর্কে গবেষণা করেছি। কিন্তু এমন একটি যথার্থ ক্বিয়াস দেখিনি যা ছহীহ হাদীছের বিরোধী হ'তে পারে। তেমনিভাবে বিশুদ্ধ সূত্রের কোন বর্ণনাকে দেখিনি সুস্পষ্ট যুক্তির বিরোধী হ'তে। বরং যখনই দেখেছি কোন ক্বিয়াস হাদীছের বিরোধিতা করছে, তখন দু'টির একটি অবশ্যই যঈফ প্রমাণিত হয়েছে। তবে এই ছহীহ ক্বিয়াস এবং বাতিল ক্বিয়াসের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান অনেক বিজ্ঞ আলেমের নিকট পর্যন্ত নেই, তাহ'লে অন্যদের ক্ষেত্রে কী হতে পারে?'[৩৩৪]

ছ. মুসলিম বিদ্বানদের চিরন্তন নীতি হ'ল, আক্বল ও অহীর দ্বন্দ্বে সর্বশেষ ফয়ছালাকারী হ'ল অহী। কেননা শরী'আতের ওপর আক্বলকে প্রাধান্য দিতে চাওয়াই হল আক্বল বিরোধী কর্ম। কেননা আক্বল সাক্ষ্য দেয় যে, শরী'আহ প্রণেতা এবং তাঁর প্রেরিত অহী আক্বলের চেয়ে অধিক জ্ঞানসম্পন্ন। সুতরাং কেউ যদি অহীর ওপর আক্বলকে স্থান দিতে চায় তবে সে আক্বলের এই সাক্ষ্যকে বাতিল করে দেয়। আর যদি আক্বলের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যায়, তবে তার কথাও বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং অহীর জ্ঞানই চূড়ান্ত ফয়ছালাকারী। এ বিষয়ে আলী (রা.)-এর একটি বক্তব্য সুপ্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه 'দ্বীন যদি রায় তথা মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি অনুযায়ী হ'ত, তবে মোজার উপরে মাসাহ করার চেয়ে নিচে মাসাহ করাই অধিক উপযুক্ত হ'ত।'[৩৩৫] আবুল মুযাফ্ফর আছ-ছানা'আনী (৪৮৯হি.) বলেন, اعلم أن مذهب أهل السنة أن العقل لا يوجب شيئا على أحد ولا يرفع شيئا عنه ولا حظ له في تحليل أو تحريم ولا تحسين ولا تقبيح 'জেনে রাখ, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মাযহাব হ'ল আক্বল কোন কিছু মানুষের ওপর আবশ্যক করে না, কোন কিছু বিদূরিতও করে না। কোন কিছু হালাল ও হারাম প্রতিপন্নেও তার কোন ভূমিকা নেই। কোন কিছুর ভাল-মন্দ নির্ধারণেও তা গুরুত্বহীন।'[৩৩৬] আশ-শাত্বিবী (৭৯০হি.) বলেন, وإن

---

৩৩৪. ইবনু তায়মিয়া, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৭।।
৩৩৫. *সুনান আবী দাঊদ*, হা/১৬২।
৩৩৬. আবুল মুযাফ্ফর আস-সাম'আনী, *আল-ইনতিছারু লি আছহাবিল হাদীছ*, পৃ. ৭৫।

الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غير 'অকাট্য দলীল এবং চূড়ান্ত ফয়ছালাকারী হ'ল শরী'আত, অন্য কিছু নয়।'[৩৩৭] ইবনু খালদূন (৮০৮হি.) বলেন, فإذا هدانا الشّارع إلى مدرك فينبغي أن نقدّمه على مداركنا ونثق به دونها ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه بل نعتمد ما أمرنا به اعتقادا وعلما ونسكت عمّا لم نفهم من ذلك ونفوّضه إلى الشّارع ونعزل العقل عنه. 'যদি শরী'আত প্রবর্তক (আল্লাহ) কোন দলীলের দিকে পথপ্রদর্শন করেন, তবে আমাদের উচিত হবে নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তির উপর তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা এবং কেবল তার প্রতিই আস্থা রাখা। সে দলীলকে সত্যায়নের জন্য আমাদেরকে কোন আক্বলী দলীলের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন নেই এমনকি যদি তা বুদ্ধির বিপরীতও হয়। বরং আমাদেরকে যা নির্দেশ করা হয়েছে তার ওপরই বিশ্বাসগতভাবে এবং জ্ঞানগতভাবে নির্ভর করা উচিত হবে। আর যা আমাদের বোধের অতীত হবে তা সম্পর্কে নিশ্চুপ থাকব এবং শরী'আত প্রবর্তক (আল্লাহ)-এর দিকে তা সোপর্দ করব। তাতে আক্বল প্রয়োগ থেকে বিরত থাকব।'[৩৩৮]

অতএব আক্বল শরী'আতকে অনুধাবন এবং তার কার্যকারিতা উপলব্ধির জন্য বড় মাধ্যম হ'তে পারে। তা শারঈ বিধানের গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী হ'তে পারে। কিন্তু কখনই শারঈ বিধান বাতিলযোগ্য করার ক্ষমতা রাখে না। তেমনি শরী'আতের কোন দলীলকে শুধু বুদ্ধির ভিত্তিতে বাতিলও করতে পারে না। এভাবে ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে আক্বলকে সমর্থন করেছে এবং আক্বলের সমর্থন গ্রহণ করেছে, কিন্তু তাকে কখনই সার্বভৌম হ'তে দেয়নি; বরং সার্বভৌমত্ব কেবল নক্বলের। যা চূড়ান্ত জ্ঞান হিসাবে এবং অহীর বিধান হিসাবে মানবজাতির নিকট প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 'আর বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহ্র চেয়ে কে অধিক উত্তম?'[৩৩৯]

---

৩৩৭. আশ-শাত্বিবী, *আল-ই'তিছাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭২।
৩৩৮. ইবনু খালদূন, *তারীখু ইবনু খালদূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫৪।
৩৩৯. সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৫০।

সংশয়-৪ : কুরআনবিরোধী হ'লে হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদীছ অস্বীকারকারীগণ তাঁদের অবস্থানকে শক্তিশালী করার জন্য অপর একটি মূলনীতি ব্যবহার করেন। আর তা হ'ল, প্রতিটি হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য কুরআনের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে। যদি তা কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তবেই গ্রহণযোগ্য হবে, আর যদি কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে তা পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা তা রাসূল (ছা.)-এর বাণী নয়। এজন্য তাঁরা হাদীছ থেকেও দলীল পেশ করে থাকেন। যেমন : আব্দুল্লাহ ইবনু উমার হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছা.) বলেন, وإنه سيفشوا عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرءوا كتاب الله، واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله 'আমার নামে অনেক হাদীছ প্রকাশিত হবে। সুতরাং তোমাদের নিকট আমার যে হাদীছ পৌঁছাবে, (তার বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য) তোমরা কুরআন পাঠ কর এবং তা কুরআন মোতাবেক পরীক্ষা কর। যদি কুরআনের সাথে মিলে যায় তবে সেটি আমি বলেছি আর যদি না মিলে তবে আমি তা বলি নি।'[৩৪০]

পূর্বযুগে রাফিযী, মু'তাযিলা এবং যিন্দিকগণ এই যুক্তি পেশ করেছিল। বর্তমান যুগে ড. আহমাদ আমীন, ডা. তাওফীক ছিদকী, মাহমূদ আবূ রাইয়াহ, জামাল বান্না, আহমাদ ছুবহী মানছূর প্রমুখ এই মতাবলম্বন করেছেন।[৩৪১] পাকিস্তানের আমীন এহসান ইছলাহী[৩৪২], জাভিদ আহমাদ গামিদী[৩৪৩]ও এই মতের সমর্থক।[৩৪৪] তাদের মতে, কুরআনই হ'ল একমাত্র দলীল এবং সুন্নাহ কেবল তাতে নিশ্চয়তাবোধক অর্থ প্রদান করে। সুতরাং যে সকল বিধান কুরআনে নেই, তা সুন্নাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা রাসূল (ছা.)

---

৩৪০. আত-তাবারাণী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা/১৩২২৪।

৩৪১. ড. ঈমাদ আস-সাইয়েদ আশ-শারবীনী, *আস-সুন্নাতুন নাবাভিয়াহ ফী কিতাবাতি আ'দাইল ইসলাম*, পৃ. ২২০-২২১।

৩৪২. আমীন আহসান ইছলাহী, *মাবাদী তাদাব্বুরে হাদীছ*, পৃ. ২৮।

৩৪৩. জাভেদ আহমাদ গামেদী, *মীযান*, পৃ. ৬২।

৩৪৪. এমনকি আবুল আ'লা মওদূদীর মতামতও এ বিষয়ে বিশেষ ভিন্ন নয়। দ্র. আবুল আ'লা মওদূদী, *তাফহীমুল কুরআন*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩-২৪৪, ঐ, *তাফহীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮-৩৬৯; ঐ, *রাসায়েল ওয়া মাসায়েল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭-৫৮, ২৩৩; ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৭)।

বলেনও নি। সুতরাং তা কোন দলীল নয়।[৩৪৫] এই যুক্তিতে তাঁরা রজমের হাদীছসহ অনেক হাদীছ অস্বীকার করেছেন। আমীন আহসান ইছলাহী বলেন, کوئی حدیث جو کسی پہلو سے قران کے خلاف ہو گی وہ قبول نہیں کی جائے گی 'কোন হাদীছ যদি কোন এক দিক থেকে কুরআনের বিপরীত হয়, তবে তা কবুল করা যাবে না।'[৩৪৬] তিনি হাদীছ কুরআনের বিপরীত হওয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে অন্যত্র বলেন, اگر حدیث صریحا قران مجید کے الفاظ اور اسکے سیاق و نظم کے خلاف پڑ رہی ہو تو ایسے مقامات پر توقف کرنا چاہیئے اور اسی صورت میں حدیث کو جھوڑنا چاہیئے 'যদি কোন হাদীছ স্পষ্টভাবে কুরআনের শব্দ, তার পূর্বাপর এবং বাকরীতির বিপরীত হয়, তবে এ সকল স্থানে হাদীছটির ব্যাপারে সিদ্ধান্তগ্রহণ মুলতবী রাখা উচিৎ এবং এই অবস্থায় হাদীছটি পরিত্যাগ করা উচিৎ।'[৩৪৭] অর্থাৎ কুরআনের সাথে কেবল অর্থগত মিল থাকলেই যথেষ্ট নয়, শব্দগতভাবেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হ'তে হবে! এজন্যই বোধ হয় জামাল বান্না বলেন, وقد تتملكنا الدهشة عندما نري إعمال هذا المعيار سيجعلنا نستبعد قرابة نصف الأحاديث المتداولة بين الناس 'আমরা বিস্ময়াভূত হয়েছি যখন দেখেছি যে, এই মূলনীতি প্রয়োগ করতে পারলে আমরা বর্তমানে মানুষের মাঝে প্রচলিত প্রায় অর্ধেক হাদীছই বাতিল ঘোষণা করতে পারব।'[৩৪৮] অন্যত্র তিনি বলেন, 'এই মূলনীতির মাধ্যমে দুই থেকে তিন হাজার হাদীছ বাতিল করা সম্ভব যার মধ্যে কমপক্ষে অর্ধেকই হবে বুখারী ও মুসলিমের হাদীছ।'[৩৪৯]

পর্যালোচনা :

এই মূলনীতি পুরোপুরিভাবে অগ্রহণযোগ্য। কেননা আমরা আগেই জেনেছি যে, সুন্নাহ হ'ল কুরআনের ব্যাখ্যা এবং কুরআনের ওপর অতিরিক্ত বিধান সংযোজনকারী। যেহেতু কুরআনে এই দু'টি বিষয়ই উল্লেখিত হয়নি,

---

৩৪৫. ড. ঈমাদ আস-সাইয়েদ আশ-শারবীনী, *আস-সুন্নাতুন নাবাভিয়াহ ফী কিতাবাতি আ'দাইল ইসলাম*, পৃ. ২২০।

৩৪৬. আমীন আহসান ইছলাহী, *মাবাদী তাদাব্বুরে হাদীছ*, পৃ. ২৮।

৩৪৭. আমীন আহসান ইছলাহী, *মাবাদী তাদাব্বুরে কুরআন*, পৃ. ২১৯।

৩৪৮. জামাল বান্না, *আস-সুন্নাতু ওয়া দাওরুহা ফিল ফিকহিল জাদীদ* (কায়রো : দারুল ফিকর, ১৯৯৭খ্রি.), পৃ. ২৪৮।

৩৪৯. তদেব, পৃ. ২৬৫।

সুতরাং তাদের মূলনীতি অনুসারে ইসলামী শরী'আতে হাদীছের ভূমিকা কেবল কুরআনের নিশ্চয়তাপ্রদানকারীতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। যা একাধারে হাদীছের প্রামাণিকতাকেই নাকচ করে দেয়। ফলে হাদীছ অস্বীকারকারীদের একটি সুদৃঢ় অস্ত্রে পরিণত হয়েছে এই মূলনীতি। বিশেষ করে কুরআনের বিপরীতে হাদীছকে উপস্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নিম্নে তাদের দলীলসমূহ খণ্ডন করা হ'ল।

ক. ইমাম ত্বাবারাণী বর্ণিত যে হাদীছটি দলীল হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা নিতান্তই দুর্বল।[৩৫০] ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (৮৫২হি.) বলেন, হাদীছটি বেশ কিছু সূত্র থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু কোনটিই ত্রুটিমুক্ত নয়।[৩৫১] নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী (১৯৯৯খ্রি.) এ মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলি একত্রিত করেছেন। কিন্তু সবগুলিরই সনদ খুবই দুর্বল কিংবা জাল।[৩৫২] সুতরাং এই মর্মের সকল হাদীছ বাতিল হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছদের মধ্যে ইজমা' হয়ে গেছে।[৩৫৩]

ইমাম শাফেঈ (২০৪হি.) বলেন, ما روى هذا أحد يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر...وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء 'এই হাদীছটি এমন একজনও বর্ণনা করেনি যার হাদীছ ছোট-বড় কোন বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হয়... এটি এক অপরিচিত লোকের বিচ্ছিন্ন বর্ণনা। আর এই জাতীয় বর্ণনা আমরা কোন কিছুতেই গ্রহণ করতে পারি না।'[৩৫৪]

আল-খাত্তাবী (৩৮৮হি.) إلاّ أني أوتيت الكتاب ومثله معه 'নিশ্চয়ই আমি কিতাব প্রাপ্ত হয়েছি এবং তার সাথে অনুরূপ'– হাদীছটির ব্যাখ্যা বলেন, এই হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হাদীছকে কুরআনের ভিত্তিতে যাচাইয়ের

---

৩৫০. নূরুদ্দীন আল-হায়ছামী, *মাজমা'উয যাওয়াইদ*, হা/৭৮৭; ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭০; শামসুদ্দীন আস-সাখাভী, *আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৮৫খ্রি.), হা/৫৯; পৃ. ৮৩; ইসমাঈল আল-আজলূনী, *কাশফুল খাফা* (কায়রো : মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫৭হি.), হা/২২০; ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬।

৩৫১. শামসুদ্দীন আস-সাখাভী, *আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ*, পৃ. ৮৩।

৩৫২. নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফাহ*, হা/১০৮৩-১০৯০, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৩-২১১।

৩৫৩. আবূ যাহু, *আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছূন*, পৃ. ৩১৪।

৩৫৪. আশ-শাফেঈ, *আর-রিসালাহ*, পৃ. ২২৫।

কোন প্রয়োজন নেই। কেননা যখনই তা রাসূল (ছা.) হ'তে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে, তখনই স্বয়ংক্রিয়ভাবে দলীল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর কতিপর ব্যক্তি যা বর্ণনা করেছে এই মর্মে যে, যখন তোমাদের নিকট হাদীছ পৌঁছাবে, তখন তা কুরআন দ্বারা পরীক্ষা কর। যদি কুরআনের সাথে তা মিলে যায় তবে তা গ্রহণ কর, আর যদি বিরোধী হয়, তবে তা গ্রহণ করো না।– এই হাদীছ বাতিল যার কোন ভিত্তি নেই। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩হি.) বলেছেন, হাদীছটি যিন্দীকরা তৈরী করেছে।[৩৫৫]

ইবনু হাযম (৪৫৬হি.) এই হাদীছগুলির দুর্বলতা উল্লেখ করার পর বলেন, هل يستجيز هذا إلا كذاب زنديق كافر 'কোন মিথ্যুক, যিন্দিক, কাফের ব্যতীত এমন কথা কেউ বলতে পারে?'[৩৫৬]

আল-বায়হাক্বী (৪৫৮হি.) বলেন, 'যে হাদীছটিতে হাদীছকে কুরআনের সাথে পরস্পর তুলনা করতে বলা হয়েছে তা অশুদ্ধ, বাতিল। হাদীছটি নিজেই তার বাতিল হওয়ার ব্যাপারে ইঙ্গিত করে। কুরআনের কোথাও বলা হয় নি যে, হাদীছকে কুরআনের নিরিখে গ্রহণ করতে হবে।'[৩৫৭]

ইবনু আব্দিল বার্র (৪৬৩হি.) বলেন, وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا لم يقيد بشيء ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ 'আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণের জন্য শর্তহীনভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, কোনরূপ সীমা বেঁধে দেননি। তিনি বলেননি যে, কেবল আল্লাহ্‌র কিতাবে সাথে যা মিলবে তার অনুসরণ কর, যেমনটি কিছু বিভ্রান্ত মানুষ বলে থাকে।'[৩৫৮]

খ. হাদীছটি যদি ছহীহ ধরে নেয়া হয় তবুও তাদের পক্ষে দলীল নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধেই দলীল। কেননা তাদের কথা মত যদি হাদীছটি কুরআনের ওপর আরোপ করা হয়, তবে তা বাতিল প্রমাণিত হয়, কেননা কুরআনে রাসূল

---

৩৫৫. আল-খাত্তাবী, *মা'আলিমুস সুনান*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৯।

৩৫৬. ইবনু হাযম, *আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮।

৩৫৭. والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن। দ্র. আল-বায়হাক্বী, *দালাইলুন নুবুওয়াহ* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৪০৫হি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭।

৩৫৮. ইবনু আব্দিল বার্র, *জামি'উ বায়ানিল ইলম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৮৯।

(ছা.)-এর নিঃশর্ত আনুগত্যের কথা এসেছে। ইবনু হাযম (৪৫৬হি.) যথার্থই বলেন, সর্বপ্রথম আমরা ঐ হাদীছটিকেই কুরআনের সাথে তুলনা করব, যেটি তোমরা উল্লেখ করেছ। যখন আমরা তুলনা করলাম, তখন দেখলাম হাদীছটি কুরআনের বিরোধী। কেননা আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'রাসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও।'[৩৫৯] তিনি আরও বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 'যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হ'ল, আমি তোমাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করিনি।'[৩৬০]

ইবনু আব্দিল বার্র (৪৬৩হি.) বলেন, কিছু বিদ্বান হাদীছটির ব্যাপারে (রসিকতাসুলভ) মন্তব্য করেছেন যে, সব কিছুর পূর্বে আমরা হাদীছটি কুরআনের নিরিখে যাচাই করি এবং তার উপরই নির্ভর করি। অতঃপর যখন আমরা হাদীছটি কুরআনের সাথে তুলনা করলাম তখন দেখলাম হাদীছটি কুরআনের বিরোধী। কেননা আমরা কুরআনের কোথাও পাইনি যেখানে বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছা.)-এর কোন হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না, যদি তা কুরআনের সাথে না মিলে। বরং আমরা পেয়েছি যে, কুরআন রাসূল (ছা.)-এর নিঃশর্ত আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছে এবং কোন অবস্থাতেই তার বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে সর্তক করেছে।[৩৬১]

দ্বিতীয়ত, কোন কোন হাদীছে শুধু 'কিতাবুল্লাহ'র অনুসরণের যে কথা এসেছে তার ব্যাখ্যায় ইবনু হাজার আসক্বালানী (৮৫২হি.) বলেন, المراد بكتاب الله في الحديث المرفوع حكمه وهو أعم من أن يكون نصا أو مستنبطا 'মারফূ' হাদীছ সমূহে আল্লাহ্‌র কিতাব থেকে উদ্দেশ্য হ'ল– আল্লাহ্‌র কিতাবের হুকুম। আর এই হুকুম যেমন সকল নছ (কুরআন ও হাদীছ)- কে বুঝায়, তেমনি নছের আলোকে উদ্ভাবিত বিধানসমূহকেও বুঝায়।'[৩৬২]

---

৩৫৯. সূরা আন-হাশর, আয়াত : ৭।
৩৬০. সূরা আন-নিসা, আয়াত : ৮০।
৩৬১. ইবনু আব্দিল বার্র, *জামি'উ বায়ানিল ইলম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৮৯।
৩৬২. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, *ফাতহুল বারী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩।

গ. আমীন আহসান ইছলাহী তাঁর মতের সপক্ষে খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.)-এর একটি উক্তি তুলে ধরেছেন, যেখানে তিনি বলেন, ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم 'খবর ওয়াহিদ আক্বলের বিরোধী হলে এবং কুরআন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন বিধানের বিপরীত হলে, তা গ্রহণযোগ্য নয়।'[৩৬৩] আমীন আহসান ইছলাহী ছাহেব ও তাঁর অনুসারীরা বস্তুত উলূমুল হাদীছ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন না। নতুবা মুহাদ্দিছদের পরিভাষাসমূহ নিজের বুঝ মত শাব্দিক অর্থ করে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করতেন না। তাঁরা জানেনেই না যে, পরস্পরবিরোধী হাদীছসমূহের ব্যাপারে মুহাদ্দিছদের নিজস্ব নীতি রয়েছে যা 'মুখতালিফুল হাদীছ'-এর আলোচনায় উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাঁরা জানেন না যে, মুহাদ্দিছগণও কোন হাদীছ ছহীহ হওয়ার জন্য কুরআনের পরিপন্থী না হওয়াকে শর্ত করেছেন এবং খত্বীব আল-বাগদাদী সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তবে মুহাদ্দিছদের নিকট এই বৈপরীত্য চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া ভিন্ন। তাদের নিকট হাদীছ ও কুরআন পরস্পর বিরোধী হওয়ার অর্থ সেখানে আর কোন ব্যাখ্যার অবকাশ না থাকা এবং কোন সমন্বয়ের সুযোগ না থাকা।[৩৬৪] বস্তুত এমন ঘটনা যঈফ এবং জাল হাদীছ ব্যতীত কোন ছহীহ হাদীছের ক্ষেত্রে ঘটে না। কেননা এই বৈপরীত্য নিষ্পত্তির জন্য জন্য মুহাদ্দিছদের সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আর তা হ'ল, (১) উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করা, নতুবা নাসিখ-মানসূখ চিহ্নিত করা, সেটি সম্ভব না হ'লে কোন একটিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা। সেটিই সম্ভব না হ'লে দু'টির ওপরই আমল মুলতবী রাখা, যতক্ষণ না তার অর্থ স্পষ্ট হয়।[৩৬৫] সুতরাং মুহাদ্দিছগণ কেবলমাত্র বাহ্যিক বৈপরীত্যের কারণে কোন হাদীছ বর্জন করেন না, যেমনটি হাদীছ অস্বীকারকারীগণ করে থাকেন।

ঘ. যুক্তিভিত্তিক দলীল হ'ল, যদি কেবল ঐ হাদীছগুলিকেই গ্রহণযোগ্য মনে করা হয়, যেগুলি কুরআনের সাথে হুবহু এক ও অভিন্ন হবে, তবে এই প্রশ্ন অপরিহার্যভাবে সৃষ্টি হয় যে, তাহ'লে হাদীছের আর বিশেষ প্রয়োজন কী? কুরআনই তো এককভাবে যথেষ্ট ছিল! হাদীছের প্রয়োজন তো তখনই দেখা দেয়, যখন কুরআনে বর্ণিত কোন সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যা জানা রাসূল (ছা.) ব্যতীত অসম্ভব হয়ে পড়ে। সুতরাং রাসূল (ছা.) হাদীছ গ্রহণ বা

৩৬৩. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ৪৩২।
৩৬৪. ড. ঈমাদ আস-সাইয়েদ আশ-শারবীনী, *আস-সুন্নাতুন নাবাভিয়াহ ফী কিতাবাতি আ'দাইল ইসলাম*, পৃ. ২৩৬
৩৬৫. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, *নুযহাতুন নাযার*, পৃ. ৭৯।

বর্জনের জন্য তা কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বা না হওয়াকে শর্তযুক্ত করা একেবারেই অযৌক্তিক। এর পক্ষে শারঈ কোন দলীলও নেই।[৩৬৬]

দ্বিতীয়ত, কুরআনে আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى 'আর সে মনগড়া কথা বলে না। বরং তা-ই বলে যা তার প্রতি অহীরূপে প্রেরণ করা হয়।'[৩৬৭] এই আয়াতের প্রতি যদি লক্ষ্য রাখা হয় এবং রাসূল (ছা.)-এর হাদীছের সাথে কুরআনের পরস্পর তুলনা করে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য ও বৈপরীত্য খোঁজা হয় তবে তা অহীর সাথে অহীকে পরস্পর বিরোধে জড়িয়ে দেয়ারই নামান্তর নয়? অতঃপর যদি কোন ব্যক্তি নিজের ত্রুটিপূর্ণ মানবীয় বিচার-বুদ্ধি দিয়ে এর মধ্যে ফয়ছালা করতে চায় এবং কোন একটিকে দুর্বল ঘোষণার দুঃসাহস করে, তবে তা কতটা ভয়ানক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়? বরং এটি তো সরাসরি আল্লাহ প্রেরিত অহী তথা কুরআনের বিশুদ্ধতার প্রতিই সন্দেহবাদ আরোপের নামান্তর! কেবল তা-ই নয়, এর মাধ্যমে রাসূল (ছা.)-এর রিসালাতকে চরমভাবে অবমাননা করা হয়। কেননা এতে রাসূল (ছা.)-এর আদেশ-নিষেধের আর কোন মূল্য থাকে না। মানুষের জন্য তার সুন্নাহ অনুসরণেরও কোন আবশ্যকতা থাকে না। এভাবে সমগ্র দ্বীন মানুষের খেয়াল-খুশীতে পরিণত হবে।

ঙ. সর্বশেষ কথা হ'ল, রাসূল (ছা.)-এর কোন ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হাদীছ নিজেই শরী'আতের একটি দলীলে পরিণত হয়ে যায়। যা অন্য কোন দলীল দিয়ে যাচাই করার কোন প্রয়োজন থাকে না। বরং তা সর্বাবস্থায় গ্রহণযোগ্য মনে করা ঈমানের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। দ্বিতীয়ত, কোন ছহীহ হাদীছ কখনও কুরআনের পরিপন্থীও হ'তে পারে না, যে কুরআন দ্বারা তা যাচাই করতে হবে। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ একই আল্লাহ প্রেরিত অহী।

আবুল মুযাফ্ফর ইবনুস সাম'আনী (৪৮৯হি.) বলেন, متى ثبت الخبر، صار أصلا من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر 'যখন কোন হাদীছ ছহীহ সাব্যস্ত হয়, তখন শরী'আতের একটি উছূলে পরিণত হয়। ফলে তা অপর কোন দলীলের সাথে তুলনা করার মুখাপেক্ষী থাকে না।'[৩৬৮]

---

৩৬৬. গাযী উযাইর, *ইনকারে হাদীছ কা নায়া রূপ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৭।
৩৬৭. সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩-৪।
৩৬৮. জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, *কাওয়াঈদুত তাহদীছ*, পৃ. ৯৮।

ইবনু হাযম (৪৫৬হি.) বলেন, ليس في الحديث الذي صح شيء يخالف القرآن 'ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত এমন কোন হাদীছ নেই যা কুরআনের বিরোধী হয়।'[৩৬৯] তিনি অন্যত্র বলেন, '(কুরআন-হাদীছ সম্পর্কে) অজ্ঞ কোন ব্যক্তির ধারণায় যদি দু'টি হাদীছ বা দু'টি আয়াত কিংবা একটি হাদীছ ও একটি আয়াত পরস্পরবিরোধী মনে হয়, তবুও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দু'টির ওপরই আমল করা অপরিহার্য।... কেননা প্রতিটিই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এসেছে এবং প্রতিটিই আনুগত্য ওয়াজিব হওয়া এবং ব্যবহারযোগ্যতার দিক দিয়ে সমান, কোন পার্থক্য নেই।'[৩৭০]

আশ-শাত্বিবী (৭৯০হি.) বলেন, 'হাদীছ হয় স্রেফ আল্লাহ্র অহী, নতুবা রাসূল (ছা.)-এর ইজতিহাদ যা কিতাব ও সুন্নাহ্র ছহীহ দলীল দ্বারা সমর্থিত। দু'টি দিক থেকেই হাদীছের সাথে কুরআনের কখনও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হ'তে পারে না। কেননা রাসূল (ছা.) নিজের প্রবৃত্তি থেকে কোন কথা বলেন না। তিনি যা-ই বলেন, তা আল্লাহ্র অহী প্রাপ্ত হয়েই বলেন।'[৩৭১]

পাকিস্তানের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী মুহাম্মাদ শফী (১৯৭৬খ্রি.) ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কিত রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ, لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات 'ইবরাহীম (আ.) তিনটি স্থানে ছাড়া কখনও মিথ্যা বলেননি'[৩৭২]-এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'মির্যা কাদিয়ানী ও প্রাচ্যবিদদের মোহগ্রস্থ মুসলমানগণ[৩৭৩] এই হাদীছটি

---

৩৬৯. ইবনু হাযম, *আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০।

৩৭০. إذا تعارض الحديثان أو الآيتان أو الآية والحديث فيما يظن من لا يعلم ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك... وكل من عند الله عز وجل وكل سواء في باب وجوب الطاعة والاستعمال ولا فرق -ইবনু হাযম, *আল-ইহকাম ফী উছূলিল আহকাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১।

৩৭১. فإن الحديث إما وحي من الله صرف، وإما اجتهاد من الرسول –عليه الصلاة والسلام– معتبر بوحي صحيح من كتاب أو سنة، وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله؛ لأنه –عليه الصلاة والسلام– ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى। দ্র. আশ-শাত্বিবী, *আল-মুওয়াফাক্বাত*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৫।

৩৭২. *ছহীহুল বুখারী*, হা/৫০৮৪, *ছহীহ মুসলিম*, হা/২৩৭১।

৩৭৩. ফখরুদ্দীন রাযী (৬০৪হি.) সর্বপ্রথম হাদীছটির ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। অতঃপর আধুনিক যুগে ভারত উপমহাদেশে হামীদুদ্দীন ফারাহী (১৯৩০খ্রি.), শিবলী নোমানী (১৯১৪খ্রি.), আবুল আ'লা মাওদূদী (১৯৭৯খ্রি.), আমীন আহসান ইছলাহী (১৯৯৭খ্রি.)

বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে দিয়েছে যে, এর কারণে আল্লাহ্‌র বন্ধু ইবরাহীম (আ.)- কে মিথ্যা বলা যরূরী হয়ে পড়ে। কাজেই খলীলুল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলার চেয়ে সনদের বর্ণনাকারীদের মিথ্যাবাদী বলে দেয়া সহজতর। কেননা হাদীছটি কুরআনের পরিপন্থী। তারা এ থেকে একটি সামগ্রিক নীতি আবিষ্কার করেছে যে, যে হাদীছ কুরআনের পরিপন্থী হবে, তা যতই শক্তিশালী, বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত হোক না কেন, মিথ্যা ও ভ্রান্ত আখ্যায়িত হবে। এই নীতিটি সস্থানে তো সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং মুসলিম উম্মাহ্‌র নিকট অপরিহার্যভাবে স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু মুসলিম বিদ্বানগণ সারা জীবনের পরিশ্রম ব্যয় করে যেসব হাদীছকে শক্তিশালী এবং বিশুদ্ধ সনদ দ্বারা প্রমাণিত পেয়েছেন, সেগুলোর মধ্যে একটি হাদীছও এরূপ নেই, যাকে কুরআনের পরিপন্থী বলা যায়। বরং স্বল্পবুদ্ধিতা এবং বক্রবুদ্ধিতার ফলেই যে হাদীছকে তারা রদ করতে চায় তাকে কুরআন পরিপন্থী আখ্যা দিয়ে থাকে এবং এই বলে ছেড়ে দেয় যে, এই হাদীছটি কুরআনের বিরোধী হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। যেভাবে এই হাদীছটির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে।[৩৭৪]

সংশয়-৫ : হাদীছ ছহীহ-যঈফ নির্ণয় করা মুহাদ্দিছদের নিজস্ব ইজতিহাদী বিষয়। সুতরাং তা মানা অপরিহার্য নয়।

হাদীছ অস্বীকারকারী তুর্কী লেখক Mustafa İslamoglu (জন্ম : ১৯৬০খ্রি.) বলেন, 'ছহীহ হাদীছ হল মুহাদ্দিছদের ব্যক্তিগত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ কিছু হাদীছ। এর মানে এই নয় যে, এগুলো সত্যিই রাসূলের হাদীছ। তার প্রমাণ হ'ল, ইমাম বুখারী যাদেরকে ছিকাহ বা শক্তিশালী হিসাবে উল্লেখ করেছেন এমন প্রায় ৬০০ রাবী থেকে ইমাম মুসলিম হাদীছ গ্রহণ করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এগুলো সব মুহাদ্দিছদের ব্যক্তিগত মূল্যায়নের উপর ভিত্তিশীল। সুতরাং কারো ব্যক্তিগত মূল্যায়নের মাধ্যমে কোন চিরন্তন সত্য নির্ণিত হতে পারে না এবং তা মুসলিম উম্মাহ তর্কাতীতভাবে গ্রহণ করতে পারে না। তা করতে আমরা বাধ্যও নই। সুতরাং হাদীছকে অবশ্যই কুরআন দ্বারা যাচাই করতে হবে।[৩৭৫] ইতিপূর্বে ড. আহমাদ আমীন[৩৭৬], মাহমূদ আবূ

এবং হাদীছ অস্বীকারকারীদের মধ্যে আসলাম জয়রাজপুরী (১৯৫৫খ্রি.), গোলাম আহমাদ পারভেয (১৯৮৫খ্রি.) প্রমুখ হাদীছটির ওপর আপত্তি জানিয়ে রদ করেছেন। দ্র. ড. মুহাম্মাদ আকরাম ওয়ারাক, *মুতূনে হাদীছ পর জাদীদ যেহেন কী ইশকালাত*, পৃ, ২৯০-২৯১।

৩৭৪. মুহাম্মাদ শফী, *তাফসীর মাআরেফুল ক্বোরআন*, বঙ্গানুবাদ : মুহিউদ্দীন খান (মদীনা : বাদশাহ ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩হি.), পৃ. ৮৮১।

৩৭৫. দ্র. তাঁর ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট– www.mustafaislamoglu.com.

রাইয়াহ[৩৭৭], আসলাম জয়রাজপুরী[৩৭৮] প্রমুখ উপরোক্ত যুক্তিতে এবং জারাহ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিছদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্যকে উদাহরণ হিসাবে নিয়ে এসে মুহাদ্দিছদের গৃহীত নীতির প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন।

পর্যালোচনা :

মুহাদ্দিছদের হাদীছ সমালোচনা নীতিমালার প্রতি অনাস্থাসূচক বক্তব্য আধুনিক যুগে প্রাচ্যবিদদের মাধ্যমেই প্রথম শুরু হয়েছে। এর সাথে যোগ দিয়েছেন আধুনিকতাবাদী কিছু মুসলিম বিদ্বানও। কিন্তু হানাফী বিদ্বান ইবনুল হুমাম (৮৬১হি.)-এর মন্তব্য থেকে বোঝা যায় পূর্বযুগেও এই ধারণার অস্তিত্ব ছিল। যেমন তিনি বলেন, 'ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থে অনেক এমন বর্ণনাকারীর বর্ণনা নিয়ে এসেছেন, যারা সমালোচনা মুক্ত নয়, আবার ছহীহ বুখারীতে সমালোচিত বর্ণনাকারীর বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং বর্ণনাকারীদের বিষয়টি বিদ্বানদের ইজতিহাদের ওপরই আবর্তিত হয়।... হাদীছের হাসান, ছহীহ, যঈফ হওয়া সনদের ভিত্তিতে 'যান্নী' সিদ্ধান্ত মাত্র। সুতরাং বাস্তবে ছহীহটি ভুল হওয়া এবং যঈফটি ছহীহ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।'[৩৭৯]

অপর হানাফী বিদ্বান যাফর আহমাদ উছমানী (১৯৭৪খ্রি.) বলেন, إن تضعيف الرجال وتوثيقهم وتصحيح الحديث وتحسينها أمر اجتهادي ولكل وجهة 'বর্ণনাকারীদেরকে যঈফ বা শক্তিশালী ঘোষণা করা এবং হাদীছকে ছহীহ বা হাসান আখ্যায়িত করার বিষয়টি ইজতিহাদী। প্রত্যেকেরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে।'[৩৮০] তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'কোন একজনের নিকট একটি হাদীছ ছহীহ হওয়ার অর্থ এমন নয় যে অপরজনের নিকটও হাদীছটি

---

৩৭৬. ড. আহমাদ আমীন, *যুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৭-১১৮; ঐ, *ফাজরুল ইসলাম*, পৃ. ২১৭।

৩৭৭. মাহমূদ আবূ রাইয়াহ, *আযওয়াউন আলাস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ*, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪।

৩৭৮. আসলাম জয়রাজপুরী, *মাক্বামে হাদীছ* , পৃ. ১২৭, ১৩৩-১৩৫।

৩৭৯. وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم... فإن وصف الحسن والصحيح والضعيف إنما هو باعتبار السند ظنا، أما في الواقع فيجوز غلط الصحيح وصحة الضعيف -ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল ক্বাদীর*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৫-৪৪৬।

৩৮০. যাফর আহমাদ ওছমানী, *কাওয়াইদুন ফী উলূমিল হাদীছ*, পৃ. ৪৯।

ছহীহ হবে, আবার কোন একজনের নিকট হাদীছটি যঈফ হওয়ার অর্থ অপরজনের নিকটও তা যঈফ হবে এমন নয়।'[৩৮১] এই বক্তব্যের টীকায় সমকালীন প্রসিদ্ধ হানাফী বিদ্বান আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ (১৯৯৭খ্রি.) লিখেছেন, فإن دعواه الصحة والحسن في حديث لا تتأتي ولا تتمشي بدون تقليده رأي المحدثين في ذلك فأي فرق بين تقليدهم وتقليد المجتهدين 'যে ব্যক্তি দাবী করে যে, কোন হাদীছ ছহীহ বা হাসান, তার পক্ষে এ হুকুম দেয়া সম্ভব নয় মুহাদ্দিছদের মতামতের অন্ধানুসরণ ব্যতীত। অতএব মুহাদ্দিছদের অন্ধানুসরণ এবং মুজতাহিদদের অন্ধানুসণের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?'[৩৮২]

আবুল আ'লা মওদূদী (১৯৭৯খ্রি.)-ও অনুরূপ মত প্রকাশ করে বলেন, 'মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের খিদমত সর্বস্বীকৃত। এতে কোন কথা নেই। কথা কেবল এ বিষয়ে যে, পুরোপুরিভাবে তাঁদের উপরে ভরসা করা কতটুকু সঠিক হবে। হাজার হৌক তাঁরা তো ছিলেন মানুষই। অতএব কিভাবে আপনি একথা বলতে পারেন যে, তাঁরা যে হাদীছকে 'ছহীহ' সাব্যস্ত করেছেন, আসলেই সেটা ছহীহ? অধিকন্তু যার কারণে তাদের মধ্যে হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সর্বোচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয়, সেটি হ'ল রেওয়ায়াতের (বর্ণনার) দৃষ্টিকোণ, দিরায়াতের (যুক্তি গ্রাহ্যতার) দৃষ্টিকোণ নয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশীর বেশী সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গি, ফিক্বহ বা তাৎপর্য অনুধাবন তাদের বিষয়বস্তু ছিল না।[৩৮৩] নিচে এই মতাবলম্বীদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডন করা হ'ল।

ক. হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন এবং সার্বিক বিচার-বিশ্লেষণের পর সর্বশেষ স্তর হ'ল, তার ওপর হুকুম আরোপ করা। আর তা হ'ল হাদীছটিকে ছহীহ বা যঈফ সাব্যস্ত করা। এটি নিঃসন্দেহে ইজতিহাদী বিষয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই ইজতিহাদ তথাকথিত ব্যক্তিগত মানদণ্ড বা অভিরুচির ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং হাদীছের ইসনাদ ও মতনের উপর সুদীর্ঘ গবেষণার নিয়মতান্ত্রিক ও প্রমাণনির্ভর সিদ্ধান্ত, যার পিছনে রয়েছে হাজারো বিদ্বানের কঠোর সাধনা এবং সীমাহীন কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম। এজন্য তাদের গবেষণা ও তার ফলাফলের ওপর বিদ্বানগণ একবাক্যে ঐক্যমত পোষণ করেছেন এবং তা আমলযোগ্য দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মুহাদ্দিছদের গবেষণা পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম, নির্মোহ এবং নিয়মতান্ত্রিক। কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তাদের

---

৩৮১. তদেব, পৃ. ৫৫।
৩৮২. তদেব।
৩৮৩. সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী, *তাফহীমাত*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৬।

গৃহীত নীতিমালার গভীরতা, সক্ষমতা এবং সুদৃঢ়তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। মানবেতিহাসে এর চেয়ে কোন নিরাপদ এবং শ্রেষ্ঠ নীতিমালা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয়নি। যা সমালোচনামূলক গবেষণাধারা (Critical Study)-এর সর্বোচ্চতম নমুনা প্রতিষ্ঠা করেছে। আমেরিকান গবেষক এরিক ডিকেনসন (জন্ম : ১৯৬১খ্রি.) ইবনু আবী হাতেম (৩২৭হি.) সংকলিত الجرح والتعديل গ্রন্থের ভূমিকা تقدمة المعرفة বিস্তারিত পর্যালোচনার পর তিনি হাদীছ সমালোচনা শাস্ত্রের সূক্ষ্মতা লক্ষ্য করে বিমোহিত হন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, 'সত্যিই যদি ছহীহ হাদীছ থেকে থাকে, তবে এটা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মুহাদ্দিছগণ ছহীহ হাদীছগুলো চিহ্নিত করতে সম্ভাব্য সর্বোত্তম পন্থাই উদ্ভাবন করেছিলেন।'[৩৮৪]

খ. মুহাদ্দিছদের এই গবেষণাধারাকে বুঝতে হ'লে প্রথমে জানতে হবে যে, কী কী বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা শ্রেষ্ঠত্ব এবং নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। যেমন :

সততা : ওয়াকী' ইবনুল জার্রাহ (১৯৮হি.) বলেন, هذه صناعة لا يرتفع فيها إلا صادق 'এটি এমন একটি শাস্ত্র যাতে সত্যবাদী ছাড়া কেউ টিকে থাকতে পারে না।'[৩৮৫] এই গুণাবলী অর্জনে যে আল্লাহভীতি, ন্যায়নিষ্ঠা, যাবতীয় পাপ থেকে বেঁচে থাকা, আমানতদারিতা, আল্লাহ্র দ্বীনকে সঠিকভাবে হেফাযত করার জন্য সুতীব্র দায়বোধ প্রয়োজন ছিল তা মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতেন। দ্বীনের পথে মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ হ'ল সততা ও সত্যবাদিতা, নতুবা মানুষের কাছে কখনও বিশ্বস্ততা অর্জন করা সম্ভব নয়। আর-রাগিব আল-আস্ফাহানী (৫০২হি.) বলেন, هو أصل المحمودات وركن النبوات، ونتيجة التقوى، ولولاه لبطلت أحكام الشرائع

---

৩৮৪. In the end, I think, any estimation of the efficacy of hadith criticism as a means for authenticating hadith must turn on the question of whether there were any authentic hadith at all. If there were, it must be granted that the critics devised the best possible means for identifying them. See : Eerik Dickinson, *The Development of Early Muslim Hadith Criticism,* p. 125-126.

৩৮৫. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-জামি' লি আখলাক্বির রাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭।

'(সত্যবাদিতা) হ'ল সকল প্রশংসনীয় বিষয়ের মূল, নবুওয়াতের ভিত্তি এবং আল্লাহভীতির ফলশ্রুতি। যদি সত্যবাদিতা না থাকত তবে শরী'আতের সমস্ত বিধানসমূহ অকার্যকর হয়ে যেত।'[৩৮৬] এজন্যই আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।'[৩৮৭] মুহাদ্দিছগণকে আল্লাহ তাঁর দ্বীনের সংরক্ষণের জন্যই সম্ভবত সততার মূর্ত প্রতীকে পরিণত করেছিলেন। খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৬৩হি.) তাঁর 'আল-জামি' লি আখলাক্বির রাবী' গ্রন্থে এরূপ অনেক উদাহরণ নিয়ে এসেছেন। যেমন ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন (২৩৩হি.) বলেন, إني لأحدث بالحديث فأسهر له مخافة أن أكون قد أخطأت فيه 'আমি হাদীছ বর্ণনা করি আর রাতে বিনিদ্র থাকি এই ভয়ে যে, আমি তাতে কোন ভুল করে ফেললাম কি না।'[৩৮৮] শু'বা (১৬০হি.) বলেন, আমি সুলায়মান আত-তায়মীর চেয়ে সত্যবাদী আর কাউকে দেখিনি। যখন তিনি কোন হাদীছ বর্ণনা করতেন, তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যেত।[৩৮৯]

এই সততা বজায় রাখার প্রতিজ্ঞা থেকেই তাঁরা 'ইসনাদ' ব্যবস্থার ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছিলেন। ইবনু সীরীন বলেন, كان في الزمان الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، سألوا عن الإسناد 'প্রাথমিক যুগে তারা ইসনাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না। কিন্তু যখন ফিতনা সংঘটিত হ'ল, তখন তারা ইসনাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল।'[৩৯০] ফলে এই সততার চর্চা ইলমুল হাদীছের সর্বত্র কঠোরভাবে চর্চিত হয়েছে, যা মুহাদ্দিছ বিদ্বানদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

বস্তুনিষ্ঠতা ও আমানতদারিতা : মুহাদ্দিছদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল বস্তুনিষ্ঠতা। ফলে কোন প্রকার বহিরাগত চাপ বা ব্যক্তিগত অনুরাগ কিংবা বিরাগ তাদেরকে পথচ্যুত করতে পারেনি। এই নিখাঁদ বস্তুনিষ্ঠতা বজায়

---

৩৮৬. আর-রাগিব আল-আস্ফাহানী, *আয-যারী'আতু ইলা মাকারিমিশ শারী'আহ* (কায়রো : দারুস সালাম, ২০০৭খ্রি.), পৃ. ১৯৩।

৩৮৭. সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত : ১১৯।

৩৮৮. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-জামি' লি আখলাক্বির রাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০।

৩৮৯. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-জামি' লি আখলাক্বির রাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯।

৩৯০. ইবনু রজব, *শারহু ইলালিত তিরমিযী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৪।

রাখতে তাঁদের গৃহীত পদ্ধতিসমূহ ছিল – (ক) ইসনাদ সংরক্ষণ। (খ) বর্ণনাকারীদের প্রকৃত অবস্থা সাধ্যমত পুংখানুপুংখ যাচাই করা। (গ) আহকামগত হাদীছের ক্ষেত্রে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকার জন্য তারা এমন বর্ণনাকারীকে কেবল গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন যারা সকল প্রকার অভিযোগ থেকে মুক্ত। (ঘ) তারা কারো প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী হয়ে মতামত প্রকাশ করতেন না এবং সত্য প্রকাশে কখনও ভয় পেতেন না। এমনকি নিজের পিতা ও ভাইয়ের বিরুদ্ধেও তারা 'জারাহ' (সমালোচনা) করতে দ্বিধা করতেন না। (ঙ) তাঁরা এমন কোন ব্যক্তির সমালোচনা গ্রহণ করতেন না, যারা তার সাথী বা সমসাময়িক, বিশেষত যারা হিংসাবশত সাথীদের ব্যাপারে কোন কথা বলতে পারেন। এ সকল কঠোর নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁদের একটিই উদ্দেশ্য ছিল যেন ইসলামী শরী'আহ্‌র মধ্যে কোন বাতিলের অনুপ্রবেশ না ঘটতে পারে। আর ঘটলেও তা যেন সহজে চিহ্নিত করা যায়।

ধৈর্য এবং অধ্যাবসায় : হাদীছ একত্রিত করা এবং তা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার জন্য মুহাদ্দিছগণ যে অস্বাভাবিক পরিশ্রম করেছেন, পৃথিবীর অন্য কোন শাস্ত্রে তার নযীর পাওয়া যায় না। কখনও একটি মাত্র হাদীছ সংগ্রহের জন্য তারা একটি দেশ সফর করতেন। এরূপ অসংখ্য ঘটনা হাদীছ শাস্ত্রের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইবনুল মুসাইয়িব (৯৪হি.) বলেন, إِنِّي كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد 'আমি কেবল একটি হাদীছ সংগ্রহের জন্য দিন-রাত সফর করতাম।'[৩৯১] ইমাম বুখারী (২৫৬হি.) হাদীছ সংগ্রহের অভিযানে মাত্র ২১ বছর বয়সেই আরব ও খোরাসানের প্রায় সমস্ত শহর পরিভ্রমণ করেন।[৩৯২] এমন পরিশ্রম, ধৈর্য ও অধ্যাবসায়ের নযীর দেখিয়েছিলেন হাদীছ শাস্ত্রের অন্য ইমামগণও।

সাধারণ জীবনযাপন ও পরহেযগারিতা : মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ কালিমামুক্ত, পবিত্র জীবন যাপন করতেন। তারা নিজেদের পরহেযগারিতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারতপক্ষে কখনও শাসকদের নিকটবর্তী হ'তেন না এবং তাদের দারস্থও হ'তেন না। হাম্মাদ ইবনু সালামাহ (১৬৭হি.) বলতেন, যদি কোন শাসক তোমাকে আহ্বান করে সূরা ইখলাছ পাঠের জন্য, তবুও তার কাছে যেও না।[৩৯৩] তারা শাসকদের উপহারও ফেরৎ দিতেন যার শত শত

---

৩৯১. আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্ফায,* ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫।
৩৯২. আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা,* ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪, ৪০৭।
৩৯৩. আয-মিয্যী, *তাহযীবুল কামাল,* ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

নযীর রয়েছে।[৩৯৪] তারা শাসকের সাথে সম্পর্ক রাখা বা তাদের উপহার গ্রহণ করাকে ফিতনা মনে করতেন এবং দুনিয়াদারীর প্রতি আকর্ষণসৃষ্টির কারণ মনে করতেন। এই আপোষহীন মনোভাব তাঁরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বজায় রাখতেন।

বিজ্ঞানভিত্তিক নীতিমালা অনুসরণ : জাল হাদীছ চিহ্নিত করার জন্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে হাদীছ সংগ্রহ, সংকলন ও যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শুরু করেন। তাঁরা প্রণয়ন করেছিলেন ইলমুল ইসনাদ, ইলমুল মতন, ইলমুর রিওয়ায়াহ, ইলমু রিজালিল হাদীছ, ইলমুল জারাহ ওয়াত তা'দীল, ইলমু ঈলালিল হাদীছ, ইলমু মুস্তালাহিল হাদীছের মত হাদীছ সমালোচনা শাস্ত্রের কঠোর নিয়মতান্ত্রিক হাতিয়ার।[৩৯৫] একটি মাত্র হাদীছকে বিশুদ্ধভাবে সংগ্রহের জন্য তারা যে অমানুষিক পরিশ্রম করতেন, তা ইতিহাসের পাতায় কিংবদন্তী হয়ে আছে।[৩৯৬]

সুতরাং এ সকল বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, সাধারণ অন্য যে কোন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ এবং গবেষকদের চেয়ে হাদীছ গবেষকদের অবস্থান ছিল অনেক উর্ধ্বে। আল্লাহ তাঁদেরকে যেন এই দ্বীনের হেফাযতের জন্য আলাদাভাবে প্রস্তুত করেছিলেন। ইবনু তায়মিয়া (৭২৮হি.) বলেন, 'প্রতিটি শাস্ত্রের জন্য বিশেষ লোক রয়েছে, যারা সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। তবে মুহাদ্দিছগণ হ'লেন তাদের সবার চেয়ে উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। তারা সর্বাধিক সত্যবাদী, সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং সর্বাধিক ধর্মপ্রাণ। তারা বর্ণনাকারীদের জারাহ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা বজায় রাখা এবং এ ব্যাপারে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় ছিলেন অনেক উচ্চস্থানীয়। যদিও তাদের মধ্যে জ্ঞানে এবং ন্যায়পরায়ণতায় স্তরভেদ ছিল যেমনটি সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।'[৩৯৭]

---

৩৯৪. মুহাম্মাদ আলী ক্বাসিম আল-উমরী, *দিরাসাতুন ফী মানহাজিন নাক্বদ ইন্দাল মুহাদ্দিছীন* (জর্ডান : দারুন নাফাইস, ২০০০খ্রি.), পৃ. ৩৬২-৩৬২।

৩৯৫. ছিদ্দীক হাসান খান কনৌজী, *আল-হিত্তাহ ফি যিকরিস সিহাহ আস-সিত্তাহ* , পৃ. ১৪২; মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, পৃ. ৪২৯।

৩৯৬. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আর-রিহলাহ ফী তালাবিল হাদীছ* (বৈরূত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১৩৯৫হি), পৃ. ১১৯, ১২৭, ১৯৫; ঐ, *আল কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ৪০২।

৩৯৭. فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قـــدرا ، وأعظمهـــم صدقا، وأعلاهم منزلة، وأكثر دينا، وهم من أعظم الناس صدقا وأمانـــة، وعلمـــا وخبرة، فيما يذكرونه عن الجرح والتعديل...كان بعضهم أعلم بذلك من بعـــض،

গ. হাদীছ শাস্ত্রে গৃহীত নীতিমালাকে মুহাদ্দিছদের ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত বলার সুযোগ নেই। কেননা এতে ধারণা বা কল্পনার স্থান নেই, বরং তা প্রত্যক্ষ দর্শন (مشاهدات) কিংবা শ্রবণ (مسموعات)-এর ওপর নির্ভরশীল জ্ঞান। যে সকল শর্তারোপ করা হয়েছে যেমন- সনদের অবিচ্ছিন্নতা, রাবীদের শক্তিশালী হওয়া, বর্ণনাকারী এবং যার নিকট থেকে বর্ণনা করা হচ্ছে, তারা সমসাময়িক যুগের হওয়া এবং তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়া, হাদীছ শ্রবণ করা প্রভৃতি শর্তসমূহ সবই পঞ্চন্দ্রেয় দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান। এছাড়া মুহাদ্দিছগণ বর্ণনাকারীদের অবস্থা বর্ণনার জন্য জারাহ ও তা'দীলের যে সকল শব্দ ব্যবহার করেছেন, তা অধিকাংশই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, ধারণার বশবর্তী হয়ে কিংবা ক্বিয়াস করে বলেন না। উদাহরণস্বরূপ রাসূল (ছা.)-এর সত্যবাদিতা এমনই সুনিশ্চিত বিষয় ছিল যে, কাফিররাও তীব্র শত্রুতা সত্ত্বেও তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। এর পক্ষে তাদের দলীল ছিল এই যে, রাসূল (ছা.) কখনও মিথ্যা বলেননি। সুতরাং জারাহ ও তা'দীল কোন ধারণানির্ভর জ্ঞান নয়, বরং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নির্ভর জ্ঞান, যা অকাট্য। তেমনিভাবে কোন বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীছ অপর বর্ণনাকারীদের বিরোধী হওয়ার বিষয়টিও সুস্পষ্ট, এতে কোন ধারণার অবকাশ নেই। কোন ছহীহ হাদীছের মধ্যে গোপন ত্রুটি না থাকার শর্তারোপ করা একটি নেতিবাচক শর্ত। এটিও ধারণার মাধ্যমে জানা যায় না বরং তা বাস্তব অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষী। অতএব হাদীছ শাস্ত্র কারও ব্যক্তিগত চিন্তানির্ভর জ্ঞান নয় বরং বিজ্ঞানভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ একটি শাস্ত্রের নাম।

ঘ. একজন মুহাদ্দিছ এবং একজন ফক্বীহের ইজতিহাদ এক নয়। কারণ একজন ফক্বীহ যখন কোন মাসআলা নির্ণয় করেন, তখন তিনি তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তকে কখনও চূড়ান্ত ঘোষণা করেন না এবং তার ওপর আমল করা অন্যদের জন্য ওয়াজিবও বলেন না। কিন্তু একজন মুহাদ্দিছ যখন কোন হাদীছ ছহীহ বলে চিহ্নিত করেন, তখন ইসনাদ এবং অন্যান্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। এই বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে কোন বিতর্ক নেই।[৩৯৮] যারা উভয় ইজতিহাদকে এক দৃষ্টিতে দেখেন তাঁরা অবশ্যই

- وبعضهم أعدل من بعض في وزن كلامه، كما أن الناس في سائر العلوم كـذلك
ইবনু তায়মিয়া, *মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ* (রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬খ্রি.), ৭ম খণ্ড. পৃ. ৩৪-৩৫।

৩৯৮. ইবনুছ ছালাহ, *মুকাদ্দামাতু ইবনুছ ছালাহ*, পৃ. ২৮।

জানেন যে, একজন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনার ওপর আস্থা রাখা একটি সর্বসম্মত বিষয়। এতে পৃথিবীর কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষের মাঝে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কুরআনেই বলা হয়েছে যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারক ফয়ছালা করবেন। সুতরাং মুহাদ্দিছের ইজতিহাদ কোন ব্যক্তিগত রায়ের নাম নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিদ্বানগণ বলেছেন যে, إذا صح الحديث فهو مذهبي 'যখন কোন (বিষয়ে) হাদীছ ছহীহ পাওয়া যাবে, তখন সেটিই আমরা মাযহাব।' বিদ্বানগণ এজন্য যঈফ হাদীছকেও ক্বিয়াসের ওপর অগ্রাধিকার দিতেন। কেননা কোন হাদীছ মূলগতভাবে অকাট্য, কিন্তু তাতে সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটে বর্ণনাকারীদের কারণে। আর ক্বিয়াস হ'ল মূলগতভাবেই ধারণানির্ভর। সুতরাং মুহাদ্দিছের ইজতিহাদ এবং ফকীহের ইজতিহাদের প্রকৃতি নিঃসন্দেহে ভিন্ন।[৩৯৯] ইবনু তায়মিয়া (৭২৮হি.) বলেন, 'যদি দু'জন ফক্বীহ কোন দ্বীনের কোন শাখাগত বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করেন, তখন বিতর্ককারীর জন্য দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় না; তবে হাদীছ ব্যতীত, যে হাদীছটি সম্পর্কে সে জানে যে, হাদীছটি দলীলযোগ্য কিংবা কোন মুহাদ্দিছ তাকে ছহীহ বলেছেন।'[৪০০] এই মন্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফক্বীহের রায় দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় না, কিন্তু মুহাদ্দিছের রায় দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং উভয়ের ইজতিহাদের মাঝে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

ঙ. যদি মুহাদ্দিছদের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত মানদণ্ড মোতাবেক বা ইজতিহাদী না হয়, তবে তাদের মধ্যে কোন হাদীছ সম্পর্কে ছহীহ বা যঈফ রায় প্রদানে পারস্পরিক মতভেদ কেন দেখা দেয়?−এ প্রশ্নের জবাবে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যায়। যেমন :

(১) কিছু হাদীছের দু'টি সূত্র রয়েছে। একটি ছহীহ, অপরটি যঈফ। যখন এক মুহাদ্দিছের নিকট হাদীছটি যইফ সূত্র থেকে পৌঁছায় তখন তাকে যঈফ আখ্যা দেন; আর যখন ছহীহ সূত্রে পৌঁছায় তখন তাকে ছহীহ আখ্যা দেন।

(২) দু'জন মুহাদ্দিছের উভয়ের নিকট হাদীছটি যঈফ সূত্রে পৌঁছানোর পর একজন হাদীছটির সপক্ষে শাওয়াহিদ পেলে তাকে ছহীহ ঘোষণা করেন। অপরপক্ষে যিনি শাওয়াহিদের সন্ধান পান নি, তিনি হাদীছটিকে ছহীহ ঘোষণা

৩৯৯. দ্র. আব্দুস সালাম আল-মুবারাকপুরী, *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, পৃ. ৩৫১-৩৫২।
৪০০. ইবনু তায়মিয়া, *মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০২।

করেন নি। মুহাদ্দিছগণ এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোন হাদীছকে যখন 'হাসান লি যাতিহি' অথবা 'হাসান লি গায়রিহি' আখ্যা দিয়ে থাকেন।

(৩) দু'জন মুহাদ্দিছের উভয়ই যঈফ হাদীছটির পক্ষে শাওয়াহিদ পেয়েছেন, কিন্তু একজন হাদীছটির একটি বিশেষ সনদ ও মতনকে যঈফ ঘোষণা করেছেন। এজন্য সুনানুত তিরমিযীতে দেখা যায়, غريب هٰذا اللفظ 'হাদীছটি এই শব্দে দুর্বল।'

(৪) কোন একজন হাদীছটি এই জন্য যঈফ আখ্যা দিয়েছেন যখন তিনি দেখেছেন যে, একজন ইমাম হাদীছটির কোন বর্ণনাকারীকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। অথচ সেই ইমাম পুনরায় অধিক বিশ্লেষণের পর তাঁর মন্তব্য থেকে সরে এসেছেন, যা এই মুহাদ্দিছ অবগত ছিলেন না।[৪০১]

চ. জারাহ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে মতভেদের জবাবে কয়েকটি কারণ বর্ণনা করা যায়। যেমন :

(১) কোন ইমাম একজন বর্ণনাকারীর অবস্থা পর্যালোচনার পর তার মধ্যে এমন কিছু পাননি যে, তাকে ত্রুটিপূর্ণ ঘোষণা করা যায়। কিন্তু পরবর্তীতে সেই বর্ণনাকারীর আচরণে পরিবর্তন আসে। ফলে সেই একই ইমাম তাকে ত্রুটিপূর্ণ ঘোষণা করেন। কিন্তু সেই ইমামের ছাত্ররা তাদের ওস্তাদের উভয় কথাটি শ্রবণ করেছিলেন। ফলে যারা তাঁকে 'তা'দীল' করতে শুনেছিলেন তারা উক্ত বর্ণনাকারীকে শক্তিশালী বলেছেন। আর যারা 'জারাহ' করতে বা ত্রুটিপূর্ণ বলতে শুনেছিলেন তারা উক্ত বর্ণনাকারীকে দুর্বল বলেছেন। অথচ এই ছাত্ররা দু'টি ভিন্ন সময়ে ওস্তাদের নিকট থেকে শুনেছিলেন। এমন একজন রাবী ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনু লাহি'আহ (১৭৫হি.)। যিনি প্রথমে ছিকাহ রাবী হিসাবেই পরিগণিত হ'তেন। কিন্তু তাঁর লাইব্রেরীতে আগুন লেগে সকল কিতাব পুড়ে যায়। ফলে তাঁর স্মৃতিশক্তি থেকে হাদীছ বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক ভুল করেন এবং যঈফ হিসাবে গণ্য হ'তে থাকেন।

(২) কখনও কোন ইমাম বর্ণনাকারী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারেননি এবং তাঁর জ্ঞান মোতাবেক বর্ণনাকারীকে ত্রুটিপূর্ণ পান নি। কিন্তু অপর একজন ইমাম তার সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন এবং তাকে ত্রুটিপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন।[৪০২]

---

৪০১. দ্র. আব্দুস সালাম আল-মুবারাকপুরী, *সীরাতুল ইমাম আল-বুখারী*, পৃ. ৩৫৩।
৪০২. তদেব, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪।

(৩) মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেই সমান জ্ঞান ও মর্যাদার অধিকারী নয়। কিছু কমবেশী থাকেই। এমনকি নবীদের মধ্যে এমন তফাৎ ছিল। তেমনিভাবে মুহাদ্দিছদের মধ্যেও সব ধরণের ব্যক্তি ছিলেন। যাদের কেউ ছিলেন নরমপন্থী, কেউ মধ্যমপন্থী আবার কেউ কট্টরপন্থী। ফলে ইমাম আল-ই‘জলী, ইবনু হিব্বান অপরিচিত রাবীদের ছিকাহ ঘোষণা করা বিষয়ে নরমপন্থা অবলম্বন করেছেন। অনুরূপভাবে ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম হাকিমও রাবীদের প্রতি অধিক সুধারণা রাখতেন। অপরদিকে ইমাম আহমাদ, ইমাম দারাকুৎনী, ইবনু আদী প্রমুখ ছিলেন মধ্যমপন্থী। আবার ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, আবূ হাতিম আর-রাযী, ইমাম নাসাঈ প্রমুখ জারাহ করার ক্ষেত্রে অতিশয় কট্টরপন্থা এবং সতর্কতা অবলম্বন করতেন।[৪০৩]

এ সকল কারণে রাবীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য কিছু হয়েছে। কিন্তু বিভক্তি নিরসন এবং সমন্বয় সাধনের জন্য মুহাদ্দিছগণ যথাযথ নীতি অবলম্বন করেছেন। ‘জারাহ মুফাস্‌সার’ (ত্রুটির বিস্তারিত বিবরণ), ‘তা‘দীল মুফাস্‌সার’ (ন্যায়পরায়ণতার বিস্তারিত বিবরণ) প্রভৃতি পরিভাষা এজন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং জারাহ ও তা‘দীলের ক্ষেত্রে মতভেদ থাকলেও তা নিষ্পত্তির জন্য মুহাদ্দিছদের নিকট নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাও রয়েছে।

ছ. ইমাম বুখারী যাদের নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন, এমন ছয়শ মুহাদ্দিছ থেকে ইমাম মুসলিম হাদীছ গ্রহণ করেন নি– এই মন্তব্য মুহাদ্দিছদের নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফসল। মুহাদ্দিছগণ সর্বদা চাইতেন উচ্চতর সনদে হাদীছ বর্ণনা করার জন্য। অথবা ইতিপূর্বে যে সনদ থেকে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা ভিন্ন অন্য কোন সনদে হাদীছটি বর্ণনা করার জন্য। এতে সূত্র সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, হাদীছটির নিশ্চয়তাও তত বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং ইমাম বুখারী গৃহীত ছয় শত মুহাদ্দিছ থেকে ইমাম মুসলিম হাদীছ বর্ণনা না করার অর্থ এই নয় যে, তিনি তাদের পরিত্যাজ্য মনে করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী তাঁর গ্রন্থে ইমাম শাফেঈ থেকে একটি হাদীছও বর্ণনা করেন নি। এর অর্থ এই নয় যে তিনি তাঁকে পরিত্যাজ্য মনে করেছেন। বরং সনদের উচ্চতা সন্ধান কিংবা নতুন নতুন সনদ সন্ধানের জন্য তাঁরা অনেক সময় পূর্ব উদ্ধৃত বর্ণনাকারীদের সনদ পুনরাবৃত্তি করতেন না।

জ. ড. আহমাদ আমীন সহ কতিপয় লেখক জারাহ-তা‘দীলের এই মতভেদকে মুহাদ্দিছদের মাযহাবী দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্যের ফলাফল হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন।

---

৪০৩. আস-সাখাভী, *ফাতহুল মুগীছ*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৬০।

এর জবাবে আস-সিবাঈ (১৯৫৬খ্রি.) বলেন, জারাহ ও তা'দীল কখনও ব্যক্তিগত বিরোধ কিংবা মাযহাবী মতপার্থক্যের ওপর ভিত্তিশীল ছিল না। মুহাদ্দিছগণ শুধু মাযহাবী গোঁড়ামির কারণে কখনও বিরোধী ফিরকাসমূহের রাবীদের প্রত্যাখ্যান করেন না। তাদের মতপার্থক্যের ভিত্তি ছিল কেবলমাত্র রাবীর সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও ফাসিকী এবং তার সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং ভুলপ্রবণতা সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। এজন্য দেখা যায় হাদীছের কিতাব সমূহে এমনকি ছহীহাইন গ্রন্থদ্বয়েও অনেক বিদআতী ব্যক্তির বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে, কেননা তাদের সত্যবাদিতা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিদ'আতী হওয়া সত্ত্বেও তাদের বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা হয় নি। যেমন : খারিজী রাবী ঈমরান ইবনু হিত্ত্বান (৮৪হি.) এবং শী'আ রাবী আবান ইবনু তাগাল্লুব (১৪১হি.)।[৪০৪] সুতরাং জারাহ-তা'দীলের পশ্চাতে কোন মাযহাবী বিদ্বেষ, দুরভিসন্ধি বা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের কোন বিষয় ছিল না।

ঝ. বিদ্বানদের গৃহীত জারাহ ও তা'দীলের নীতিমালা যদি কেউ অধ্যয়ন করেন তবে স্পষ্ট বুঝতে পারবেন যে, জারাহ-তা'দীলের ক্ষেত্রে যে কারো মন্তব্য সরাসরি গৃহীত হয় না। যে সকল বিদ্বানের মন্তব্যকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় তাদের মধ্যেও স্তরভেদ করা হয়েছে- (১) কট্টরপন্থী (২) মধ্যমপন্থী এবং (৩) নরমপন্থী। সুতরাং যখন কোন মন্তব্য পরস্পরবিরোধী হয়, তখন সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে তার মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকারযোগ্য তা চিহ্নিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি ক্ষেত্রে এত সূক্ষ্ম নীতিমালার ব্যবহার করা হয়েছে যে, কেউ কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে মন্তব্য করলেও তা সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব। এজন্য আয-যাহাবী (৭৪৮হি.) মন্তব্য করেন, لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة 'এই বিষয়ে (জারাহ ও তা'দীল) বিদ্বানদের মধ্যে এমন দু'জন বিদ্বানকে পাওয়া যাবে না যারা কোন দুর্বল রাবীকে নির্ভরযোগ্য কিংবা কোন শক্তিশালী রাবীকে যঈফ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।'[৪০৫] অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি বাস্তবে 'যঈফ' হয়ে থাকেন তবে তার ব্যাপারে এমন দু'জন বিদ্বান পাওয়া যাবে না যারা তাকে বাস্তবতার বিপরীতে 'নির্ভরযোগ্য' বলেছেন, আবার যদি কোন ব্যক্তি বাস্তবে 'ছিকাহ' বা শক্তিশালী হয়ে থাকেন, তবে এমন দু'জন বিদ্বান পাওয়া যাবে না যারা বাস্তবতার বিপরীতে তাকে 'যঈফ' বলেছেন। সুতরাং

---

৪০৪. আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ২৬৭-২৬৮।
৪০৫. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, *নুযহাতুন নাযার*, পৃ. ১৩৮।

কোন ক্ষেত্রে যদি মতভেদ হয়েও থাকে, তবে সেখানে সঠিক মতটিও চিহ্নিত করার ব্যবস্থাপনা রয়েছে।

অতএব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, মুহাদ্দিছদের মধ্যে হাদীছ গ্রহণের মৌলিক শর্তাবলীসমূহ নিয়ে কোন মতভেদ নেই। যে সব মতভেদ রয়েছে, তা শাখাগত মতভেদ এবং সমাধানযোগ্য। আর তারা যে সকল হাদীছকে ছহীহ বলেন তা মৌলিক সকল শর্ত পূরণ করার পরই ছহীহ হিসাবে আখ্যায়িত হয়। এতে কারও কোন ব্যক্তিগত মতের স্থান নেই যে তাকে ইজতিহাদী মত আখ্যায়িত করে পরিত্যাগ করার সুযোগ রয়েছে, যেমনটি অনেকে ধারণা করে থাকেন। কেননা তা সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কোন ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তিশালী দলীল উপস্থিত হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছদের সিদ্ধান্ত ভুলও প্রমাণিত হ'তে পারে। সেক্ষেত্রে শক্তিশালী দলীলেরই অনুসরণ করতে হবে, যদি কেউ পরবর্তীতে তা চিহ্নিত করতে পারেন। অর্থাৎ হাদীছ শাস্ত্র পুরোটাই দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে কোন মুহাদ্দিছ বা ইমামের অন্ধানুসরণ করা হয় না যদি তার ভুল প্রমাণিত হয়, এমনকি তিনি যদি ইমাম মালিকের মত বিখ্যাত মুহাদ্দিছও হন। আর এই দলীলের মজবুত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণেই অদ্যাবধি হাদীছ গবেষণা সুনির্দিষ্ট নীতি মোতাবেক চলমান রয়েছে। মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আল-আলবানী (১৯৯৯খ্রি.), শু'আইব আল-আরনাঊত্ব প্রমুখ মুহাদ্দিছদের নিরবচ্ছিন্ন হাদীছ গবেষণা এর পক্ষে জোরালো সাক্ষ্য প্রদান করে।

ঞ. আবুল আ'লা মওদূদী প্রমুখ ব্যক্তিত্বগণ মুহাদ্দিছদের প্রতি যে যুক্তিতে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন, তা কোন ইলমী দৃষ্টিকোণ থেকে বলেন নি, বরং ব্যক্তিগত কিছু দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন মাত্র। তাঁদের এই সন্দেহের জবাবে ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (১৯৪৮খ্রি.) বলেন, যদি কোন বিচারক আদালতে কোন আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষীদের মতামত বিশ্লেষণ করার পর আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং শাস্তি প্রদান করেন, সেক্ষেত্রে এ কথা বলা কি যুক্তিসংগত হবে যে, এই সাক্ষীদের মতামত প্রবল ধারণাভিত্তিক এবং এতে ভুলের সম্ভাবনা আছে, সুতরাং আদালতের এই বিচার গ্রহণযোগ্য নয়? দ্বিতীয়ত, কাউকে যদি বিচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়, তাহ'লে তিনি চুরি, যেনা, হত্যা প্রভৃতি অপরাধে আসামীদের বিচারকার্য কিসের ভিত্তিতে পরিচালনা করবেন? সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে না কি নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি ও অভিরুচির ভিত্তিতে? নিঃসন্দেহে সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে। কেননা আল্লাহ্‌র আইনেও যেমন বিচারকার্য সাক্ষ্য-

প্রমাণ ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি পৃথিবীর কোন আইনেও সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনার কোন মূল্য নেই। ঠিক একইভাবে মুহাদ্দিছদের নীতিমালাও সর্বজনগ্রাহ্য সাক্ষ্য আইনের মত নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত। এখানে ব্যক্তির নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগের সুযোগ নেই।[৪০৬] বরং মুহাদ্দিছদের নীতিমালা সাক্ষ্য আইনের চেয়ে অনেক বেশী কঠিন এবং শক্তিশালী। কেননা বহু সাক্ষী আছে যারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে। কিন্তু মুহাদ্দিছরা কেবল বর্ণনাকারীকে বিশ্বস্ত পেলেই তার বর্ণনার উপর নির্ভর করতেন না। বরং নানা দিক থেকে বর্ণনাকারী ও তার বর্ণনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়ার পরই তা গ্রহণ করতেন।[৪০৭]

দ্বিতীয়ত, যদি এই মতের প্রবক্তাগণের দাবী অনুযায়ী হাদীছ ছহীহ ও যঈফ নির্ধারণের জন্য যদি 'ব্যক্তিগত অভিরুচি' ব্যবহার করা হয়, তবে বিশেষ কোন ব্যক্তির অভিরুচিকে তারা গ্রহণযোগ্য মনে করবেন? এই অভিরুচির কায়দা-কানূন কী হবে? কেননা একজনের অভিরুচি অপরজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়াই স্বাভাবিক। ব্যক্তি ও পরিবেশ ভেদে প্রতিটি যুগে এই অভিরুচির পরিবর্তন হবেই। সুতরাং এই দাবী গ্রহণ করা হ'লে হাদীছসমূহ মানুষের ব্যক্তিগত অভিরুচির ফাঁদে আটকা পড়ে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং ইতিহাসের সম্পদে পরিণত হবে। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন দল ও মতের দ্বন্দ্বকে কেবল প্রত্যেকের 'ব্যক্তিগত অভিরুচি' বলে বৈধতা প্রদান করতে হবে। সুতরাং কেউ কাউকে বলতে পারবে না যে, অমুক কর্মটি বৈধ নয়, কেননা সেটি হাদীছের খেলাফ। কেননা প্রত্যেকেই যার যার অভিরুচি মোতাবেক স্বাধীনভাবে হাদীছ গ্রহণ করবেন এবং বর্জন করবেন। যেহেতু কার অভিরুচি সঠিক না ভুল, তা নির্ণয়ের কোন সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদী নিজেই এই বাস্তবতা স্বীকার করেছেন।[৪০৮] সুতরাং এই মত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আমরা বলব, এই মতের প্রবক্তাদের বক্তব্য কুরআনে বর্ণিত মুশরিকদের এই দাবীর মতই যেখানে বলা হয়েছে- قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا

৪০৬. মুহাম্মাদ মুরতাযা ইবনু আয়েশ মুহাম্মাদ, *আশ-শায়খ ছানাউল্লাহ আল-অমৃতসরী ওয়া জুহূদুহুদ দা'আভিয়াহ* (অপ্রকাশিত এম.এ. থিসিস) (রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬খ্রি.), পৃ. ২৮৭-২৯০।

৪০৭. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০।

৪০৮. মুহাম্মাদ মুরতাযা, *আশ-শায়খ ছানাউল্লাহ আল-অমৃতসরী ওয়া জুহুদুহুদ দা'আভিয়াহ*, পৃ. ২৯০।

وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ‘তারা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। আর পরম করুণাময় তো কিছুই অবতীর্ণ করেন নি। তোমরা শুধু মিথ্যেই বলছ।’[৪০৯] অর্থাৎ মুশরিকরা যেমন নবীদেরকে মিথ্যুক বলতে চেয়েছে এই যুক্তিতে যে তারাও তাদের মত মানুষ, ঠিক একইভাবে তারাও মুহাদ্দিছগণের ভুল হওয়াকে অপরিহার্য করতে চাইছেন, এই যুক্তিতে যে তাঁরাও মানুষ। আর এই সম্ভাবনার কারণে মুহাদ্দিছরা দলীলভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে কোন হাদীছ ছহীহ ও যঈফ নির্ণয় করার পরও তাঁরা দাবী করেন যে, এগুলি তাদের নিকট বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমাদের প্রশ্ন হ’ল, এছাড়া আর কোন নীতিমালা অবলম্বন করলে তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবেন? [৪১০] যদি তাঁদের দাবী মোতাবেক ‘ব্যক্তিগত অভিরুচি’ ভিত্তিক কোন বিকল্প নীতিমালা সত্যিই থেকে থাকে, তবে তার অস্তিত্ব কোথায়? যদি সত্যিই এমন ব্যবস্থাপনা যুক্তিসঙ্গত ও নিরাপদ হ’ত, তবে মুহাদ্দিছগণ নিশ্চিতভাবে তা অবলম্বন করতেন। কেননা হাদীছ সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য এমন কোন উপায় নেই, যা তারা ব্যবহার করেন নি।

---

৪০৯. সূরা ইয়াসীন, আয়াত : ১৫।

৪১০. ইবনু তায়মিয়া (৭২৮হি.) ইসনাদ এবং রেওয়ায়েত ভিত্তিক মুহাদ্দিছদের নীতিমালার প্রতি আনাস্থাশীল তৎকালীন রাফিযীদের অবস্থান সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা এই মতাবলম্বীদের সাথে অনেকটা মিলে যায়। তিনি বলেন, وهم في ذلك شبيه باليهود والنصارى، فإنه ليس لهم إسناد. والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. والرافضة من أقل الناس عناية ، إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم، وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم। দ্র. ইবনু তায়মিয়া, *মিনহাজুস সুন্নাহ আন-নাবাভিয়াহ*, ৭ম খণ্ড. পৃ. ৩৭।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

প্রাচ্যবাদী সমালোচনা

প্রাচ্যবাদের[৪১১] উৎপত্তিকাল নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক রয়েছে। তবে অনুমান করা হয় ক্রুসেড যুদ্ধের পর খৃষ্টীয় ১২৯৫ কিংবা ১৩১২ সালে ভিয়েনা চার্চ

---

৪১১. প্রাচ্যবাদ হ'ল পশ্চিমা পণ্ডিতদের একটি জ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প, যা প্রাচ্য তথা মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ, আরব বিশ্ব, দক্ষিণ এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর ভাষা-সাহিত্য, শিল্প-কলা, ইতিহাস-সংস্কৃতি, ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে গবেষণার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। সহজ কথায় প্রাচ্য বিষয়ক জ্ঞানচর্চার নাম হ'ল প্রাচ্যবাদ। তাছাড়া বিশ্বপ্রেক্ষাপটে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের তুলনামূলক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনকেও বলা হয় প্রাচ্যবিদ্যা বা প্রাচ্যচর্চা (*বাংলাপিডিয়া*, অনলাইন সংস্করণ, ভুক্তি-'প্রাচ্যবিদ্যা' (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ : ২০১২খ্রি.)। এডওয়ার্ড সাঈদ বলেন, Anyone who teaches, writes about, or researches the Orient is an Orientalist, and what he or she does is Orientalism 'প্রত্যেক যে ব্যক্তি প্রাচ্য সম্পর্কে শিক্ষাদান করে, লেখে এবং গবেষণা করে তিনিই প্রাচ্যবিদ এবং তার কর্মকাণ্ডকে বলা হয় প্রাচ্যবিদ্যা (*Orientalism* (Newyork : Vintage books, 1979), p.2)।' তবে প্রাচ্যবাদের রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে এডওয়ার্ড সাঈদ অপর সংজ্ঞাটি দিয়েছেন এভাবে- Orientalism as a Western style for dominating, restucturing, and having authority over the Orient 'প্রাচ্যবিদ্যা হ'ল প্রাচ্যের ওপর আধিপত্য করা, প্রাচ্যকে পূনর্গঠন করা এবং প্রাচ্যের ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য একটি পশ্চিমা স্টাইল বা ধরণ (p.3)।' প্রাচ্যবাদ পশ্চিমাদের প্রাচ্য সম্পর্কে একাডেমিক গবেষণা হ'লেও তা একাডেমিক উদ্দেশ্যের বাইরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারেরও বড় মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষত মুসলিম বিশ্বের জন্য এই গবেষণা ইসলামের ইতিহাস ও তার মৌলিক বিশ্বাসসমূহের প্রতি আঘাত হানার একটি কৌশল হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে। কেননা ইসলাম সম্পর্কে তারা যে গবেষণা ও মূল্যায়ন করে থাকেন, তাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিকৃত ও আরোপিত ধারণা প্রদান করা এবং মুসলমানদেরকে তাদের মৌলিক বিশ্বাস ও দর্শন সম্পর্কে সন্দিহান করার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। আর তাদের এই তৎপরতার প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়েছে ইসলামের মূল ভিত্তি তথা কুরআন ও হাদীছ। মুসলিম সমাজে হাদীছ অস্বীকার চিন্তাধারার সূচনাতে প্রাচ্যবিদদের অবদান অনেক (দ্র. ড. মুহাম্মাদ সিবাঈ, আল-*ইসতিশরাক্ব ওয়াল মুসতাশরিকুন : মা লাহুম ওয়ামা আলাইহিম* (কায়রো : দারুল ওয়ার্‌রাক্ব (১ম প্রকাশ ১৯৬৮খ্রি.); ড. উজাইল জাসিম আন-নাশমী, *আল-মুসতাশরিকূন ওয়া মাছাদিরুত তাশরী' আল-ইসলামী* (কুয়েত : আল-মাজলিসুল ওয়াত্বানী লিছ ছাকাফাহ ওয়াল ফুনূন, ১৯৮৪খ্রি.); ড. মাহমূদ হামদী যুক্বযুক্ব, *আল-ইসতিশরাক ওয়াল-খালফিয়াহ আল-ফিকরিয়াহ লিছ ছুরা' আল-হাযারী* (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৯৭খ্রি.); ড. মুহাম্মাদ ফাতহুল্লাহ আয-যিয়াদী, *আল-ইসতিশরাক : আহদাফুহু ওয়া ওয়াসাইলুহু* (দামিশক : দারু কুতাইবাহ, ১৯৯৮খ্রি.); ড. সাসী সালিমু হাজ্জ,

কাউন্সিলের মাধ্যমে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন হিসেবে প্রাচ্যবাদের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ঘটে পশ্চিমা বিশ্বে। তবে পনের শতকের শেষদিকে এসে তা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো লাভ করে।[৪১২] সেই হিসেবে পশ্চিমা গবেষকদের হাদীছ সংক্রান্ত গবেষণা বেশ পরেই শুরু হয়েছে। কেননা অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের পূর্ব পর্যন্ত তাঁদের এ সংক্রান্ত কোন গবেষণা পরিলক্ষিত হয়নি। প্রশ্ন হ'ল, হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ে মুহাদ্দিছগণ এত সুক্ষ্ম গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন এবং শত শত বছর অতুলনীয় নিষ্ঠার সাথে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ব্যয় করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক বিস্ময় সৃষ্টি করার পরও পশ্চিমা চিন্তাবিদরা কেন হাদীছের প্রতি প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন? এর পিছনে রাজনৈতিক স্বার্থই যে ক্রিয়াশীল, তার প্রমাণ হ'ল, প্রাচ্যবিদ্যা যখন একটি ধর্মীয় এবং মিশনারী ভূমিকায় ছিল, তখন প্রাচ্যবিদদের মধ্যে হাদীছের উপর গবেষণার প্রবণতা দেখা যায়নি। কিন্তু উপনিবেশবাদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজন যখন দেখা দিল, তখন মুসলিম সভ্যতার বিকাশে এবং তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যে ও সমাজ-সংস্কৃতিতে হাদীছের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করে তারা রাতারাতি এ সংক্রান্ত গবেষণায় ঝুঁকে পড়ল।[৪১৩] অর্থাৎ ইসলামের মূল নৈতিক শক্তি এবং আদর্শিক অবস্থানকে দূর্বল করার মাধ্যমে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে রাজনৈতিক স্বার্থ তথা উপনিবেশবাদের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা পশ্চিমাদের হাদীছ গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ছিল, যা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এজন্য ডাচ প্রাচ্যবিদ Arent Jan Wensinck (১৮৮২-১৯৩৯খ্রি.) স্পষ্টই বলেন, The secret of Islam came to a small suburban community turning into a being a universal religion in a short time and right after that into a political organization that dominates more than half of the civilized world, is bedded in the analysis of Hadithes 'একটি শহরতলীর বাসিন্দাদের মধ্যে আগমণের পর স্বল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম কিভাবে একটি সার্বজনীন ধর্মে পরিণত হ'ল এবং তারপর কিভাবে এমন একটি রাজনৈতিক সত্ত্বা হিসাবে

আয-যাহিরাতুল ইসতিশরাকিয়া ওয়া আছরুহা ফীদ দিরাসাত আল-ইসলামিয়াহ (বৈরূত : দারুল মাদার আল-ইসলামী, ২০০২খ্রি.); আব্দুল ওয়াহিদ আব্দুল কাহ্হার, *আল-ইসতিশরাক্ব ওয়াদ দিরাসাত আল-ইসলামিয়াহ* (আম্মান : দারুল ফুরক্বান, ২০০১খ্রি.)।

৪১২. ড. মাহমূদ হামদী যুক্বযুক্ব, *আল-ইসতিশরাক ওয়াল-খালফিয়াহ আল-ফিকরিয়াহ লিছ ছুরা' আল-হাযারী*, পৃ. ১৮; Mehmet Görmez, Article : *What Directed The Classic Orientalism Into Hadith Research* (The Muslim World, U.S.A, 2006), p. 1.

৪১৩. Mehmet Görmez, Article : *What Directed The Classic Orientalism Into Hadith Research*, p. 24.

দাঁড়িয়ে গেল যে ইসলাম সভ্য পৃথিবীর অর্ধেকের বেশী অঞ্চলের ওপর আধিপত্য কায়েম করল, তার রহস্য নিহিত রয়েছে হাদীছের মধ্যে।’[৪১৪] সুতরাং হাদীছ কেন প্রাচ্যবাদের বিশেষ লক্ষ্যবস্তু হ’ল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তারের অভিলাষ থেকে এই ভিন্নধারার যে যুদ্ধের সূচনা হয়, তা الغزو الفكـــري বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ[৪১৫] হিসেবে পরিচিত। ক্রুসেড যুদ্ধের পর শুরু হওয়া এই ছায়া যুদ্ধ আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে। এডওয়ার্ড সাঈদ (১৯৩৫-২০০৩খ্রি.) তাঁর বহুল প্রসিদ্ধ Orientalism গ্রন্থে দেখিয়েছেন জ্ঞান এবং ক্ষমতার লড়াই কিভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হতে পারে এবং প্রাচ্যবাদী গবেষণার যোগসূত্র কতটা জ্ঞানের সাথে আর কতটা সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের সাথে। তিনি বলেন, knowledge gives power, more power requires more knowledge, and so on in an increasingly profitable dialectic of information and control. অর্থাৎ ‘জ্ঞান ক্ষমতা যোগায়। অধিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন অধিক জ্ঞানের। এই প্রক্রিয়াই ক্রিয়াশীল রয়েছে তথ্য এবং ক্ষমতা অর্জনের এই ক্রমবর্ধনশীল লাভজনক বিতর্কে’।[৪১৬]

প্রাচ্যাবিদদের ইসলাম সংক্রান্ত গবেষণার কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে।[৪১৭] কিন্তু এর বিদ্বেষপূর্ণ এবং অসৎউদ্দেশ্য প্রণোদিত দিকটিই অধিক

---

৪১৪. দ্র. Wensicnck, *The Importance of Tradition for the Study of Islam*, Muslim World XI (1921), p.241, in Mehmet Görmez, Article : *What Directed The Classic Orientalism Into Hadith Research*, p. 10.

৪১৫. দ্র. ড. আলী জারীশাহ ও মুহাম্মাদ শরীফ আয-যায়বাক্ব, *আসালিবুল গুযু আল-ফিকরী* (মদীনা, দারুল ই‘তিছাম, ৩য় প্রকাশ : ১৯৭৯ খ্রি.); ড. আলী আব্দুল হালীম মাহমূদ, *আল-গুযুউউল ফিকরী ওয়াত তাইয়ারাতুল মু‘আদিয়াহ লিল ইসলাম* (রিয়ায : ইদারাতুছ ছাক্বাফাহ ওয়ান নাশর বি জামি‘আতিল ইমাম, ১৯৮১ খ্রি.), ড. মুহাম্মাদ ইবরাহীম আল-ফায়ূমী, *আল-ইসতিশরাকু রিসালাতুল ইসতি‘মার* (কায়রো : দারুল ফিকরিল আরাবী, ১৯৯৩ খ্রি.), আব্দুর রহমান আল-মায়দানী, *আজনিহাতুল মাকর আছ-ছালাছাহ* (দামেশক : দারুল কলম, ৮ম প্রকাশ : ২০০০ খ্রি.)।

৪১৬. Edward W. Said, *Orientalism*, p.36

৪১৭. যেমন–হাদীছ ডিকশনারী রচনা, বহু প্রাচীন ইসলামী গ্রন্থাবলীর অনুসন্ধান ও পাঠোদ্ধার প্রভৃতি (দ্র. ড. মুহাম্মাদ সিবাঈ, আল-*ইসতিশরাক্ব ওয়াল মুসতাশরিকুন : মা লাহুম ওয়ামা আলাইহিম*, পৃ. ৩১-৩৩; মুহাম্মাদ আওনী আব্দুর রউফ, *জুহূদুল মুসতাশরিক্বীন ফিত তুরাছ আল-আরাবী বাইনাত তাহক্বীক ওয়াত তারজামাহ* (কায়রো : মাজলিসুল

দৃশ্যমান হয়। জ্ঞানচর্চার পোষাকে প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার চেয়ে এই সকল প্রাচ্যবিদগণ বিশেষ আদর্শিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থকেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ড. জোনাথন ব্রাউন (জন্ম : ১৯৭৭খ্রি.) বলেন, Western discussions about the reliability of the hadith tradition are thus not neutral, and their influence extends beyond the lofty halls of academia. The Authenticity Question is part of a broader debate over the power dynamic between 'Religion' and 'Modemity' and between 'Islam' and 'the West' 'হাদীছের নির্ভরযোগ্যতার আলোচনায় পশ্চিমাদের বিতর্ক মোটেও নিরপেক্ষ নয়। এর প্রভাব সুউচ্চ প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডি পেরিয়ে আরও বহুদূর বিস্ত ৃত। হাদীছের প্রামাণিকতার এই প্রশ্ন মূলত ধর্ম বনাম আধুনিকতা এবং ইসলাম বনাম পাশ্চাত্য-এর মধ্যে কর্তৃত্বশীলতার লড়াইয়ে এক বৃহত্তর বিতর্কের অংশ।'[৪১৮] তিনি পশ্চিমাদের অযাচিত হস্তক্ষেপের সমালোচনা করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, The Hadith tradition is so vast and our attempts to evaluate its authenticity so inevitably limited to small samples, that any attitude towards its authenticity are necessarily based more on our critical worldview than on empirical fact 'হাদীছশাস্ত্রের গণ্ডি এত সুবিস্তৃত এবং এর প্রামাণিকতা মূল্যায়নে আমাদের (পশ্চিমাদের) প্রচেষ্টা এত অনিবার্যভাবে সামান্য কিছু নমুনার উপর সীমাবদ্ধ যে, এর বিশুদ্ধতা নিরূপণে আমাদের যাবতীয় চিন্তা-চেতনা গবেষণামূলক সত্যের চেয়ে কার্যত সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির উপর অধিকতরভাবে প্রতিষ্ঠিত।'[৪১৯]

অনুরূপভাবে Marshall G. S. Hodgson (১৯২২-১৯৬৮খ্রি.) দেখিয়েছেন যে, মুসলিম পণ্ডিতদের গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করা ও তার ফলাফলসমূহ পশ্চিমা সমাজে প্রয়োগ করার মাধ্যমে আধুনিক পশ্চিমা

আ'লা লিছ ছাক্বাফাহ, ২০০৪ খ্রি.); ড. রায়েদ আমীর আব্দুল্লাহ, প্রবন্ধ : *আল-মুসতাশরিকূন আল-আলমান ওয়া জুহূদুহুম তুজাহাল মাখতুতাত আল-আরাবিয়াহ আল-ইসলামিয়াহ* (মূছেল বিশ্ববিদ্যালয়, ইরাক : মাজাল্লাতু কুল্লিয়াতিল উলূমিল ইসলামিয়াহ, ৮ম বর্ষ, ১/১৫তম সংখ্যা, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৫৮-২৯৪।

৪১৮. Jonathan AC Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World* (London : Oneworld Publications, 2009), p. 198.

৪১৯. Jonathan AC Brown, *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*, p. 198.

গবেষণার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে বিশেষত ইস্তাম্বুলে ইসলামী খিলাফতের চূড়ান্ত পতনের পর এই ধারার পরিবর্তন হল এবং পাশ্চাত্যের গবেষকগণ মুসলিম বিদ্বানদের গবেষণার ফলাফল উল্টিয়ে তার উপর নিজেরা প্রশ্ন উত্থাপন করতে লাগল এবং নিজেরাই উত্তর প্রদান করতে লাগল।[৪২০]

পশ্চিমা গবেষকদের ইসলামের প্রাথমিক যুগ সম্পর্কিত গবেষণা ধারা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, মূলত তিনটি বিষয়কেন্দ্রিক তা আবর্তিত হয়েছে। হাদীছ সংকলন, ফিকহী মাযহাবসমূহের আবির্ভাব এবং রাসূল (ছা.)-এর যুগ থেকে আব্বাসীয় খেলাফত পর্যন্ত মুসলমানদের রাজনৈতিক পরিক্রমা। ইতিহাস এবং সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা পদ্ধতি সামনে রেখে তারা এ সকল গবেষণা চালিয়েছেন। হাদীছ সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে তারা মূলত দু'টি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন–

১. হাদীছ শাস্ত্র ত্রুটিপূর্ণ এবং বানোয়াট। এর বিশুদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ। যেহেতু রাসূল (ছা.)-এর মৃত্যুর পর ১০০ বছর ব্যাপী সময়কাল পর্যন্ত হাদীছ সংরক্ষণের কোন লিখিত দলীল নেই, সেহেতু হিজরী ২য় ও ৩য় শতকে মুহাদ্দিছদের সংকলিত হাদীছসমূহের সাথে নবী মুহাম্মাদ (ছা.)-এর কোন সম্পর্ক নেই। বরং যাবতীয় হাদীছ তাঁর উপর বানোয়াটভাবে আরোপিত হয়েছে।

২. ইসলামী আইনে হাদীছের কোন প্রামাণিক ভিত্তি নেই। নবী মুহাম্মাদ (ছা.)-এর জীবদ্দশায় ইসলামী আইনের কাঠামোগত অস্তিত্ব ছিল না। বরং পরবর্তী সময়ে ইসলামপূর্ব জাহেলী যুগের রীতিনীতি, ভীনদেশীয় রোমান ও ইহুদী আইন-কানূন এবং উমাইয়া খলীফাদের নিজস্ব আচার-সংস্কৃতি থেকে পর্যায়ক্রমে ইসলামী আইনের জন্ম হয়েছে।

অর্থাৎ ইসলামী আইন কোন এলাহী সূত্র থেকে আসেনি বা কোন মৌলিক আইনও নয়। বরং বিজাতীয় আইন-কানুনই ইসলামী আইনের উৎস। ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি, আইন ও বিচার, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সবকিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যহীন, ইসলাম একটি ভিত্তিহীন ধর্ম ও বিশ্বাস, মুসলিম বিদ্বানগণ অগভীর চিন্তার অধিকারী এবং তাদের অনুসৃত নীতিমালা সবই ইহুদী-খৃষ্টানসহ তৎকালীন বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতা থেকে ধার করা–এ সবই হ'ল পশ্চিমী পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত সাধারণ ধারণা।

---

৪২০. Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam* (London : The University of Chicago Press, Ltd., 1974), Vol. 1. p. 40-41).

প্রাচ্যবিদগণ হাদীছ সমালোচনার ক্ষেত্রে মূলত দু’টি দিক বেছে নিয়েছেন। (১) হাদীছের মতন সমালোচনা, যার পুরোধা ছিলেন হাঙ্গেরিয়ান গবেষক Ignaz Goldziher (১৮৫০-১৯২১)[৪২১] এবং (২) হাদীছের

---

৪২১. হাঙ্গেরীতে জন্মগ্রহণকারী এই ইহুদী ধর্মাবলম্বী প্রাচ্যবিদকে আধুনিক প্রাচ্যবাদী ইসলাম গবেষণার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করা হয়। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি লেখনীর জগতে আসেন। অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় হাঙ্গেরীর এক মন্ত্রীর সহযোগিতায় প্রথমে বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, পরে জার্মানীর বার্লিন ও লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং হল্যাণ্ডের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ লাভ করেন। পড়াশোনা শেষে কিছুদিন বুদাপেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পর ১৮৭৩ সালে তিনি হাঙ্গেরী সরকারের তত্ত্বাবধানে সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিসর ভ্রমণ করেন। এসময় তিনি সিরীয় আলেম তাহের আল-জাযায়েরী এবং কায়রোয় আল-আজহার বিশ্ববিদ্যলয়ের মসজিদে খ্যাতনামা আলেমদের আলোচনায় উপস্থিত হন। অতঃপর দেশে ফিরে তিনি পুণরায় শিক্ষকতায় যুক্ত হন এবং ইসলামী আইন ও ইসলামপূর্ব আইন সম্বন্ধে দীর্ঘ গবেষণা ও লেখালেখি শুরু করেন। অচিরেই তাঁর লেখনীসমূহ প্রভূত খ্যাতি অর্জন করে। ফলে তিনি বিভিন্ন আন্তজার্তিক সম্মেলনে হাঙ্গেরী সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন। এছাড়া কয়েকটি আন্তর্জাতিক বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্থার সদস্য নির্বাচিত হন এবং বুদাপেস্টে ইহুদী কমিউনিটির সেক্রেটারী হিসাবে মনোনায়ন লাভ করেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিগ্রি প্রদান করে। ১৮৯০ সালে জার্মান ভাষায় তাঁর দুই খণ্ডে রচিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ *Muhammedanische Studien* (Muslim Studies) প্রকাশিত হয়। এতে হাদীছ এবং ইসলামী আইন সম্পর্কে ভিন্ন ধারার আলোচনা উপস্থাপন করে তিনি তুমুল বিতর্কের জন্ম দেন। এ সকল গ্রন্থ ও প্রবন্ধ দ্বারা সর্বাত্মকভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ইসলাম স্রষ্টা প্রদত্ত ধর্ম বিশেষ নয়, বরং কালের বিবর্তনে গড়ে ওঠা বহু ধর্ম ও সভ্যতার একটি ধারাবাহিক ও সংমিশ্রিত রূপ। ইহুদীবাদের স্বভাবজাত হিংসাত্মক মনোবৃত্তি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর লেখনীতে। এতদসত্ত্বেও তিনি অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সদয় আচরণসহ ইসলামের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করেছেন। প্রথম জীবনে তিনি মুসলিম দেশসমূহ ভ্রমণকালে ইসলামের প্রতি এতটাই মুগ্ধ হন যে মনে মনে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলেন, এমনকি কায়রোর এক মসজিদে জুমআর ছালাতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু নিজ ধর্মের প্রতি প্রবল আনুগত্যবোধ তাঁকে শেষ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরীতে *(এ্ধমবনঁপয, ১৯৭৮)* লিখেছেন, ‘সেই সপ্তাহগুলোতে আমি ইসলামের মধ্যে এতটাই ঢুকে পড়েছিলাম যে আমি ভিতরে ভিতরে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, আমি একজন মুসলিম। আমি প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে আবিষ্কার করেছিলাম যে, এটিই একমাত্র ধর্ম যা তত্ত্বগতভাবে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে যে কোন দার্শনিক মনকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আমার আদর্শিক লক্ষ্য ছিল ইহুদী ধর্মকেও অনুরূপ একটি যৌক্তিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। অভিজ্ঞতা আমাকে যতটুকু শিখিয়েছে, তার ভিত্তিতে বলতে পারি, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যাতে কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকতার উপাদানসমূহের প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা হয়েছে। সেটা যুক্তিবাদের দ্বারা নয়, বরং প্রথাগত ধর্মীয় মূলনীতির দ্বারাই’ *(Martin Kramer, The Jewish Discovery of Islam,Tel Aviv: The Moshe Dayan Center, 1999)*| 1921 সালে বুদাপেস্টেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থসমূহ হল– On the History of

ইসনাদ সমালোচনা, যার পুরোধা ছিলেন বৃটিশ-জার্মান গবেষক Joseph Schacht (১৯০২-১৯৬৯)[৪২২]। এতদ্ব্যতিত আরও অনেক গবেষক হাদীছের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তবে চিন্তাগতভাবে তারা সকলেই এই দু'জনের অনুসারী অথবা সমালোচক কিংবা মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। আমরা এখানে হাদীছের মতন ও ইসনাদসংক্রান্ত তাদের মৌলিক কয়েকটি আপত্তি পর্যালোচনা করব।

Grammar Among the Arabs: An Essay in Literary History (1878), The Ẓāhirīs: Their Doctrine and Their History (1883), Mohammed and Islam (1910), Introduction to Islamic Theology and Law (1921) প্রভৃতি। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : নাজীব আল-আক্বীক্বী, *আল-মুসতাশরিকুন* (কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ৩য় প্রকাশ : ১৯৬৪খৃ.), পৃ. ৩/৯০৭, ড. আব্দুর রহমান বাদাভী, *মওসূ'আতুল মুসতাশরিক্বীন* (বৈরূত : দারুল ইলম লিল মালায়ীন, ৩য় প্রকাশ : ১৯৯৩খৃ.), পৃ. ১৯৭, যিরকিলী, *আল-আ'লাম*, পৃ. ১/৮৪; গোল্ডজিহের রচিত *Introduction to Islamic Theology and Law* গ্রন্থে Bernard Lewis লিখিত ভূমিকা (Princeton University Press, Princeton, New Jersey,1979)।

৪২২. জোসেফ ফ্রাঞ্জ শাখত জার্মানীর র‍্যাটিবর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন একটি হিব্রু স্কুলে। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি সেমেটিক, গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। জার্মানীর ফ্রীবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করার পর একই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ১৯২৭ বা ১৯২৯ সালে জার্মানীর সর্বকনিষ্ঠ প্রফেসর হিসেবে পদন্নতি লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি কায়রো গমণ করেন এবং ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৩৯ সালে ইংল্যাণ্ডে এসে বিবিসিতে যোগদান করেন এবং ১৯৪৭ সালে বৃটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স এবং ১৯৫২ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৪ সালে নেদারল্যাণ্ডের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষকতা জীবন পুনরায় শুরু হয়। সর্বশেষ ১৯৫৭ সালে তিনি আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু প্রফেসর এমিরেটাস হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। তাঁর সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ The Origins of Muhammadan Jurisprudence (১৯৫০)। এছাড়া The Legacy of Islam, An Introduction to Islamic Law (১৯৬৪) প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Encyclopaedia of Islam-এর অন্যতম সম্পাদক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া ইস্তাম্বুল, কায়রো, ফাস ও তিউনিসের লাইব্রেরীসমূহে রক্ষিত অনেক প্রাচীন আরবী পাণ্ডুলিপিসমূহের উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেছেন এবং জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় তা অনুবাদ করেছেন। আন্তর্জাতিক জার্নালসমূহে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে (নাজীব আল-আক্বীক্বী, *আল-মুসতাশরিকুন*, পৃ. ২/৮০৩-৮০৫; ড. আব্দুর রহমান বাদাভী, *মওসূ'আতুল মুসতাশরিক্বীন*, পৃ. 366-368; Bernard Lewis, Obituary Article : Joseph Schacht (London : Bulletin of the School of Oriental and African Studies,33,1970), p 377-381)।

সংশয়-১ : হাদীছ রাসূল (ছা.)-এর বাণী নয়; বরং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক আখ্যান মাত্র।

প্রাচ্যবাদী হাদীছ গবেষণার স্থপতি ইগনাজ গোল্ডজিহার (১৮৫০-১৯২১খ্রি.) বলেন, মুহাম্মাদ (ছা.) ছিলেন একজন সংস্কারকমাত্র। তিনি কোন আইনপ্রণেতা ছিলেন না। হাদীছের উৎপত্তি তাঁর জীবদ্দশায় হয়নি; বরং পরবর্তীকালে ইসলামের প্রথম দুই শতাব্দীর ধর্মীয়, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিকাশের প্রেক্ষাপট থেকে হাদীছের উৎপত্তি ঘটেছে।[৪২৩] এসময় মুহাম্মাদ (ছা.)-এর নামে এসব হাদীছ বানোয়াটভাবে রচনা করা হয়েছে, যাতে পূর্ববর্তী জাহেলী সংস্কৃতি, বাইবেল, গ্রীক, পার্সিয়ান, রোমান, ইণ্ডিয়ান আইনসমূহ শামিল হয়ে গিয়েছিল।[৪২৪] তাঁর মতে, উমাইয়া শাসকদের সাথে একশ্রেণীর আলেমদের পারস্পরিক শত্রুতার মধ্যে দিয়ে জাল হাদীছ রচনার প্রচলন শুরু হয়।[৪২৫] তাঁর মতে, ছাহাবীরাই প্রথম জাল হাদীছ রচনা করা শুরু করেন।[৪২৬] অতঃপর পরবর্তী ধর্মবেত্তাগণ এমনকি ইমাম যুহরীর মত বিখ্যাত মুহাদ্দিছও উমাইয়া খিলাফত টিকিয়ে রাখার জন্য হাদীছ রচনা করে তা কল্পিত ইসনাদের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছা.)-এর নামে জুড়ে দেন। ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনেক সময় বাধ্য হয়ে তাঁরা উমাইয়াদের সমর্থনে বা তাদের প্রতিপক্ষ দমনে এই কর্মে নিযুক্ত হন। এছাড়া ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বও জাল হাদীছ রচনায় ভূমিকা রেখেছে।[৪২৭]

পর্যালোচনা :

গোল্ডজিহার প্রাচ্যবাদের সন্দেহবাদী (Skepticism) গবেষণাধারার সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিনিধি ছিলেন। হাদীছ প্রথমত ইসলামী শরী'আতের কোন অংশ নয় এবং দ্বিতীয়ত কোন হাদীছই প্রকৃতঅর্থে রাসূল (ছা.)-এর বাণী বা কর্মের বিবরণ নয়, বরং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে বানোয়াটভাবে রচিত–এটিই তাঁর গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। নিম্নে তাঁর ভ্রান্ত ধারণাসমূহ খণ্ডন করা হ'ল।

---

৪২৩. Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, vol. 2, p. 18-19.
৪২৪. Ignaz Goldziher, *Introduction to Islamic Theology and Law*, p. 40-41.
৪২৫. Ibid, vol. 2, p. 38-44.
৪২৬. Ibid, vol. 2, p. 18.
৪২৭. Ibid, vol. 2, p. 46, 49.

ক. ইসলামের ধর্মীয় ও সামাজিক বিকাশের প্রেক্ষাপট থেকে হাদীছের জন্ম হয়েছিল এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অবাস্তব। কেননা এটা সর্বজনবিদিত যে, রাসূল (ছা.) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন ইসলাম শৈশবাবস্থায় ছিল না, বরং তা পূর্ণাঙ্গ রূপেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাসূল (ছা.) তাঁর বিদায় হজ্জের ভাষণেই দ্বীনের পূর্ণাঙ্গতা ঘোষণা করে গিয়েছিলেন।[৪২৮] মৃত্যুর সময় তিনি কুরআন ও সুন্নাহকে ইসলামী শরীআ'তের মূল উৎস হিসাবে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, تركت فيكم أمرين، لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না, যতক্ষণ সে দু'টিকে আকড়ে ধরে থাকবে; আর তা হ'ল আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর নবী (ছা.)-এর সুন্নাহ'[৪২৯]।

দ্বিতীয়ত, ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতির সাথে সাথে মুসলমানরা বহু নতুন নতুন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল, যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহে সরাসরি বর্ণিত হয়নি। এজন্য তারা ইজতিহাদের মাধ্যমে সমাধান বের করেছিলেন। কিন্তু এই ইজতিহাদ কখনই ইসলামী শরী'আতের গণ্ডির বাইরে ছিল না; বরং কুরআন ও সুন্নাহ্র নির্দেশনা আলোকেই তারা এ সকল সমস্যার সমাধান করেছিলেন।

তৃতীয়ত, ইসলামী শরী'আহ বহিরাগত কোন সভ্যতা থেকে প্রভাবিত হওয়া তো দূরের কথা, বরং ইসলামই তৎকালীন বিশ্বকে এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করেছিল, যার আলোকমালায় বিভূষিত হয়ে লক্ষ-কোটি মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে এসেছিল। উমার (রা.)-এর যুগে তৎকালীন পরাশক্তি পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য মুসলিম বিশ্বের করতলগত হয়েছিল। উমার (রা.)-এর ইনসাফপূর্ণ শাসনাধীনে এ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার মূল ভিত্তি ছিল ইসলামী শরী'আহ্র শক্তিশালী ভিত্তি। উমার (রা.) মুসলিম জাহানের সুবিশাল ভূখণ্ডে যে অনুপম ইনসাফপূর্ণ শাসনব্যবস্থার নযীর রেখে গেছেন, তার তুলনা কেবল তৎকালীন বিশ্বেই নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। তিনি এই শাসনব্যবস্থা কি ইসলামী শরী'আহ্র ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, না কি তৎকালীন

---

৪২৮. সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ৩।
৪২৯. *মুওয়াত্ত্বা মালিক* (তাহক্বীক : মুছত্বফা আল-আ'যামী), হা/৬৭৮।

রাজন্যবর্গের মস্তিষ্কপ্রসূত ভঙ্গুর, বৈষম্যপূর্ণ ও বিপন্নপ্রায় রোমান বা পারসিক আইনের ভিত্তিতে? যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে তা অনুমান করা কষ্টকর নয়।

চতুর্থত, শুধু ইসলামী শরী'আতের মৌলিক বিষয়সমূহ নয়, বরং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও মুসলমানদের সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম সভ্যতা একেবারেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যা কোন বহিরাগত স্পর্শ থেকে মুক্ত। সেই শুরুকাল থেকে আজও পর্যন্ত মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া জুড়ে নানা বর্ণ ও ভূখণ্ড নির্বিশেষে সকল মুসলমানের মধ্যে কুশলাদি বিনিময়ে, সামাজিক রীতিতে, ব্যক্তিজীবন পরিচালনায় যে গভীর ঐক্যতান লক্ষ্য করা যায়, তা কোন মিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে না, বরং একটি স্বতন্ত্র ও অভিন্ন সভ্যতার পরিচয়ই প্রকাশ করে। যদি ইসলামী শরী'আহ সত্যিই সামাজিক উৎকর্ষতার ধারাবাহিক ফসল হ'ত কিংবা বহিরাগত সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হ'ত, তবে এই ঐক্যতান কখনই সাধিত হ'ত না। বরং প্রত্যেক দেশের মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ইবাদত রীতি পরিলক্ষিত হ'ত। তাছাড়া রাসূল (ছা.) তাঁর জীবদ্দশাতেই ইহুদী-খ্রীষ্টানসহ ভিন্ন কোন জাতির সাথে কোন প্রকার সাদৃশ্য স্থাপনকারীকে নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, من تشبه بقوم فهو منهم 'যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৪৩০]

পঞ্চমত, মুসলিম সমাজে যে বিভিন্ন মাযহাব ও চিন্তাধারার দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে তা কুরআন ও সুন্নাহ বোঝার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যাগত তারতম্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য মুসলিম সমাজে এমনকি যত দল-উপদল চূড়ান্ত ভাবে পথভ্রষ্ট হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে তাদেরকেও দেখা যাবে যে, তারা তাদের মতের সপক্ষে কুরআন ও সুন্নাহ থেকেই দলীল পেশ করছে। সুতরাং এ কথা ভাবার কোন অবকাশ নেই যে, ইসলামী শরী'আহ কোন বহিরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত বস্তু।[৪৩১]

ষষ্ঠত, ইসলামী শরী'আহ যদি রোমান বা পারসিক আইন দ্বারাই প্রভাবিত হবে, তবে শরী'আতের ঠিক কোন কোন আইন রোমান আইন থেকে

---

৪৩০. *সুনান আবী দাঊদ*, হা/৪০৩১।
৪৩১. আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

গৃহীত হয়েছে এবং কোন সময় থেকে তা মুসলিম সমাজে চালু হয়েছিল- এর কোন বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ গোল্ডজিহারসহ প্রাচ্যবিদরা অদ্যাবধি দেখাতে পারেননি। অথচ এই ভিত্তিহীন দাবীর ওপর আজও তারা অটল! এজন্য অপর এক প্রাচ্যবিদ Fitzgerald গোল্ডজিহারের এই অনুসিদ্ধান্তের ভ্রান্তি উল্লেখ করে বলেন, '..to string together a list of resemblances, sometimes real but generally superficial and too often imaginary; and then to assert that such esemblances are in themselves proof of borrowings by the later from the earlier system. This unscientific method of dealing with the problem has been bolstered with unhistorical history, question begging epithets and a priori assumptions'.[৪৩২]

খ. মুসলিম সমাজে জাল হাদীছের প্রচলন প্রধানত শী'আদের মাধ্যমে ঘটে যা সর্বজনবিদিত। তারা আলী (রা.)সহ আহলে বাইতের মর্যাদা বর্ণনায় অসংখ্য হাদীছ রচনা করেছিল, যার স্বীকৃতি স্বয়ং শী'আরাই প্রদান করেছে। তারা আলী (রা.)-এর সপক্ষে যেমন হাদীছ রচনা করেছিল, তেমনি ইসলামের প্রথম তিন খলীফার বিরুদ্ধেও অসংখ্য হাদীছ রচনা করে। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় কিছু মুর্খ ব্যক্তি আবূ বকর, উমার, উছমান (রা.)-এর সপক্ষে হাদীছ রচনা করে। এভাবে মিথ্যা হাদীছ রচনা একটি মহামারীতে রূপ নেয় এবং বিভিন্ন দল ও মতবাদের মানুষেরদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তারা স্ব স্ব স্বার্থ চরিতার্থ করতে হাদীছকে ব্যবহারের ভয়ংকর অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়।[৪৩৩] কিন্তু এর সাথে কোন মুসলিম শাসক কিংবা মুহাদ্দিছ ও মুসলিম বিদ্বানের সংশ্লিষ্টতা ছিল, এমন একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রথম যুগ থেকে হাদীছ সংকলনের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাদের সাথে শীআ', খারিজী বা অন্যান্য দল-উপদলের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাদের সাথে কখনও উমাইয়াদের সংঘাত হয়নি। সুতরাং কীসের ভিত্তিতে গোল্ডজিহার হাদীছকে বনু উমাইয়া এবং মদীনার মুত্তাকী আলিমদের মধ্যকার পরস্পর বিবাদের ফল বলে সাব্যস্ত

---

৪৩২. Fitzgerald, *'The Alleged Debt of Islamic to Roman Law'* (England and Wales : The Law Quarterly Review, No. 67, 1951), p.1; তিনি আরও বলেন, It was obviously impossible for the Arabs to tolerate the continued existence of courts deriving their authority from and owing allegiance to a foreign power which had not submitted to Islam (See : Ibid, p.92).

৪৩৩. ড. উমার ফালাতাহ, *আল-ওয়াযঊ' ফীল হাদীছ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮-৩৮৩।

করলেন, তা বোধগম্য নয়। যদি তিনি শী'আদেরকে মুত্তাকী আলিম গণ্য করে থাকেন, সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যারা হক্বপন্থী আলিম হিসাবে গণ্য হ'তেন এবং হাদীছ সংরক্ষণ ও সংকলন কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে এই বক্তব্য নিঃসন্দেহে অনৈতিহাসিক।

তিনি তাঁর মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ এনেছেন মু'আবিয়া (রা.) এবং ইবনু শিহাব আয-যুহরী থেকে, যা প্রকৃতপক্ষে কোনভাবেই দলীলযোগ্য নয়। এরপরও প্রশ্ন আসে যে, মু'আবিয়া (রা.), ইবনু শিহাব আয-যুহরী এবং মদীনার আলিমগণ ব্যতীত তৎকালীন বিশ্বে আর কোন ছাহাবী বা তাবেঈ ছিলেন না? মক্কা, দামিশক, মিছর, কুফা, বছরাসহ অপরাপর শহরগুলোতেও যে অসংখ্য ছাহাবী এবং তাবেঈ ছিলেন, তারা কি মদীনার আলিমদের এই কথিত 'অপকর্ম' লক্ষ্য করেন নি? নাকি তাঁরাও একই সাথে জাল হাদীছ রচনায় যুক্ত হয়েছিলেন? যদি সবাই যুক্ত থাকেন তবে বলতে হয়, জ্ঞানচর্চার নামে সুসংগঠিত ও সর্বজনগ্রাহ্যভাবে এমন মহা অপকর্ম সাধিত হওয়ার কোন নযীর পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। মোটকথা গোল্ডজিহারের এই অবিশ্বাস্য কাল্পনিক অনুসিদ্ধান্ত একেবারেই ভিত্তিহীন এবং সত্যের ভয়ানক অপলাপ।

দ্বিতীয়ত, মদীনার আলিমগণ শী'আ, খারিজীসহ সকল বিভ্রান্ত দলগুলোর অপতৎপরতা শক্তভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন। সুতরাং তাদের পক্ষে কি করে সম্ভব যে, তারাই উমাইয়াদের বিরোধিতার জন্য শী'আদের পক্ষে আহলে বায়েতের ফযীলত বর্ণনায় মিথ্যা হাদীছ রচনা করবেন? বরং মুহাদ্দিছগণই এসব জাল হাদীছকে প্রথম চিহ্নিত করেন এবং জাল হাদীছ প্রতিরোধের জন্য সুসংহত নীতিমালা প্রণয়ন করেন। যদি তাঁরা নিজেরাই জাল হাদীছ রচনা করে থাকেন, তবে জাল হাদীছ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছিলেন কেন? সুতরাং এই দাবীরও কোন সত্যতা নেই।

তৃতীয়ত, গোল্ডজিহারের বক্তব্য অনুযায়ী যদি উমাইয়া শাসকগণ শী'আদের দমন করা কিংবা প্রতিপক্ষকে শায়েস্তা করার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীছ জাল করার ব্যবস্থা করে থাকেন, তবে সেসব হাদীছ কোথায় যেগুলো সরকারীভাবে জাল করা হয়েছে? পৃথিবীর কোন হাদীছ গ্রন্থে সেগুলো স্থান পেয়েছে? এমন কোন প্রমাণ গোল্ডজিহার উপস্থাপন করতে পারেন নি। ফলে তাঁর এই দাবী বাতিল।

চতুর্থত, মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহদের মধ্যে যে শাখাগত দ্বন্দ্ব ছিল, তার ভিত্তিতে কোন অসাধু ব্যক্তি জাল হাদীছ রচনা করেছে, যা স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু মুহাদ্দিছগণ তা সঠিকভাবে চিহ্নিতও করেছেন। মুহাদ্দিছরা এ বিষয়ে কতটা সতর্ক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় কুতুবে ছিত্তাহ সংকলকগণের প্রচেষ্টায়। তাঁরা লক্ষ লক্ষ হাদীছ যাচাই করে মাত্র কয়েক হাজার হাদীছ তাদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছিলেন। আর সে সকল হাদীছগ্রন্থে নির্দিষ্ট কোন মতবাদের হাদীছ একত্রিত করা হয় নি। বরং যাবতীয় বিষয়ভিত্তিক হাদীছসমূহ একত্রিত করা হয়েছে। সুতরাং মুহাদ্দিছ ও ফকীহদের শাখাগত দ্বন্দ্বের প্রভাব হাদীছ শাস্ত্রে কোন প্রকার ক্ষান্তি ও দুর্বলতা সৃষ্টি করেছে, এর কোন প্রমাণ নেই।

গ. গোল্ডজিহার জাল হাদীছ রচনার প্রমাণ হিসাবে মু'আবিয়া (রা.)-এর একটি বর্ণনাকে উদাহরণ হিসাবে নিয়ে এসেছেন। বর্ণনাটি হ'ল, মু'আবিয়া (রা.) মুগীরা ইবনু শু'বা (রা.)-কে বললেন যে, তোমরা আলীর গালমন্দ করা এবং উছমানের কল্যাণকামনায় শৈথিল্য করো না। তোমরা আলীর সহচরদের গালি দাও এবং তাদের হাদীছসমূহ অপাঙক্তেয় করে দাও এবং তার মুকাবিলায় উছমান ও তার সহচরদের অধিক প্রশংসা কর। তাদেরকে তোমাদের নিকট ডাক এবং তাদের কথা শ্রবণ কর।' গোল্ডজিহার বলেন, 'এভাবে আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে উমাইয়াদের জাল হাদীছ রচনার ভিত্তি রচিত হ'ল'। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, এই বর্ণনাটিকে যদি সঠিকও ধরা হয়, তবুও মু'আবিয়া (রা.) এখানে কোথাও জাল হাদীছ রচনার নির্দেশ দেন নি, অথচ গোল্ডজিহার মিথ্যাচার করে দাবী করলেন যে, এর মাধ্যমে নাকি জাল হাদীছ রচনার ভিত্তি রচিত হয়েছে? সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হ'ল গোল্ডজিহার বক্তব্য যেভাবে বর্ণনা করেছেন মুআ'বিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত মূল বক্তব্যেও তা নেই। মূল বর্ণনাটি ইতিহাসবেত্তা মুফাস্‌সির ইমাম ত্বাবারী এভাবে উল্লেখ করেছেন, لا تتحم عن شتم علي وذمه، والترحم على عثمان والاستغفار له، والعيب على أصحاب علي، والإقصاء لهم، وترك الاستماع منهم، وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه، والإدناء لهم।[৪৩৪] এখানে আলী (রা.)-এর গালমন্দ করার কথা বলা হ'লেও কোথাও বলা হয় নি যে, 'তাদের হাদীছসমূহ অপাঙক্তেয় করে দাও'। এই বাক্যটি গোল্ডজিহারের নিজস্ব রচনা। মজার ব্যাপার হ'ল যে,

৪৩৪. আবূ জা'ফর আত-ত্বাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক* (বৈরূত : দারুত তুরাছ, ২য় প্রকাশ : ১৩৮৭হি.), ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩।

মু'আবিয়া (রা.)-এর যে বক্তব্যকে গোল্ডজিহার জাল হাদীছ রচনার ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করেছেন, সে বক্তব্যটি গোল্ডজিহারের নিজেরই মিথ্যাচারপ্রসূত রচনা![৪৩৫] এথেকে প্রাচ্যবাদী হাদীছ গবেষণার দৈন্যদশা এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রকটভাবে ফুটে ওঠে। দুঃখজনক বিষয় হ'ল, এই মিথ্যা প্রমাণ ব্যবহার করে যদি তারা দাবী করতেন যে, কেবল ফযীলত তথা মর্যাদা বর্ণনার হাদীছগুলো জাল করা হয়েছে, তবুও বিষয়টি কিছুটা হালকাভাবে দেখা যেত, কিন্তু তাঁরা এর ভিত্তিতে সমস্ত ইসলামী শরী'আতই জাল দাবী করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। এই অপরাধ কীভাবে ক্ষমা করা সম্ভব?

ঘ. গোল্ডজিহারের মতে, উমাইয়ারা ইবনু শিহাব আয-যুহরী (১২৪হি.)-কে নিজেদের চাতুর্য দ্বারা হাদীছ জালকরণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিল। একথা সর্বজনবিদিত যে, ইবন শিহাব আয-যুহরী সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীছ সংকলন শুরু করেন এবং হাদীছ সংকলনের ইতিহাসে তিনি একজন কিংবদন্তী পুরুষ। এজন্যই সম্ভবত গোল্ডজিহার তাঁকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছেন। আয-যুহরীর বিশ্বস্ততা, মর্যাদা তাঁর সমকালীন যুগের মুহাদ্দিছগণসহ পরবর্তী প্রত্যেকযুগের মানুষের নিকট সুবিদিত। ইমাম মালিক, ইমাম আবূ হানীফাসহ বিদ্বানদের একটি বিশাল দল তাঁর নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী যুগের এমন একটি হাদীছ গ্রন্থ পাওয়া যাবে না, যেখানে ইমাম যুহরীর কোন বর্ণনা নেই। এমনকি হাদীছের বিভিন্ন অধ্যায়ের কোন একটি অধ্যায় হয়ত আয-যুহরীর বর্ণনা থেকে মুক্ত পাওয়া যাবে না। সুতরাং তিনি সকল যুগের মুসলিম বিদ্বানদের নিকট অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত। ইমাম মালিক (১৭৯হি.) বলেন, بقي ابن شهاب وماله في الدنيا نظير 'ইবনু শিহাবের জীবদ্দশায় সমগ্র দুনিয়ায় তাঁর তুলনীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না।'[৪৩৬] বিশিষ্ট তাবেঈ মাকহূল (১১০হি.) বলেন, ما بقى على ظهرها احد اعلم بسنة ماضية من ابن شهاب الزهري 'দুনিয়ার বুকে ইবনু শিহাব আয-যুহরীর মত সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানবান মুহাদ্দিছ আর কেউ নেই।'[৪৩৭] ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী (৮৫২হি.) বলেন, الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه

---

৪৩৫. আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ২০৪-২০৫; আবূ শাহবাহ, *দিফাউন আনিস সুন্নাহ*, পৃ. ২৯৭-২৯৮।

৪৩৬. ইবনু আবী হাতিম, *আল-জারাহ ওয়াত তা'দীল*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭২।

৪৩৭. তদেব, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৭৩।

'তিনি ছিলেন ফক্বীহ, হাদীছের হাফিয এবং তাঁর মর্যাদা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে সকল মুহাদ্দিছ একমত।'[৪৩৮] গোল্ডজিহারের পূর্বে এই সুদীর্ঘ হাজার বছরের ইতিহাসে এমন একজন ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না যিনি আয-যুহরীর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোন সন্দেহ বা সংশয় প্রকাশ করেছেন। অথচ এমন একজন মহান ব্যক্তিত্বকে কালিমালিপ্ত করে গোল্ডজিহার যখন এমন মন্তব্য করেন যে, তিনি নিয়মিত উমাইয়া খলীফাদের দরবারে যেতেন এবং উমাইয়ারা তাঁকে নিজেদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী হাদীছ জালকরণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছিল, তখন তাঁর বক্তব্য খণ্ডন করাই অর্থহীন।

অধিকন্তু নাবিয়া এবোট (১৯৮১খ্রি.) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, উমাইয়া শাসকগণের নির্দেশে রাসূল (ছা.)-এর যে সকল হাদীছ সংগ্রহ করা হয়, তা ছিল প্রধানত প্রশাসনিক বিষয়সমূহ সম্পর্কিত যেমন কর, ছাদাকা, রক্তপণ, উত্তরাধিকার সম্পত্তি ইত্যাদি। তাতে উমাইয়াদের রাজনৈতিক ইমেজ বৃদ্ধিমূলক কোন হাদীছ পরিলক্ষিত হয় না। বিশেষত, উমাইয়া খলীফা উমার ইবনু আব্দিল আযীয (১০১হি.)-এর নির্দেশে ইবনু শিহাব আয-যুহরী যে সকল হাদীছ সংগ্রহ করেন, তার অধিকাংশই ছিল যাকাত ও ছাদাকাসংক্রান্ত।[৪৩৯] অতএব ইবনু শিহাব আয-যুহরী রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছেন, গোল্ডজিহারের এই ধারণা ভিত্তিহীন।

ঙ. গোল্ডজিহার ইমাম আয-যুহরীর জাল হাদীছ রচনার একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক (৮৬হি.) বায়তুল মুক্বাদ্দাসে 'কুব্বাতুছ ছাখরা' গম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, সিরিয়া ও ইরাকবাসী মক্কার পরিবর্তে 'কুব্বাতুছ ছাখরা' ভ্রমণ করতে আসবে। আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (রা.) এবং মক্কাবাসীর প্রতি বিদ্বেষবশত তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে তিনি বিষয়টিকে ধর্মীয় পোষাক পরিধান করালেন এবং বন্ধু আয-যুহরীকে দিয়ে হাদীছ রচনা করালেন, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى 'তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদে ছালাতের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় সফরে বের হবে না।

---

৪৩৮. ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, *তাকরীবুত তাহযীব* (সিরিয়া : দারুর রশীদ, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৫০৫।

৪৩৯. Nabia Abbott, *Studies In Arabic Literary Papyri*, Vol. II, p. 29, 32.

সেগুলি হ'ল আল-মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুর রাসূল (ছা.) এবং মাসজিদুল আক্বসা।'[৪৪০] এই হাদীছটিকে ইবনু শিহাব আয-যুহরীর জাল রচনা প্রমাণ করতে গোল্ডজিহার যে কাহিনীর অবতারণা করেছেন তার কোন অস্তিত্ব ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, ইবনু খাল্লিকান (৬৮১হি.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে মিশরীয় প্রাণীবিজ্ঞানী কামালুদ্দীন আদ-দিমইয়ারী (১৪০৫খ্রি.) তাঁর 'কিতাবুল হাইওয়ান' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, 'আব্দুল মালিক এই কুব্বাতুছ ছাখরা নির্মাণ করেছিলেন এবং আরাফাতের দিন মানুষ এখানে এসে জমায়েত হ'ত'। কিন্তু এই বর্ণনা অত্যন্ত দুর্বল, যা পূর্ববর্তী কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তদুপরি অন্য সকল বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, 'কুব্বাতুছ ছাখরা' নির্মাণ করেছিলেন খলীফা আল-ওয়ালিদ ইবনু মারওয়ান (৯৬হি.)।

দ্বিতীয়ত, এই বর্ণনা যদি গ্রহণযোগ্যও হ'ত, তবুও এতে এমন কথা বলা হয়নি যে, আব্দুল মালিক মক্কায় হজ্জ থেকে মানুষকে ফেরানোর উদ্দেশ্যে এই গম্বুজটি নির্মাণ করেছিলেন।

তৃতীয়ত, এই বর্ণনা সত্য হ'লে আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান কাফির সাব্যস্ত হতেন। কেননা মাসজিদুল হারাম ব্যতীত কোথাও হজ্জ করা যায় না। যদি তিনি এমন কর্ম করতেন, তবে নিশ্চিতভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠত এবং উমাইয়া বিরোধীরা তাঁর সমালোচনায় মুখর হ'ত। কিন্তু ইতিহাসে এমন কিছুই আমরা পাই না।

চতুর্থত, আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.)-এর মৃত্যু হয় ৭৩ হিজরীতে এবং আয-যুহরীর জন্ম হয় ৫১ বা ৫৮ হিজরীতে। সেই হিসাবে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বা ২২। এই বয়সে তিনি হাদীছ বর্ণনায় এত খ্যাতি অর্জন করেননি যে, আব্দুল মালিক তাঁকে দিয়ে এই হাদীছ রচনা করাবেন এবং মুসলিম উম্মাহ তা গ্রহণ করে নিবে।

পঞ্চমত, ইবনু আসাকির, আয-যাহাবী প্রমুখের বর্ণনামতে আয-যুহরীর সাথে আব্দুল মালিকের সাক্ষাৎই হয়েছে ৮০ হিজরী বা তাঁরও পরে অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.)-এর মৃত্যুর ৭ বছর পর। সুতরাং কীভাবে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.)-এর শাসনামলে এই হাদীছ রচনা করলেন?

---

৪৪০. *ছহীহুল বুখারী*, হা/১১৮৯, ১১৯৭, *ছহীহ মুসলিম*, হা/১৩৯৭ ।

ষষ্ঠত, এই হাদীছটি আয-যুহরী তাঁর শিক্ষক সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ৯৩ হিজরীতে। অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা.)-এর মৃত্যুর পরও ২০ বছর বেঁচে ছিলেন। যদি আয-যুহরী উমাইয়াদের খুশী করার জন্য সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব থেকে জাল বর্ণনা করে থাকেন, তবে তিনি কি আয-যুহরীর এই মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে কথা বলতেন না? অথচ তিনি শাসকের মুখের উপর হক্ব কথা বলার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন!

সপ্তমত, যদি খলীফা আব্দুল মালিককে খুশী করার জন্যই আয-যুহরী হাদীছটি জাল করে থাকেন, তবে কেন তিনি হাদীছের মধ্যে উক্ত 'কুব্বাতুছ ছাখরা'-এর কোন নামগন্ধ উচ্চারণ করলেন না? অথচ আব্দুল মালিক ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যে, এই 'কুব্বাতুছ ছাখরা'-কে কেন্দ্র করেই মানুষ হজ্জ করতে আসবে? কিন্তু এই হাদীছে মক্কা ও মদীনার মসজিদের কথাই প্রথমে উল্লেখিত হয়েছে!

অষ্টমত, এই হাদীছটি ছহীহ হাদীছ, যা আয-যুহরী ছাড়া অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম আবূ হুরায়রা (রা.) এবং আবূ সাঈদ (রা.) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[৪৪১]

সুতরাং গোল্ডজিহার যে কল্পকাহিনীর অবতারণা করতে চাইলেন এবং আয-যুহরীকে জাল হাদীছ রটনাকারী সাব্যস্ত করতে চাইলেন, তা কেবল ভিত্তিহীনই নয় বরং ভয়াবহ ইতিহাস বিকৃতির নযীর। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণের নামে তিনি যে সুস্পষ্ট তথ্যবিকৃতির আশ্রয় নিলেন, তা বিস্ময়কর। সর্বোপরি হাদীছটি আয-যুহরী ছাড়া অন্যরাও বর্ণনা করেছেন। তবুও কি গোল্ডজিহার হাদীছটিকে যুক্তিহীনভাবে জাল বলবেন? হাদীছে ছাড়াও কুরআনে আল-আক্বছা মসজিদের মর্যাদার কথা উল্লেখিত হয়েছে। অতএব রাসূল (ছা.) যদি তাঁর অনুসারীদেরকে মাসজিদুল হারাম এবং মাসজিদুন নববী'র সাথে মাসজিদুল আক্বছায় ছালাত আদায়েও উৎসাহিত করে থাকেন, তবে তা কি বড় অবিশ্বাস্য ব্যাপার হবে? ঐতিহাসিক সমালোচনা (Historical-Critical method) নীতি যদি এই সম্ভাবনাটুকুও ধারণ করতে ব্যর্থ হয়, তবে সম্ভবত পশ্চিমা পণ্ডিতদের খোদ এই নীতির উপযোগিতা নিয়ে পুনরায় গবেষণা করা প্রয়োজন।

---

৪৪১. দ্র. আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ২১৭-২১৯।

চ. গোল্ডজিহার আয-যুহরী সম্পর্কে দাবী করেন যে, আয-যুহরী তাঁর বক্তব্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। আর তা হ'ল, তিনি বলেন, إن هؤلاء الأمراء أكرهونا علي كتابة أحاديث 'এই শাসকরা আমাদেরকে হাদীছ লিখতে বাধ্য করেছে।' অর্থাৎ শাসকরা আয-যুহরীকে জাল হাদীছ রচনা করতে বাধ্য করেছিল। সাধারণ পাঠক হয়ত প্রথম দর্শনে এই খণ্ডিত বক্তব্যটি শুনে তা-ই বুঝবেন। অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর মূল বক্তব্যটি বিভিন্ন গ্রন্থে এসেছে এভাবে যে, كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا أن لا نمنعه أحدا من المسلمين 'আমরা হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে অপছন্দ করতাম (অর্থাৎ হাদীছ মুখস্থ রাখাকেই যথেষ্ট মনে করতাম)। কিন্তু এই শাসকগণ আমাদেরকে তা লিখতে বাধ্য করলেন। একারণে এখন আমরা সংগত মনে করছি যে, কোন মুসলমানকেই লিপিবদ্ধ করা থেকে নিষেধ করব না।'[৪৪২] অর্থাৎ এতদিন তাঁরা হাদীছ মুখস্থ করাকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু শাসকদের চাপে তাঁরা হাদীছ লিপিবদ্ধ করা শুরু করেন, যাতে তা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যায়। অথচ গোল্ডজিহার এখানে যথারীতি তথ্যবিকৃতির আশ্রয় নিয়ে খণ্ডিত বাক্য তুলে ধরলেন এবং সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করে পাঠককে বিভ্রান্ত করতে চাইলেন। এটি হয় গোল্ডজিহারের আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল নতুবা তাঁর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুল, যা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

সুতরাং গোল্ডজিহারের এ সকল দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং কাল্পনিক। তিনি তাঁর দাবী প্রমাণ করতে যে সকল দলীলের আশ্রয় নিয়েছেন এবং তথ্যবিকৃতি ঘটিয়েছেন, তাতে একদিকে আরবী ভাষায় তাঁর অজ্ঞতা, অপরদিকে তাঁর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ইলমী প্রতারণা ও অসততা প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে।

---

৪৪২. ইবনু সা'দ, *আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৫২; খত্বীব আল-বাগদাদী, *তাক্বয়ীদুল ইলম*, পৃ. ১০৭; ইবনু আসাকির, *তারীখু দিমাশক* (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯৫খ্রি.), ৫৫শ খণ্ড, পৃ. ৩২১।

সংশয়-২ : মুহাদ্দিছগণের হাদীছ যাচাই পদ্ধতি অসম্পূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য।

গোল্ডজিহার মন্তব্য করেন, হাদীছ সংকলক মুহাদ্দিছগণ হাদীছের মতন বা বিষয়বস্তুর ঐতিহাসিক ভুল কিংবা স্পষ্ট কালব্যতিক্রম (obvious anachronisms) পর্যন্ত আমলে না নিয়ে এককভাবে শুধুমাত্র ইসনাদের উপর নির্ভর করেছেন। সুতরাং তাদের গবেষণা অসম্পূর্ণ বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।[৪৪৩] একই দাবী করেছেন Alfred Guillaume, A.J. Wensinck, Joseph Schacht, James Robson, Fazlur Rahman, G.H.A. Juynboll প্রমুখ প্রাচ্যবিদ।[৪৪৪] মুহাদ্দিছদের বিরুদ্ধে এটি প্রাচ্যবিদদের প্রধান অভিযোগ। স্যার সৈয়দ আহমাদ, ড. আহমাদ আমীন, মাহমূদ আবূ রাইয়াহ প্রত্যেকেই এই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছেন।[৪৪৫]

পর্যালোচনা :

প্রাচ্যবিদগণ হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষা এবং মূলনীতি সম্পর্কে যে অজ্ঞ ছিলেন তার একটি প্রমাণ হ'ল হাদীছের মতন সম্পর্কে তাদের এই আপত্তি। তাঁরা অবগতই নন যে, মুহাদ্দিছরা হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাইয়ে কীভাবে হাদীছের সনদ ও মতনসহ পারিপার্শ্বিক সকল দিক ও বিভাগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নিম্নে তাঁদের অভিযোগ খণ্ডন করা হ'ল।

ক. হাদীছ শাস্ত্রের যে কোন ছাত্র সামান্য চিন্তা করলেই এই দাবীর অসারতা খুঁজে পাবে। কেননা কোন হাদীছ ছহীহ হ'তে গেলে অন্যতম প্রধান দু'টি শর্ত হ'ল- (১) বর্ণিত হাদীছটি 'শায' (অপরিচিত) হবে না এবং (২) তাতে কোন 'ইল্লত' (গোপন ত্রুটি) থাকবে না। অতঃপর এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, 'শায' দুই প্রকার : সনদ 'শায' হওয়া এবং মতন 'শায' হওয়া। অপরদিকে 'ইল্লত'-ও দুই প্রকার। সনদে 'ইল্লত' থাকা ও মতনে 'ইল্লত' থাকা। সুতরাং সনদ

---

৪৪৩. Ignaz Goldziher, *Muslim Studies*, vol. 2, p. 140-141.

৪৪৪. Alfred Guillaume, *The traditions of Islam: An Introduction to the Study of the Hadith Literature*, p.80, 89; A.J. Wensinck, '*Matn*', Encyclopaedia of Islam, Vol. 6, p. 843; Jonathan A. C. Brown, *'How We Know Early Hadīth Critics Did Matn Criticism and Why It's so Hard to Find'* (Brill : Islamic Law and Society, Vol. 15, No. 2, 2008), p. 147.

৪৪৫. ইছাম আহমাদ আল-বাশীর, *উছূলু মানহাজিন নাকদ ইনদা আহলিল হাদীছ* (বৈরূত : মু'আস্সাসাতুর রাইয়ান, ১৯৮৯খ্রি.), পৃ. ৮৩-৮৪।

এবং মতন উভয় দিক থেকে বিশুদ্ধতা প্রমাণিত না হ'লে কোন হাদীছ ছহীহ হিসাবে গণ্য হয় না। মুহাদ্দিছগণ মতনের দুর্বলতা প্রকাশ করার জন্য আরও কিছু পরিভাষা ব্যবহার করতেন। যেমন : المدرج، المضطرب، المقلوب، زيادات الثقات، المصحف প্রভৃতি, যা হাদীছের ছাত্রদের নিকট সর্বজনবিদিত। এছাড়া হাদীছ শাস্ত্রের সংজ্ঞাতেই বলা হয়েছে, علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد 'হাদীছ শাস্ত্র হ'ল এমন নীতিমালা সম্পর্কিত জ্ঞান যার মাধ্যমে হাদীছের সনদ ও মতনের অবস্থা জানা যায় এবং হাদীছটির গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।'[৪৪৬] এখানেও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, হাদীছের গ্রহণযোগ্য নির্ণয়ে সনদ এবং মতন উভয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা গুরুত্বপূর্ণ।

খ. হাদীছ শাস্ত্রের একটি বিশেষ শাখা হ'ল 'মুখতালিফুল হাদীছ' বা হাদীছের পারস্পরিক অর্থগত (মতন) বিরোধ নিরসন শাস্ত্র। যা তৈরী করা হয়েছে মতনের মধ্যকার বিরোধ, বৈপরীত্য ও ত্রুটি নিরসনের জন্য।[৪৪৭] অনুরূপভাবে রয়েছে 'ইলমুল ইলাল' বা হাদীছের গোপন ত্রুটি অনুসন্ধান শাস্ত্র।[৪৪৮] এতে কোন হাদীছ বাহ্যত ছহীহ হ'লেও তার সনদ বা মতনে কোন গোপন ত্রুটি আছে কি না অনুসন্ধান করা হয়। এতে প্রথমত হাদীছটির সকল সূত্র একত্রিত করা হয়। অতঃপর গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে লক্ষ্য করা হয় যে, বর্ণনাকারী যার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তার সাথে বর্ণনাকারীর কেমন সম্পর্ক ছিল, তিনি তার কোন স্তরের ছাত্র ছিলেন, তিনি সত্যিই তার নিকট থেকে সঠিকভাবে হাদীছটি শুনেছেন কিনা কিংবা তার অন্যান্য ছাত্রদের সাথে তার বর্ণনার কোন বিরোধ হচ্ছে কি না প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়। অবশেষে কোন ত্রুটি চিহ্নিত হ'লে বর্ণনাটিকে منفرد (Isolate), غريب (Strange) বা مضطرب (Disordered or Unsettled) হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এবং যতক্ষণ না তার সপক্ষে কোন শক্তিশালী প্রমাণ যুক্ত হয়, ততক্ষণ তা مرجوح বা অপ্রণিধানযোগ্য হিসাবে গণ্য হয়। সুতরাং কোন হাদীছের সনদ ছহীহ হ'লেই বর্ণনাটি নির্বিবাদে গ্রহণ করে নেয়া হয়, এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।

---

৪৪৬. আস-সুয়ূত্বী, *তাদরীবুর রাবী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬।
৪৪৭. মাহমূদ আত-তহ্হান, *তায়সীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ*, পৃ. ৭০-৭৩।
৪৪৮. তদেব, পৃ. ১২৫-১২৮।

গ. জারাহ ও তা‘দীল তথা বর্ণনাকারী সমালোচনা শাস্ত্রে এমন অসংখ্য পরিভাষা লক্ষ্য করা যায় যেখানে বর্ণনাকারী সম্বন্ধে বলা হয় যে, منكر الحديث, يروي المناكير (এমন বর্ণনাকারী যিনি অস্বীকৃত/অগ্রহণযোগ্য হাদীছ বর্ণনা করেন), يروي الغرائب (অপরিচিত হাদীছ বর্ণনা করেন), روي حديثا باطلا (পরিত্যক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন), روايته واهية (তার বর্ণনাসমূহ তুচ্ছ/মূল্যহীন) প্রভৃতি, যাতে বর্ণনাকারীর বর্ণিত মতনের সমালোচনা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (২৬১হি.) তাঁর الضعفاء الصغير গ্রন্থে অসংখ্যবার منكر الحديث 'অগ্রহণযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। ইবনু আদী (৩৬৫হি.) জনৈক রাবী আবূ সালমাহ মাওলা আশ-শা‘বী সম্পর্কে বলেন, مقدار ما يرويه ليس له متن منكر وإنما عيب عليه الأسانيد 'তিনি যে সকল হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার মতনসমূহ অগ্রহণযোগ্য নয়। ত্রুটি রয়েছে কেবল তার সনদসমূহে'। অর্থাৎ সনদ সঠিকভাবে মনে রাখতে পারে না। ইবনু আদী'র এই বক্তব্য থেকে খুবই স্পষ্ট হয় যে, মুহাদ্দিছগণ সনদ ও মতন উভয়ের প্রতি কতটা লক্ষ্য রেখেছেন।[৪৪৯]

ঘ. গোল্ডজিহারের বক্তব্য, মুহাদ্দিছরা মতনের ঐতিহাসিক ভুল কিংবা স্পষ্ট কালব্যতিক্রম (obvious anachronisms) আমলে নেননি। অথচ প্রখ্যাত তাবেঈ সুফিয়ান আছ-ছাওরী (১৬১হি.) বলেন, لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ 'যখন বর্ণনাকারী মিথ্যা বলত, তখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে ইতিহাসকে ব্যবহার করতাম।'[৪৫০] অনুরূপভাবে হাফছ ইবনু গিয়াছ (১৯৪হি.) বলেন, إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين ، يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه وإذا أخبر الراوي عن نفسه بأمر مستحيل سقطت روايته 'যদি তোমরা কোন বর্ণনাকারী শায়খের ত্রুটি পাও তবে, তাকে বয়স দিয়ে বিচার কর অর্থাৎ তার বয়স এবং যার কাছ থেকে সে হাদীছটি লিখেছে তার বয়স হিসাব কর। আর বর্ণনাকারী যদি তার নিজের সম্পর্কে কোন অসম্ভব বিষয় বর্ণনা করে, তবে তারা বর্ণনা পরিত্যক্ত হবে।'[৪৫১] এভাবে মুহাদ্দিছগণ

---

৪৪৯. ইবনু আদী, *আল-কামিল ফী যু‘আফাইর রিজাল*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৩৪।
৪৫০. খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ১১৯।
৪৫১. তদেব, পৃ. ১২০।

প্রত্যেক রাবী সম্পর্কে সার্বিক খবরাখবর নিতেন এবং তার বর্ণনাসমূহ তার পারিপার্শ্বিকতার সাথে মিলিয়ে দেখতেন, যাতে তার কোন ভুল হলে বা সে মিথ্যা বললে ধরা পড়ে যায়। সুতরাং গোল্ডজিহারের এই দাবীর কোন বাস্তবতা নেই।

ঙ. মুহাদ্দিছদের নিকট স্বীকৃত নিয়ম হ'ল, কোন হাদীছের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য হলেও তার মতন 'শায' (অপরিচিতি) হ'লে কিংবা তাতে 'ইল্লত' (গোপন ত্রুটি) পরিলক্ষিত হ'লে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে কখনও হাদীছের সনদ দুর্বল হ'লেও মতন গ্রহণযোগ্য হয় যদি অন্য কোন হাদীছ থেকে তার সমর্থন পাওয়া যায়। এখান থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সনদ এবং মতন উভয়টিই তাদের নিকট বিচার্য ছিল। সর্বোপরি, তাঁদের শত শত বছরের গবেষণা কিছু নিয়মামাফিক জ্ঞানের উপর নয় বরং সামগ্রিকতা এবং বস্তুনিষ্ঠতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই গবেষণায় সম্ভাব্য সকল ত্রুটি খতিয়ে দেখা হ'ত, যাতে কখনও একদেশদর্শীতাকে অনুমোদন দেওয়া হয় নি। ড. মুহাম্মাদ লুকমান আস-সালাফী ছাহাবীদের যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে মুহাদ্দিছদের মতন সমালোচনার অনেক উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।[৪৫২] ইবনুছ ছালাহ (৬৪৩হি.) বলেন, قد يقال: " هذا حديث صحيح الإسناد "، ولا يصح، لكونه شاذا أو معللا 'কখনও বলা হয় যে, 'এই হাদীছটি সনদের দিক থেকে ছহীহ' তবে তা ছহীহ না-ও হ'তে পারে তা 'শায' কিংবা তাতে 'ইল্লত' থাকার কারণে।'[৪৫৩] ইবনু কাছীর (৭৭৪খ্রি.) বলেন, والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا 'কোন হাদীছের সনদ ছহীহ বা হাসান আখ্যায়িত হ'লে একই হুকুম তার মতনের ওপরও আবশ্যকভাবে প্রযোজ্য হবে তা নয়। কেননা হাদীছটি 'শায' হতে পারে কিংবা 'ইল্লত'যুক্ত হ'তে পারে।'[৪৫৪] ইবনুল কাইয়িম (৭৫১হি.) আরও স্পষ্টভাবে বলেন, وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحديث وليست موجبة لصحته فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها

---

৪৫২. ড. মুহাম্মাদ লুকমান আস-সালাফী, *ইহতিমামুল মুহাদ্দিছীন বি নাকদিল হাদীছ সানাদান ওয়া মাতানান* (রিয়াদ : দারুদ দাঈ, ২য় প্রকাশ : ১৪২০হি.), পৃ. ৩১৫-৩৪৭।

৪৫৩. ইবনুছ ছালাহ, *মুকাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ*, পৃ. ৮৩।

৪৫৪. ইবনু কাছীর, *আল-বা'ইছুল হাছীছ*, পৃ. ৪৩।

صحة سنده وانتفاء علته وعدم شذوذه ونكارته وأن لا يكون روايه قد خالف الثقات أو شذ عنهم 'এটি জ্ঞাত বিষয় যে, সনদ ছহীহ হওয়া হাদীছ ছহীহ হওয়ার শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত। কিন্তু তা আবশ্যকভাবে হাদীছটিকে ছহীহ করে দেয় না। কেননা একটি হাদীছ অনেকগুলো বিষয়ের সমন্বয়ে ছহীহ হয়। যেমন তার সনদ ছহীহ হওয়া, কোন গোপন ক্রটি মুক্ত হওয়া, অপরিচিত না হওয়া এবং তার বর্ণনাকারী অধিকতর শক্তিশালী বর্ণনাকারীর বিরোধিতা না করা।'[৪৫৫] অনুরূপই মত প্রকাশ করেছেন হাফিয আল-ইরাক্বী (৭২৫হি.)[৪৫৬] এবং আস-সাখাভী (৯০২হি.)[৪৫৭]।

এর কিছু উদাহরণ হ'ল, আল-হাকিম আন-নায়সাপুরী (৪০৫হি.) একটি হাদীছ বর্ণনার পর বলেন, هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن 'হাদীছটির বর্ণনাকারীগণ ইমাম এবং ছিকাহ। কিন্তু সনদ ও মতনের দিক থেকে তা শায।'[৪৫৮]

খত্বীব আল-বাগদাদী (৪৫৬হি.) আবূ বকর (রা.)-এর ফযীলত বর্ণনায় একটি হাদীছ উল্লেখ করার পর বলেন, لا يثبت هذا الحديث، ورجال إسناده كلهم ثقات 'হাদীছটি ছহীহ সাব্যস্ত হয়নি, যদিও তার সনদের রাবীগণ প্রত্যেকেই শক্তিশালী।'[৪৫৯]

আয-যাহাবী (৭৪৮হি.) একটি হাদীছ বর্ণনা করার পর বলেন, وهو مع نظافة سنده حديث منكر جدا 'হাদীছটির সনদ স্বচ্ছ হ'লেও হাদীছটি খুবই অগ্রহণযোগ্য।'[৪৬০] অন্যত্র তিনি বলেন, رواته ثقات ونكارته بينة 'বর্ণনাকারী শক্তিশালী, তবে এর অগ্রহণযোগ্যতা সুস্পষ্ট।'[৪৬১]

---

৪৫৫. ইবনুল কাইয়িম, *আল-ফুরূসাহ* (হায়েল, সঊদীআরব : দারুল আন্দালুস, ১৯৯৩খ্রি.), পৃ. ২৪৫।
৪৫৬. আস-সাখাভী, *ফাতহুল মুগীছ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯।
৪৫৭. তদেব।
৪৫৮. আল-হাকিম, *মা'রিফাতুল উলূমিল হাদীছ*, পৃ. ১১৯।
৪৫৯. খত্বীব আল-বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৫।
৪৬০. আয-যাহাবী, *মীযানুল ই'তিদাল*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৩।
৪৬১. তদেব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২১।

ইবনুল কাইয়িম (৭২৮হি.) একটি হাদীছ إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه 'যদি কোন লোক হাদীছ বর্ণনার সময় হাঁচি দেয়, তবে সেটি তার সত্যবাদিতার দলীল।' হাদীছটি বর্ণনার পর তিনি বলেন, وهذا وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه لأنا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله 'হাদীছটির সনদ কতিপয় ব্যক্তি ছহীহ বললেও আমাদের যুক্তিবোধ হাদীছটি জাল হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। কেননা আমরা হাঁচিদাতাকে দেখি এবং মিথ্যা তার কাজ করে যায় (হাঁচিদাতা তার কর্ম তথা মিথ্যাচার ঠিকই করে যায়)।[৪৬২]

এসকল উদাহরণ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, হাদীছের সনদ ছহীহ হওয়ার পরও মুহাদ্দিছগণ মতনে ত্রুটি পেলে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এবং তার দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন। এই সকল উদাহরণই প্রাচ্যবিদদের ধারণা খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট।

চ. এটা সত্য যে, মুহাদ্দিছগণ সনদ ও মতন উভয়কে গুরুত্ব দিলেও প্রাথমিকভাবে ইসনাদের বিশুদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এটা এই কারণে যে, অনেক হাদীছের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রকৃত বাস্তবতা আল্লাহ অধিক অবগত রয়েছেন, যা মানুষের সীমিত বুদ্ধির অতীত। যেমন আল্লাহ্র গুণাবলী, গায়েবী বিষয়সমূহ কিংবা রাসূল (ছা.)-এর মু'জিযা ও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ প্রভৃতি। এসকল ক্ষেত্রে তাঁরা কখনও নিজের যুক্তি ও বুদ্ধি ব্যবহার করে হাদীছটি অস্বীকার করেন না। বরং বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতার প্রতি আস্থা রেখে হাদীছটির মতন ছহীহ আখ্যা দেন। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা হাদীছ সমালোচনার নামে সামান্য সন্দেহ হ'লেই তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন হাদীছ বর্জন করতেন না। তাঁরা নিরেট বুদ্ধিপূজারী ছিলেন না এবং অনর্থক জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় নিতেন না। বরং প্রতিটি হাদীছকে তথ্যসূত্র, বাস্তবতা ও বুদ্ধিমত্তার সুসমন্বয় করে অত্যন্ত দূরদর্শীতার সাথে বিচার-বিশ্লেষণ করতেন। আর এ কারণেই তাঁদের গবেষণা এতটা নির্মোহ, ত্রুটিমুক্ত ও কালোত্তীর্ণ হয়েছে।[৪৬৩] তৎকালীন মু'তাযিলা যুক্তিবাদীরা বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগের মাধ্যমে যে সকল হাদীছ তাদের চিন্তাধারার সাথে মিলত না, তা বর্জন করত। এজন্য

৪৬২. ইবনুল কাইয়িম, *আল-মানারুল মুনীফ ফিছ ছহীহ ওয়ায যঈফ* (জেদ্দা : দারু আ'লামিল ফাওয়াইদ, তাবি), পৃ. ৩৭-৩৮।

৪৬৩. আবূ শাহবাহ, *দিফাউন আনিস সুন্নাহ*, পৃ. ৪৩-৪৫।

মুহাদ্দিছগণ এমন নীতি অনুসরণ করেছিলেন, যাতে হাদীছের মধ্যে কেউ অনৈতিক বুদ্ধির প্রয়োগ না ঘটাতে পারে।

এই নীতির স্বরূপ সম্পর্কে ইবনু কুতায়বা (২০৪হি.) বলেন, 'আল্লাহ্র গুণাবলীর ব্যাপারে রাসূল (ছা.) যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আমরা কেবল সেখানেই আশ্রয় গ্রহণ করি। তাঁর পক্ষ থেকে যা ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে আমরা অস্বীকার করি না এই যুক্তি দেখিয়ে যে তা আমাদের নিজস্ব চিন্তা বা ধারণার সাথে খাপ খায় না এবং আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তা সঠিক মনে হয় না।... আমরা আশা করি এই পথেই রয়েছে মুক্তি এবং ভবিষ্যতে সকলপ্রকার ভিত্তিহীন খেয়াল-খুশি থেকে পরিত্রাণ লাভ।'[৪৬৪] আর এ জন্যই তাঁরা ইসনাদের প্রতি এত গুরুত্ব দিতেন, যেহেতু একমাত্র এর মাধ্যমেই জাল হাদীছ রচনা প্রতিরোধ করা ও হাদীছকে বুদ্ধিপূজারীদের অপলাপ থেকে রক্ষা করা সম্ভব।[৪৬৫]

জোনাথান ব্রাউন বলেন, 'প্রাথমিক যুগের সুন্নী মুসলমানগণ পূর্ববর্তীদের পথভ্রষ্টতার কারণ হওয়া ত্রুটিপূর্ণ যুক্তিভিত্তিক মূলনীতির দারস্থ না

---

৪৬৪. نحن لا ننتهي في صفاته -جل جلاله- إلا إلى حيث انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندفع ما صح عنه، لأنه لا يقوم في أوهامنا، ولا يستقيم على نظرنا. . . ونرجو أن يكون في ذلك من القول والعقد سبيل النجاة، والتخلص من الأهواء كلها غـــدا। দ্র. ইবনু কুতায়বাহ আদ-দিনওয়ারী, *তা'ভীলু মুখতালাফিল হাদীছ*, পৃ. ৩০১।

৪৬৫. আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (১৮১হি.) বলতেন, الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال مـــن شــــاء مـــا شــــاء 'ইসনাদ হ'ল দ্বীনের অংশ। যদি ইসনাদ না থাকত, তবে (দলীলহীনভাবে) যে যা খুশী বলত'। দ্র. *ছহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫; ইবনু আব্বাস (রা.) বলতেন, إن هذا العلم دين، فأجيزوا الحديث ما أسند إلى نبيكم 'নিশ্চয়ই এই জ্ঞান হ'ল আমাদের ধর্ম। সুতরাং তোমরা সেসকল হাদীছকে গ্রহণ কর, যার সনদ তোমাদের নবী পর্যন্ত পৌঁছেছে। দ্র. ইবনু আদী, *আল-কামিল ফী যু'আফাইর রিজাল* (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৭খ্রি.), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭)। ইমাম আশ-শাফেঈ (২০৪হি.) বলেন, من لم يسأل من أين؟ فهو كحاطب ليل يحمل على ظهره حزمة حطب، فلعل فيها أفعـــى تلدغـــه 'যে ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে না যে, কোথা থেকে পেয়েছে (অর্থাৎ ইসনাদ)? সে হ'ল রাতে আঁধারে লাকড়ি সংগ্রহকারী, যে তার কাঁধে কাষ্ঠের বোঝা বহন করেন। হ'তে পারে তাতে সাপ রয়েছে, যা তাকে দংশন করতে পারে'। দ্র. ইবনু আদী, *আল-কামিল ফী যু'আফাইর রিজাল*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬।

হয়ে ইসনাদ সমালোচনা নীতি অবলম্বন করেছিলেন, যাতে এর মাধ্যমে হাদীছের শব্দগত বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করা যায়।'[৪৬৬]

দ্বিতীয়ত, হাদীছের বর্ণনাকারীগণ হ'লেন মূলভিত্তি। যদি ভিত্তিই দুর্বল হয়, তবে তাতে নির্মিত অবকাঠামোও দুর্বল হয়। এ জন্য মুহাদ্দিছগণ প্রথমত হাদীছের সনদের প্রতি লক্ষ্য করেন। আর সনদ সমালোচনা সবসময় নৈর্ব্যক্তিক (Objective) ও তথ্যনির্ভর হয়, কিন্তু মতন সমালোচনায় এই নৈর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখা প্রায়শই সম্ভব হয় না। কেননা যিনি সমালোচক তিনি অনেক ক্ষেত্রে হাদীছটির অর্থ ও ব্যাখ্যা ভুলভাবে বুঝতে পারেন। আবার সমালোচক ভেদে মতনের অর্থ নানাভাবে গ্রহণ করতে পারেন। ফলে সনদ সমালোচনা অধিকতর নিরাপদ, বিতর্কমুক্ত এবং বিজ্ঞানভিত্তিক। আর এজন্যই প্রথমত সনদ সমালোচনাকে মুহাদ্দিছগণ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অতঃপর সনদ ত্রুটিমুক্ত পেলে তাঁরা মতনের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। এখান থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, তাদের গবেষণারীতি কতটা নৈর্ব্যক্তিক এবং বস্তুনিষ্ঠ।

ছ. পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের হাদীছ সমালোচনায় হাদীছের মতন বা বিষয়বস্তুর সমালোচনা তুলনামূলক কম দৃশ্যমান হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জোনাথান ব্রাউন (জন্ম : ১৯৭৭খ্রি.) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমা গবেষকদের এই ধারণা ভুল যে, মুহাদ্দিছগণ মতন বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি হিজরী ৩য় ও ৪র্থ শতকের হাদীছ সমালোচকদের নীতিসমূহ পর্যালোচনা করে নিজের ৩টি পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেছেন। যথা : (১) প্রাথমিক হাদীছ সমালোচকগণের নিকট মতন সমালোচনা একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় ছিল এবং তিনি তা এ সম্পর্কিত ১৫টি উদাহরণ দিয়েছেন। (২) তাঁরা সচেতনভাবেই এমন একটি অবস্থান তুলে ধরেছিলেন যে, হাদীছের সনদই তাদের প্রধান মনোযোগের বিষয়। আর তারা এমনটি করেছিলেন প্রতিপক্ষ যুক্তিবাদী মু'তাযিলাদের আক্রমণ থেকে হাদীছ শাস্ত্রকে রক্ষার জন্য। (৩) ৬ষ্ঠ হিজরী শতকে এসে যখন মুহাদ্দিছগণ প্রকাশ্যভাবে হাদীছের মতন বা বিষয়বস্তুর সমালোচনা শুরু করেন এবং তখন দেখা গেছে যে সকল হাদীছকে

---

৪৬৬. Early Sunni Muslims developed their methods of isnad criticism in an effort to assure the textual authentieity of the Sunna without relying on the same flawed rational faculties that had led earlier nations astray. See : Jonathan A. C. Brown, *Hadith : Muhammad's Legacy*, p. 272.

তারা জাল হাদীছ হিসাবে চিহ্নিত করলেন, তা অতীতেই সনদের ত্রুটির জন্য বর্জিত হয়েছিল।[৪৬৭]

এখান থেকে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পূর্ববর্তীদের সনদ সমালোচনা এবং পরবর্তীদের মতন সমালোচনার মধ্যে গভীর আন্তঃসম্পর্ক ছিল। তাঁর মতে, পূর্ববর্তী সমালোচকগণ তাঁদের সনদ সমালোচনার অভ্যন্তরে মতন সমালোচনাও করতেন। কিন্তু যুক্তিবাদীদের হাত থেকে হাদীছ শাস্ত্রকে রক্ষা করার জন্য তারা সেটিকে সরাসরি মতন সমালোচনা হিসাবে উল্লেখ করেননি।[৪৬৮] তারা মতনে কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হ'লে বর্ণনাটির কোন রাবীর মধ্যে মূল সমস্যাটি নিহিত রয়েছে বলে অনুমান করতেন।

এ বিষয়ে জোনাথন ব্রাউনের অনুসিদ্ধান্তটি আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী (১৯৬৬খ্রি.) পূর্বেই উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন, صار الغالب أن لا يوجد حديث منكر إلا وفي سنده مجروح، أو خلل، فلذلك صاروا إذا استنكروا الحديث نظروا في سنده فوجدوا ما يبين وهنه فيذكرونه، وكثيراً ما يستغنون بذلك عن التصريح بحال المتن 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে, এমন কোন মুনকার বা অগ্রহণীয় হাদীছ পাওয়া যায় না, যার সনদে ত্রুটি নেই। এজন্য মুহাদ্দিছগণ যখনই কোন হাদীছকে অগ্রহণযোগ্য মনে করতেন, তখন তার সনদের দিকে দৃষ্টি দিতেন এবং তাতে হাদীছটি বাতিল হওয়ার প্রমাণ পেয়ে গেলে তা বর্ণনা করতেন। ফলে অধিকাংশ সময় তারা স্পষ্টভাবে মতনের সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না।'[৪৬৯] তিনি আরও

---

৪৬৭. Jonathan A. C. Brown, *How We Know Early Hadīth Critics Did Matn Criticism and Why It's so Hard to Find*, p. 143.

৪৬৮. তিনি বলেন, They felt themselves locked in a terrible struggle with rationalists who mocked their reliance on the isnad and saw content criticism as the only true means of evaluating the authenticity of hadiths.To acknowledge a problem in the meaning of a hadlth without arriving at that conclusion through an analysis of the isnad would affirm the rationalist methodology. For this reason, content criticism had to be concealed in the language of isnad criticism (Jonathan A. C. Brown, *How We Know Early Hadīth Critics Did Matn Criticism and Why It's so Hard to Find*, p. 183).

৪৬৯. আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী, *আল-আনওয়ারুল কাশিফাহ*, পৃ. ২৬৩-২৬৪।

বলেন, ইবনুল জাওযী'র 'আল-মাওযূ'আত' গ্রন্থটির প্রতি লক্ষ্য কর, তাহ'লে দেখবে তাঁর সমালোচনা মতনকে ভিত্তি করেই। কিন্তু খুব কম সময়ই তিনি তা স্পষ্ট করে বলেছেন। বরং তিনি সনদের সমালোচনাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। তেমনিভাবে 'ইলমুল ইলাল'-এর গ্রন্থসমূহে এবং রাবীদের জীবনীগ্রন্থে দেখবে, যে সকল হাদীছের সমালোচনা করা হয়েছে, তার অধিকাংশেরই মতনে ত্রুটি রয়েছে। কিন্তু তারা সেখানে কেবল বর্ণনাকারীকে 'মুনকার' বা অনুরূপ কোন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন।[৪৭০]

জ. পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ যেহেতু সনদ সমালোচনার মাঝেই মতন সমালোচনা করতেন, সেহেতু তাঁরা মতন বিষয়ক বিশেষ কোন নীতিমালা প্রণয়ন করেননি। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ এ বিষয়ে বেশ কিছু নীতিমালা তৈরী করেছেন এবং যঈফ ও জাল হাদীছের পৃথক সংকলন তৈরী করেছেন। জাল হাদীছ বিষয়ক রচনাগুলি হ'ল মুহাম্মাদ ইবনু তাহির আল-মাক্বদাসী (৫০৭হি.) সংকলিত تذكرة الموضوعات, আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (৫৯৭হি.) সংকলিত الموضوعات, রাযিউদ্দীন আছ-ছাগানী (৬৫০হি.) সংকলিত الموضوعات, জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী (৯১১হি.) সংকলিত اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة, নূরুদ্দীন ইবনু আর্রাক (৯৬৩হি.) সংকলিত تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, তাহির পাট্টানী (৯৮৬খ্রি.) সংকলিত تذكرة الموضوعات, মোল্লা আলী ক্বারী (১০১৪হি.) সংকলিত الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة এবং المصنوع في معرفة الحديث الموضوع, আশ-শাওকানী (১২৫৫হি.) রচিত الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। তবে জাল হাদীছ চিহ্নিতকরণের নীতিমালা বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ হ'ল আবূ আব্দুল্লাহ আল-জাওরাক্বানী (৫৪৩হি.) সংকলিত الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير। অতঃপর আবূ হাফছ আল-মূছীলী (৭২২হি.) সংকলিত المغني عن الحفظ والكتاب এ বিষয়ক অপর গ্রন্থটি রচনা করেন। আর এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হ'ল ইবনু ক্বাইয়িম (৭৫১খ্রি.) সংকলিত المنار

৪৭০. তদেব, পৃ. ২৬৪।

المنيف في الصحيح والضعيف। এই গ্রন্থে তিনি জাল হাদীছ চিহ্নিত করার জন্য সনদ বহির্ভূত পারিপার্শ্বিক কারণসমূহ একত্রিত করেছেন এবং এ বিষয়ে পূর্ববর্তী বিদ্বানদের গৃহীত নীতিমালা একত্রিত করেছেন। তিনি মোট **১৩টি** নীতি উল্লেখ করেছেন। যেমন : (১) হাদীছটির ভাষা এমন হওয়া যা রাসূল (ছা.) ব্যবহার করতে পারেন না। (২) হাদীছটি এমন হওয়া যে স্বাভাবিক যুক্তিবোধ তাকে মিথ্যা মনে করে। (৩) হাদীছটির ভাষা এমন স্থূল হওয়া যে তা হাস্যকর মনে হয়। (৪) হাদীছটির ভাষা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত কোন সুন্নাহ্র বিরোধী হবে না। (৫) হাদীছটি কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনার বিরোধী হওয়া প্রভৃতি।[৪৭১]

সুতরাং মুহাদ্দিছগণ একদেশদর্শীভাবে কেবল সনদের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হওয়া মাত্রই হাদীছটি গ্রহণযোগ্য বলে রায় দিতেন, হাদীছের মতন বা বিষয়বস্তুর কোন ভুলকে আমলে নিতেন না– এই দাবী ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। বরং মুহাদ্দিছগণ শুরু থেকে সনদ ও মতন উভয়ই তাদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে রেখেছিলেন, যা হাদীছ শাস্ত্রের যে কোন ছাত্রই অবগত রয়েছেন। পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ এই নীতিমালা তাঁদের গ্রন্থসমূহে সংকলন করে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করেছেন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, মুহাদ্দিছদের মতন বিশ্লেষণ এবং প্রাচ্যবিদসহ অন্যান্যদের মতন বিশ্লেষণের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। কেননা মুহাদ্দিছরা হাদীছকে অহী হিসাবে বিশ্বাস করেন বলে কোন প্রকার সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া মাত্র তা পরিত্যক্ত ঘোষণা করেন না, বরং আমানতদারিতার সাথে সার্বিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যান্যরা যেহেতু কোন বিশ্বাস ও দায়িত্ববোধের অধীন নন, সেহেতু কোন বিষয়বস্তু বাহ্যিকভাবে তাদের বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার বিরোধী হওয়া মাত্র তা অস্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

---

৪৭১. ইবনুল কাইয়িম, *আল-মানারুল মুনীফ ফিছ ছহীহ ওয়ায যঈফ*, পৃ. ৩৬-৪৬। এছাড়া আর কিছু নীতিমালা উল্লেখ করেছেন সমকালীন বিদ্বানগণ। দ্র. আস-সিবাঈ, *আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা*, পৃ. ২৭১-২৭২, ড. মুহাম্মাদ লুকমান আস-সালাফী, *ইহতিমামুল মুহাদ্দিছীন*, পৃ. ৩৯৮-৪০০; ইছাম আহমাদ আল-বাশীর, *উছূলু মানহাজিন নাকদ ইনদা আহলিল হাদীছ*, পৃ. ৯২-৯৯।

সংশয়-৩ : প্রথম হিজরী শতাব্দীতে হাদীছের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

জোসেফ শাখত বলেন, নবী মুহাম্মাদ প্রবর্তিত ধর্মে আইন রচনার কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল না। ছাহাবীগণের সময়ও হাদীছ সংকলিত হয়নি। বরং ২য় ও ৩য় শতাব্দীর মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণ নিজেদের মতকে আইনী ভিত্তি দেয়ার জন্য হাদীছ রচনা করেছেন। তাঁর মতে, ইমাম শাফেঈ এই কর্মের জন্য মূল দায়ী ব্যক্তি ছিলেন।[৪৭২] সুতরাং শারঈ বিধান সংবলিত হাদীছসমূহ তাঁর মতে সবই বানোয়াট। তিনি বলেন, Every legal tradition from the Prophet, until the contrary is proved, must be taken not as authentic অর্থাৎ নবী থেকে বর্ণিত প্রতিটি আহকাম সংক্রান্ত হাদীছ অবশ্যই নির্ভরযোগ্য মনে করা যাবে না, যতক্ষণ না তার বিপরীত কিছু প্রমাণিত হয়।[৪৭৩] এর প্রমাণ হিসাবে তিনি ব্যবহার করেছেন *Argument e Silentio* বা নীরবতা তত্ত্ব । এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, খ্যাতনামা তাবেঈ হাসান বছরী (১১০ হি.) উমাইয়া শাসক আব্দুল মালিক (৮৬ হি.)-কে ক্বাদারিয়া মতবাদ থেকে সতর্ক করার জন্য যে পত্র প্রেরণ করেন তাতে আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন হাদীছ উল্লেখ করেননি, বরং শুধু কুরআনের আয়াত এবং পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যদি এই বিষয়ক কোন হাদীছের অস্তিত্ব সেই যুগে থাকত তবে তিনি তা নিশ্চয়ই উল্লেখ করতেন। সুতরাং তাঁর এই উল্লেখ না করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর সময়কালে অনুরূপ কোন হাদীছের অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং তাক্বদীর বিষয়ক হাদীছগুলি সবই জাল।[৪৭৪]

তিনি মনে করেন, প্রাথমিক যুগে হাদীছ ইসলামী শরী'আতের কোন উৎস ছিল না, বরং তা পরবর্তীকালে সৃষ্ট। ইমাম শাফেঈর পূর্ববর্তী দুই প্রজন্মেও রাসূলের হাদীছ দ্বারা দলীল দেয়ার প্রবণতা ছিল স্বল্প; বরং ছাহাবা ও

---

৪৭২. তিনি বলেন, "a great many traditions in the classical and other collections were put into circulation only After Shafi'i's time; the first considerable body of legal traditions from the prophet originated toward the middle of the second century". See : Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, p. 4.

৪৭৩. Ibid, p. 149.

৪৭৪. Ibid, p. 149, 151.

তাবেঈনের 'আছার'কেই সে যুগে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত এবং কখনো কখনো রাসূল কিংবা ছাহাবীদের আমলের পরিবর্তে সামাজিক প্রথাকে অগ্রাধিকার দেয়া হ'ত। রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ থেকে দলীল দেয়ার প্রবণতা ছিল নিতান্তই ব্যতিক্রম। কিন্তু ইমাম শাফেঈ এই ব্যতিক্রমকে নিয়মে পরিণত করেন এবং রাসূল (ছা.)-এর হাদীছকে ইসলামী শরীআ'তের অপরিহার্য উৎসে পরিণত করেন। তাঁর এই ভূমিকার সূত্র ধরে অসংখ্য জাল হাদীছ রচিত হয় এবং রাতারাতি বিশাল হাদীছ সম্ভার গড়ে ওঠে। আর হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করার জন্য তাতে ভুয়া ইসনাদ জুড়ে দেয়া হয়।[৪৭৫]

পর্যালোচনা :

প্রথম যুগে হাদীছের কোন অস্তিত্ব ছিল না- মর্মে জোসেফ শাখতের উদ্ভাবিত তত্ত্ব এবং অনুসন্ধানসমূহ ভিত্তিহীন। নিম্নে তাঁর এই তত্ত্ব খণ্ডন করা হ'ল।

ক. জোসেফ শাখতের প্রাথমিক অনুসিদ্ধান্তই হ'ল কুরআন ও হাদীছ ইসলামী শরীআ'তের উৎস নয়। কিন্তু এ ব্যাপারে যদি পাল্টা প্রশ্ন করা হয় যে, তবে ফক্বীহরা কোন নীতির আলোকে এত সুসংহত ইসলামী ফিকহের উৎপত্তি ঘটালেন? এর ঐতিহাসিক ভিত্তি ও কার্যকারণ কী? এর উত্তরে শাখতসহ প্রাচ্যবিদরা কোন গবেষণামূলক জবাব না দিয়ে চটজলদি দাবী করেছেন যে, তৎকালীন রোমান ও পারসিক সাম্রাজ্যে প্রচলিত আইনসমূহকে মুসলমানরা নিজ দেশের শাসনব্যবস্থায় প্রয়োগ করেছিলেন।[৪৭৬] কিন্তু এর সপক্ষে কোন বোধগম্য দলীল তাঁরা উপস্থাপন করতে পারেন নি। মূলত মুসলিম ফক্বীহগণ নিজস্ব সূত্র তথা কুরআন ও হাদীছ থেকে ইসলামী আইন রচনা করেছেন−এই বিষয়টি যখন বাতিল ঘোষণা করা হয়, তখন ইসলামী আইন রচনায় বৈদেশিক প্রভাব ছিল এমন একটি সহজ ব্যাখ্যা দাঁড় করানো ছাড়া উপায় থাকে না। ইহুদী প্রাচ্যবিদ তেলআবিবের Bar-Ilan বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জেভ মাঘেন (জন্ম : ১৯৬৪খ্রি.) যর্থার্থই প্রশ্ন তুলে বলেছেন, জোসেফ শাখত এবং তাঁর গবেষণাকে যারা সাদরে বরণ করে নিয়েছেন, তারা ইসলামী আইনশাস্ত্র এবং অনুশাসনের উৎস সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন, যদি তা কুরআন এবং হাদীছ থেকে গৃহীত না হয়ে থাকে? আর এর বিকল্প হিসাবে শাখত কি

---

৪৭৫. Ibid, p. 64.

৪৭৬. Joseph Schacht, *'Foreign Elements in Ancient Islamic Law' (Journal of Comparative Legislation and International Law*, Cambridge, Vol. 32, No. 3/4, 1950), p. 9-17.

কোন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে দাঁড় করানোর পদক্ষেপ নিয়েছেন? নয়েল কৌলসন (১৯৮৬খ্রি.) যাকে "void which is assumed, or rather created" 'এক কল্পিত বরং মানবসৃষ্ট শূন্যতা' বলে অভিহিত করেছেন, তা পূরণে তারা কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন? বস্তুত শাখতের সমর্থকগণ এই সমস্যাটি বহুলাংশে এড়িয়ে গেছেন।'[৪৭৭]

খ. প্রাথমিক যুগে হাদীছের অস্তিত্ব না থাকার প্রশ্নে 'নীরবতা তত্ত্ব' প্রমাণে শাখত হাসান বছরী (১১০হি.)-এর একটি পত্রকে প্রমাণ হিসাবে নিয়েছেন। এই দলীল থেকে বড়জোর এতটুকু প্রমাণ করা সম্ভব যে, হাসান বছরী (রা.) হয়তবা সে সময় এ বিষয়ক হাদীছগুলি বর্ণনার প্রয়োজন বোধ করেননি, কেবল কুরআন থেকে এবং নবীদের জীবনী থেকে দলীল প্রদানই যথেষ্ট মনে করেছিলেন। তাছাড়া হ'তে পারে প্রাথমিক যুগে হাদীছসমূহ একত্রিতভাবে সংকলিত না থাকায় এ বিষয়ক হাদীছসমূহ তাঁর নিকট সে সময় পৌঁছে নি। অথবা অন্য কারণও থাকতে পারে। কিন্তু শাখত এর ভিত্তিতে তাক্বদীর বিষয়ক সকল হাদীছ জাল প্রমাণ করেছেন। প্রশ্ন হ'ল, দলীলটি যদি শাখতের সপক্ষের দলীলও ধরা হয়, তবুও মাত্র একটি দলীল কীভাবে এমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যথেষ্ট হ'তে পারে?

মুছত্বফা আল-আ'যামী শাখতের এই দলীলটি উল্লেখ করে বলেন, এই পত্রটি সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। (১) শাখত নিজেই পত্রটি হাসান বছরী'র কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। (২) পত্রটি হাসান বছরী'র বলে অনুমিত হয় না। কেননা হাসান বছরী একজন মুহাদ্দিছ। সে যুগের রীতি অনুসারে যে কোন লিখিত বস্তুতে ইসনাদের ব্যবহার থাকত, যা এখানে অনুপস্থিত। (৩) পত্রটি হাসান বছরী'র মেনে নিলেও এই পত্রে তিনি ক্বাদরিয়াদের কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা সম্পর্কে খলীফাকে সতর্ক করেছেন এবং অন্যান্য আয়াত দ্বারা তাদের মতবাদ খণ্ডন করেছেন। এখানে

৪৭৭. Where do Joseph Schacht and the scholars who have embraced his thesis think Islamic jurisprudence and positive law came from, if not from Qur'an and Hadith? What are the substitute historical processes with which Schacht attempts to fill in what Noel Coulson aptly refers to as the "void which is assumed, or rather created" by his own thesis? Schacht's supporters have largely side-stepped this issue. See : Ze'ev Maghen, *'Dead Tradition: Joseph Schacht and the Origins of Popular Practice'*, p. 280।

হাদীছ বর্ণনার কোন উপলক্ষ্য ছিল না বলে তিনি কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নি। (৪) এই পত্রে হাদীছের গুরুত্বই বরং ফুটে উঠেছে। কেননা খলীফা যখন হাসান বছরীর নিকট জানতে চান যে, ক্বাদরিয়াদের 'স্বাধীন ইচ্ছা' বিষয়ক মতবাদটি সঠিক কিনা, তখন তিনি এও জানতে চান যে এ বিষয়ে তিনি ছাহাবীদের কোন বর্ণনা পেয়েছেন কি না। হাসান বছরী উত্তরে বলেন যে, ছাহাবীগণ এর পক্ষে বা বিপক্ষে মন্তব্য করেন নি। এখানে খলীফা এবং হাসান বছরী উভয়ই তাক্বদীর বিষয়ে ছাহাবীদের বর্ণনা তথা হাদীছ সম্পর্কে বাক্যবিনিময় করেছেন, অর্থাৎ এতে তাঁদের নিকট হাদীছের গুরুত্বই স্পষ্ট হয়। সুতরাং এই বর্ণনা শাখতের তত্ত্বের পক্ষে কোন দলীল বহন করে না।[৪৭৮]

এই তত্ত্বটি কতটা ভঙ্গুর ও অগ্রহণযোগ্য তার একটি উদাহরণ হ'ল من كذب علي متعمدا فاليتبوأ مقعده من النار 'যে ব্যক্তি আমার ওপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়' হাদীছটি সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের অভিমত। যেমন পাকিস্তানী বিদ্বান জনাব ফযলুর রহমান যিনি শাখতের 'নীরবতা তত্ত্ব'কে too sweeping (খুবই নির্বিচার তত্ত্ব) আখ্যা দিয়েছেন[৪৭৯], অথচ উপরোক্ত হাদীছটি অস্বীকার করার সময় তিনিও 'নীরবতা' যুক্তি অবলম্বন করেছেন। তিনি বলেন যে, আবূ ইউসুফ (১৮২হি.) তাঁর গ্রন্থে জাল হাদীছ রচনা সম্পর্কে সতর্কীকরণের জন্য বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে উপরোক্ত প্রসিদ্ধ হাদীছটি তিনি উল্লেখ করেন নি। এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি হাদীছটি জানতেন না।[৪৮০] অথচ ফযলুর রহমান লক্ষ্য করেননি যে, আবূ ইউসুফ তাঁর অপর গ্রন্থ 'কিতাবুল আছার'-এ হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।[৪৮১] অনুরূপভাবে জুইনবলও মনে করেন যে, হাদীছটির জন্ম ১৮০ হিজরীর পর। যেহেতু তিনি ভেবেছিলেন যে, হাদীছটি প্রথম আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী (২০৪হি.) তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হেরাল্ড মোজকি তাঁর এই ভ্রান্ত ধারণা চিহ্নিত করে বলেন, মা'মার ইবনু রাশেদ (১৫৩হি.) এর পূর্বেই হাদীছটি তাঁর গ্রন্থে ৩টি সূত্রে উল্লেখ করেছেন।[৪৮২] অর্থাৎ জুইনবলের ধারণাও ভুল। তিনি বলেন, এই উদাহরণ

---

৪৭৮. Mustafa al-Azami, *On Schacht's Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, p. 125-126.

৪৭৯. Fazlur Rahman, *The Methodology in History*, p.71

৪৮০. Ibid, p.36

৪৮১. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল আছার*, হা/৯২২।

৪৮২. মা'মার ইবনু রাশেদ, *আল-জামি'* (মুছান্নাফ আব্দুর রায্যাকের সাথে সংযুক্ত), হা/২০৪৯৩-২০৪৯৫।

থেকে আরও প্রমাণিত হয়ে যে, ‘নীরবতা তত্ত্ব’-এর উপর ভিত্তি করে হাদীছের জন্মকাল নির্ণয় করতে যাওয়া কতটা ভয়ানক বিভ্রান্তির জন্ম দিতে পারে।[৪৮৩]

সুতরাং উপরোক্ত উদাহরণদ্বয় থেকে সহজেই অনুমেয় যে, সামান্য তথ্যের অপ্রাপ্তি কিংবা অজ্ঞতার কারণে এই তত্ত্ব কতটা হাস্যকরভাবে ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে। এতদসত্ত্বেও কীভাবে এই অতীব দুর্বল তত্ত্বটি তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হ’ল, তা বিস্ময়কর।

মুছত্বফা আল-আ‘যামী (২০১৭খ্রি.) হাদীছ শাস্ত্র জাল প্রমাণে ‘নীরবতা তত্ত্ব’-এর ব্যবহারকে অন্যায্য অনুমান (Unwarranted Assumption) এবং অবৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি (Unscientific research method) আখ্যায়িত করে বলেন, শাখতের দাবী মেনে নিলে আরও কয়েকটি বিষয় মেনে নিতে হবে। যেমন : (১) যদি নির্দিষ্ট কোন হাদীছ কোন বিদ্বান উল্লেখ না করে থাকেন, তবে তা হাদীছটি সম্পর্কে সেই বিদ্বানের অজ্ঞতার প্রমাণ বহন করবে। (২) পূর্ববর্তী বিদ্বানদের সমস্ত লেখনী মুদ্রিত হ’তে হবে এবং কোনটাই হারানো চলবে না, যাতে তাদের সমস্ত রচনা আমাদের হস্তাগত হয়। (৩) একজন বিদ্বানের কোন হাদীছ সম্পর্কে অজ্ঞতা সে হাদীছটির অস্তিত্বহীনতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। (৪) একটি নির্দিষ্ট সময়ে একজন বিদ্বান যা জানেন তা তার সমকালীন সকল বিদ্বানকে অপরিহার্যভাবে জানতে হবে। (৫) একজন বিদ্বান যখন কোন বিষয়ে রচনা করেন, তখন তাকে সে বিষয়ক যাবতীয় প্রমাণাদি ব্যবহার করতে হবে। অতঃপর তিনি বলেন, সাধারণ যুক্তিবোধ ব্যবহার করলেই উপলব্ধি করা যায় যে, উপরোক্ত বিষয়গুলি কখনও প্রমাণ করা সম্ভব নয় এবং সেই সাথে শাখতের এই তত্ত্ব কতটা অর্থহীন ও অবান্তর।[৪৮৪]

গ. ইমাম শাফেঈ (২০৪হি.)-এর পূর্বে হাদীছ মুসলিম সমাজে বিশেষ গুরুত্ব পেত না বলে যে মন্তব্য করেছেন জোসেফ শাখত, তা দলীলবিহীন। মুসলিম সমাজে কোনকালেই রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ্র উপস্থিতিতে অন্য কারও মন্তব্য বা আচার-প্রথা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বরং কতিপয় ফক্বীহ বিশুদ্ধ সুন্নাহ চিহ্নিত করার জন্য যে সকল যুক্তিভিত্তিক মূলনীতি তৈরী করেছিলেন কিংবা মদীনা বা কূফায় পূর্ব থেকে চলে আসা আমল কিংবা ছাহাবীদের বক্তব্যকে অধিক গুরুত্ব

---

৪৮৩. Herald Motzki, *'Dating Muslim Traditions'*, p. 218-219.

৪৮৪. Mustafa al-Azami, *On Schacht's Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, p. 118-119.

প্রদান- প্রভৃতি বিষয় কেবল এজন্যই ছিল যে, তারা মাসআলাগত বিভক্তির সময় রাসূল (ছা.)-এর প্রকৃত সুন্নাহ্‌র নিকটবর্তী হ'তে চেয়েছিলেন। ইমাম মালিক মদীনাবাসীর আমলকে কেবল এই জন্যই দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন যে, তাদের কাছে সুন্নাহ্‌র জ্ঞান অধিকতর ছিল।[৪৮৫] ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ অসংখ্যবার এমন মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, হাদীছই তাঁদের নিকট সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কোন হাদীছ বিশুদ্ধ সূত্রে পেলে তাঁরা তাঁদের মতবাদকে পরিবর্তন করতে মোটেও দ্বিধা করতেন না। সুতরাং ইমাম শাফেঈ'র পূর্বে মুসলিম বিদ্বানগণ রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহকে গুরুত্ব দিতেন না এবং আশ-শাফেঈ (২০৪হি.) সর্বপ্রথম রাসূল (ছা.)-এর হাদীছকে শারঈ মর্যাদা দেন, এ বক্তব্য ভিত্তিহীন।

ঘ. শাখতের যুক্তি 'প্রাথমিক যুগের বিদ্বানগণের ফিকহী রচনায় কোন একটি হাদীছ উল্লেখিত না হওয়ার অর্থ সে সময় উক্ত হাদীছটির অস্তিত্ব ছিল না প্রমাণিত হওয়া'- প্রসঙ্গে জা'ফর ইসহাক আনছারী (২০১৬খ্রি.) তাঁর গবেষণাগ্রন্থ *The early development of fiqh in kufah* -এ ইমাম মালিক এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের 'মুওয়াত্তা' এবং ছাহিবাইন (আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান)-এর 'কিতাবুল আছার'-এ উল্লিখিত হাদীছসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এতে তিনি দেখিয়েছেন যে, 'মুওয়াত্তা মালিক'-এর অন্যান্য বর্ণনায় এমন বহু সংখ্যক হাদীছ পাওয়া গেছে যা মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের বর্ণিত 'মুওয়াত্ত্বা'-এ উল্লেখিত হয়নি। অনুরূপভাবে আবূ ইউসুফের 'কিতাবুল আছার'-এ এমন অনেক হাদীছ রয়েছে যা মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের 'কিতাবুল আছার'-এ উদ্ধৃত হয়নি। অথচ ইমাম মুহাম্মাদ ছিলেন উভয়ের পরবর্তী যুগের। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি হাদীছগুলি

---

৪৮৫. এ প্রসঙ্গে ওয়ায়েল হাল্লাক (জন্ম : ১৯৫৫খ্রি.) বলেন, It would be a mistake, however, to view the Medinese doctrine as a categorical rejection of hadith in favor of local practice, as some modern scholars have done. What was at stake for the Medinese was not a distinction between Prophetic and local, practice-based authority, but rather one between two competing conceptions of Prophetic sources of authority: the Medinan scholars conception was that their own practice represented the logical and historical (and therefore legitimate) continuation of what the Prophet lived, said and did. See : Wael b. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge : Cambridge University Press, 2005). p. 105-106.

জানতেন না। সম্ভবত পূর্ববর্তীদের গ্রন্থে তা উদ্ধৃত হওয়ায় অথবা তাঁর নিকট দুর্বল (যঈফ) প্রতীয়মান হওয়ায় হাদীছগুলি তিনি পুনরাবৃত্তি করেননি। তাছাড়া এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যে, তৎকালীন যুগের বিদ্বানগণ আইনী জবাব প্রদানে অনেক সময়ই সরাসরি কুরআনের আয়াত বা হাদীছ উল্লেখ করতেন না। যদিও এটা সুনিশ্চিত যে তারা সংশ্লিষ্ট আয়াত বা হাদীছটি জানতেন। সুতরাং শাখতের এই ধারণা ভিত্তিহীন।[৪৮৬]

ইয়াসীন ডাটন অনুরূপভাবে বলেন, নথিভুক্ত করা হয় সাধারণত সে সকল বিষয় যা অপ্রচলিত। হাদীছও এর বাইরে নয়। যেমন আযানের বিষয়টি অতি সুপ্রচলিত। সুতরাং এটি নথিভুক্ত করার প্রয়োজন সাধারণত হয় না। এ কারণেই সম্ভবত প্রাথমিক যুগে অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ হয়নি, যদিও তা নিঃসন্দেহে সুন্নাহ হিসাবে পরিগণিত ছিল। অনুরূপভাবে ফক্বীহগণ প্রধানত মনোযোগী ছিলেন আইন রচনায়। তারা প্রাপ্ত সুন্নাহ্‌র আলোকেই আইন রচনা করতেন, যদিও অনেক সময় সে বিষয়ক হাদীছটি তাদের গ্রন্থে সরাসরি উল্লেখ করতেন না। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, তারা হাদীছটি জানতেন না। এর প্রমাণস্বরূপ তিনি বৃটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী Oliver Rackham (২০১৫খ্রি.)-এর ভিন্ন প্রসঙ্গে বর্ণিত একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন, Many kinds of record over-represent the unusual; if something is not put on record, it may merely have been too commonplace to be worth mentioning 'অনেক নথি প্রধানত অপ্রচলিত বিষয়েরই প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং যদি কোন কিছু নথিভুক্ত না করা হয়, তার অর্থ হয়তবা এটা হ'তে পারে যে, বিষয়টি এমনই সুপ্রসিদ্ধ যে বিশেষভাবে তা উল্লেখযোগ্য মনে হয় নি।'[৪৮৭]

ঙ. সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এই তত্ত্ব প্রদানের সময় শাখত ও তার সমচিন্তকরা তৎকালীন মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বিন্দুমাত্র আমলে নেননি, যদিও তারা ঐতিহাসিক সমালোচনা রীতির অনুসারী বলে দাবী করেন। কেননা এটা কিভাবে সম্ভব যে আরবের লোকেরা তাদের স্বচক্ষে দেখা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কোন কথা ও কর্মকে সংরক্ষণ করবে না এবং তা পরবর্তী প্রজন্মের লোকদের নিকট বর্ণনা করবে না? সকল যুগের মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিই হ'ল তাঁরা তাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে সামান্য

---

৪৮৬. Zafar Ishaq Ansari, *The early development of fiqh in kufah*, p. 236-237.

৪৮৭. Yasin Dutton, *The Origins of Islamic Law*, p. 171-172.

কিছু হলেও সংরক্ষণ করে। সুতরাং মুসলিম উম্মাহও যদি এই স্বাভাবিক রীতি অনুসারে তাদের রাসূল (ছা.)-এর জীবন নির্দেশিকা ধরা যাক অতি স্বল্প সংখ্যক হ'লেও সংগ্রহ করে থাকে, তবে তার অস্তিত্ব কোথায়, যদি হাদীছ না থাকে? ফযলুর রহমান (১৯৮০খ্রি.) হাদীছের প্রতি সন্দেহবাদী হ'লেও স্বীকার করেছেন যে, The Arabs, who memorized and handed down poetry of their poets, sayings of ·their soothsayers and statements of their judges and tribal leaders, cannot be expected to fail to notice and narrate the deeds and sayings of one whom they acknowledged as the Prophet of God. 'আরব জাতি যারা তাদের কবিদের কবিতা, তাদের গল্পকথকদের কথাবার্তা এবং তাদের বিচারক ও গোত্রীয় নেতাদের বিবরণসমূহ মুখস্থ করত এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিত, তাদের নিকট থেকে এটা প্রত্যাশিত নয় যে তারা এমন একজন ব্যক্তির কর্মসমূহ লক্ষ্য করতে এবং তাঁর বক্তব্যসমূহ বর্ণনা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, যাকে তারা আল্লাহ্র নবী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল।'[৪৮৮]

চ. হাদীছ জালকরণ সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন শাখত, তা নতুন কিছু নয়। মুহাদ্দিছরা শুরু থেকেই জাল হাদীছ চিহ্নিত করেছেন এবং তা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ইলমুর রিজাল শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটানোই হয়েছিল এই উদ্দেশ্যে। আর শাখত যে ইমাম শাফেঈ'র ভূমিকার কারণে ২য় হিজরী শতকে জাল হাদীছ রচনা শুরু হয় অনুমান করেছেন, তারও প্রায় একশত বছর পূর্বে মুহাদ্দিছগণ জাল হাদীছের আবির্ভাব লক্ষ্য করেছিলেন এবং ইসনাদ পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে জাল হাদীছ প্রতিরোধ করে এসেছেন। সুতরাং শাখতের এই দুর্বল অনুসিদ্ধান্ত নতুন কোন জ্ঞানের দিক-নির্দেশনা দেয় না, বরং তাঁর অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটায়।

ছ. হিজরী ২য় শতকের শেষভাগে এবং ৩য় শতকে এসে হাদীছের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেল কীভাবে- এ প্রশ্নের জবাব হ'ল, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, হাদীছ প্রাথমিক যুগে মৌখিকভাবে প্রচারিত এবং সংরক্ষিত হ'ত। এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে হাদীছ লেখনী শুরু হ'লেও হিজরী ২য় শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হাদীছ লেখনীর কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করে নি। ফলে ইমাম মালিকসহ

---

৪৮৮. Muahammad Fazlur Rahman, *Islamic methodolgy in History*, p.31.

ফকীহ বিদ্বানগণ হাদীছ সংকলনগ্রন্থসমূহে তৎকালীন প্রয়োজনমাফিক কিংবা তাঁদের ব্যক্তিগত নির্বাচন থেকে সীমিত হাদীছ উপস্থাপন করেছিলেন। আর তারা একই হাদীছ বিভিন্ন সূত্র থেকে পুনরাবৃত্তিও করেননি। ফলে তাঁদের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা কম হয়েছে। কিন্তু হাদীছ সংকলনকর্ম যখন জোরদার হয় এবং মুসনাদ তথা ছাহাবীদের নামানুসারে হাদীছ সংকলন শুরু হয়, তখন একই হাদীছ অসংখ্য সূত্রে তাঁরা গ্রন্থাবদ্ধ করতে থাকেন। এ কারণেই হাদীছের সূত্রের সংখ্যা পরবর্তীগ্রন্থগুলিতে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এতেই কিছু প্রাচ্যবিদ ভুলক্রমে বুঝেছেন যে, মূল হাদীছ তথা হাদীছের মতনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তথা হাদীছ জাল করা হয়েছে। যা হাদীছ শাস্ত্র সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতার ফল।

নাবিয়া এবোট বিষয়টি সম্পর্কে তাঁদের এই ভুল ধারণা পরিষ্কার করে দিয়ে বলেন, '... that the so called phenomenal growth of Tradition in the second and third centuries of Islam was not primarily growth of content, so far as the Hadịth of Muhammad and the Hadịth of the Companions are concerned, but represents largely the progressive increase in parallel and multiple chains of transmission.' ‘হিজরী ২য় ও ৩য় শতকে হাদীছের তথাকথিত অস্বাভাবিক বিস্তার মূলত নবী মুহাম্মাদ ও তাঁর ছাহাবীদের সম্পর্কিত হাদীছের মতনের বিস্তার ছিল না। বরং তা সমান্তরাল এবং বহুসূত্রে বর্ণিত হাদীছের সনদের বিস্তার ছিল।’[৪৮৯]

তিনি আরও বলেন, ‘যদি আমরা জ্যামিতিক ক্রমবৃদ্ধির হিসাব ব্যবহার করি, তবে দেখব যে, এক থেকে দুই হাজার ছাহাবী এবং জ্যেষ্ঠ তাবেঈ যদি দুই থেকে পাঁচটি করে হাদীছ বর্ণনা করেন, তবে তৃতীয় শতাব্দীতে সংকলিত হাদীছের সমষ্টিগত সংখ্যার সাথে সহজেই তার সমন্বয় হ’তে পারে। অতঃপর যদি এটা অনুধাবন করা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে ইসনাদের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়াতে হাদীছের এই বিশাল প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, তবে ইবনু হাম্বল, মুসলিম এবং বুখারীর সংগৃহীত হাদীছের এই বিশাল সংখ্যা মোটেও অবিশ্বাস্য কিছু মনে হবে না।[৪৯০]

---

৪৮৯. Nabia Abbott, *Studies In Arabic Literary Papyri*, Vol. II, p. 2.

৪৯০. '...using geometric progression, we find that one to two thousand Companions and senior Successors transmitting two to five traditions each would bring us well within the range of the total

মুছত্বফা আল-আ'যামী (২০১৭খ্রি.) মাত্র ৩টি উদাহরণ উল্লেখ করে স্পষ্ট করেছেন যে, একটি হাদীছ কত সূত্রে বিস্তৃত হ'তে পারে। যেমন একটি হাদীছ - إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 'যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, সে যেন তার অযূর পাত্রে হাত ঢুকানোর পূর্বেই হাত ধৌত করে নেয়। কেননা তোমাদের কেউ হয়ত জানে না যে তার হাত রাতে কোথায় ছিল।'[৪৯১] এই হাদীছটি পাঁচজন ছাহাবী আবূ হুরায়রা, ইবনু উমার, জাবির, আয়েশা ও আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তাবেঈদের মধ্যে ১৬ জন এটি বর্ণনা করেছেন, যারা মদীনা, কূফা, বছরা, ইয়েমেন এবং সিরিয়ার অধিবাসী। এবং তাবি' তাবেঈদের মধ্যে ১৮ জন, যাদের মধ্যে উপরোক্ত শহরগুলিসহ মক্কা, হিমছ, খোরাসানের অধিবাসীও রয়েছেন। হাদীছটি প্রায় ১২ জন সংকলক তাঁদের গ্রন্থে অন্তত ৬৫ বার উল্লেখ করেছেন। আহমাদ ইবনু হাম্বল হাদীছটি তাঁর মুসনাদে শুধু আবূ হুরায়রা (রা.) হ'তে বিভিন্ন সূত্রে ১৫ বার উল্লেখ করেছেন।[৪৯২]

এই উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হাদীছ কীভাবে বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং কোন হারে প্রতিটি প্রজন্মে হাদীছ বর্ণনাকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পরবর্তী প্রজন্মগুলোতেও ঠিক এভাবে জ্যামিতিক হারে রাবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং হাদীছের অসংখ্য তুরুক বা সনদসূত্র সৃষ্টি হয়। সুতরাং ৩য় শতকের হাদীছের সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে বিন্দুমাত্র বিস্ময়ের কারণ নেই। কেননা এই বৃদ্ধি মূল হাদীছের সংখ্যাবৃদ্ধি নয়, বরং সনদের সংখ্যাবৃদ্ধিকে নির্দেশ করে। এতে আরও প্রমাণিত হয় যে, শাখতের অনুমানকৃত হাদীছ জালকরণ প্রকল্প কতটা অসম্ভব বিষয়। কেননা আফগানিস্তান থেকে মিসর, খোরাসান থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত শত-সহস্র হাদীছ বর্ণনাকারী যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার সেই যুগে সকলেই হাদীছ জাল করার জন্য এত বড় মহাপ্রকল্পে সর্বসম্মতিক্রমে সংযুক্ত হয়েছিলেন, তা ভাবনারও অতীত।

---

number of traditions credited to the exhaustive collections of the third century. Once it is realised that the isnad did, indeed, initiate a chain reaction that resulted in an explosive increase in the number of traditions, the huge numbers that are credited to Ibn Hanbal, Muslim and Bukhari seem not so fantastic after all.' See : Ibid, p. 72.

৪৯১. *ছহীহুল বুখারী*, হা/১৬২, *ছহীহ মুসলিম*, হা/২৭৮।

৪৯২. Mustafa al-Azami, *On Schacht's Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, p. 157.

সংশয়-৪ : হাদীছের ইসনাদ হ'ল বানোয়াট বস্তু, যা ব্যক্তি মতামতকে অহীর মর্যাদা প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

জোসেফ শাখত বলেন, ইসনাদ হ'ল নিজের মতকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ করার জন্য তা ঊর্ধ্বতন কোন কর্তৃপক্ষের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যম, যা বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠী পরবর্তীকালে রচনা করেছিল। এজন্য রাসূল (ছা.) ও তাঁর ছাহাবীদের প্রতি নিসবতকৃত বা আরোপিত সনদসমূহ তথা হিজরী ১ম শতাব্দী থেকে ২য় শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে সকল রাবীদের নাম সনদে যুক্ত হয়েছে তা সবই ব্যতিক্রমহীনভাবে জাল ও বানোয়াট সংযোজন। তাঁর ভাষায়, "..that portions of Isnāds that extended into the first half of the second century and into the first century are without exception arbitrary and artificially fabricated"। এই তত্ত্ব প্রমাণ করার জন্য তিনি ২টি পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছেন। (১) *Backgrowth of Isnads* বা পশ্চাদ-অভিক্ষেপ তত্ত্ব : এর অর্থ হ'ল হাদীছের সনদকে বর্ধিত করে রাসূল (ছা.) পর্যন্ত সংযুক্ত করা, যার অর্থ প্রাথমিক সংকলনে যে হাদীছ মাওকূফ বা ছাহাবীদের বর্ণনা হিসাবে উল্লেখিত হয়েছিল, পরবর্তী সংকলনে তা মারফূ' বা সরাসরি রাসূল (ছা.)-এর হাদীছ হিসাবে বর্ণিত হওয়া।[৪৯৩] (২) *Common Link Theory* বা সংযোগসূত্র তত্ত্ব। অর্থাৎ সনদের যে অংশে নির্দিষ্ট একজন বর্ণনাকারীকে কেন্দ্র (مدار الإسناد) করে অন্যান্য সনদ থেকে দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারী এসে একত্রিত হয়েছে, সেই বর্ণনাকারীকে 'হাদীছ জালকারী' হিসাবে চিহ্নিত করা। তিনি সনদকে দুই ভাগে ভাগ করে 'সংযোগসূত্র'-এর পূর্বাংশকে তিনি Fictitious higher part (বানোয়াট উর্ধ্বাংশ, যে অংশে ১ম শতাব্দীর রাবী বা বর্ণনাকারীদের নাম রয়েছে) এবং পরবর্তী অংশকে Real lower part (সঠিক নিম্নাংশ, যে অংশে ২য় ও ৩য় শতাব্দীর রাবীদের নাম রয়েছে) আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'মাদারুস সানাদ' বা সনদের সংযোগস্থলের এই রাবী বা বর্ণনাকারীগণই হাদীছ জাল করা এবং তা রাসূল (ছা.)-এর প্রতি সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রকৃত ভূমিকা রেখেছেন।[৪৯৪] তিনি ইসনাদ পদ্ধতি আদ্যোপান্ত

---

৪৯৩. Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, p. 165-166.

৪৯৪. Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, p. 175.

জাল ও বানোয়াট মনে করেন। তাঁর ধারণা হ'ল, একটি হাদীছের যত অতিরিক্ত ইসনাদ (মুতাবা'আত ও শাওয়াহিদ) রয়েছে, তা সৃষ্টি হয়েছে ইমাম শাফেঈ (২০৪হি.)-এর যুগে। এর মাধ্যমে মু'তাযিলাদের আরোপিত খবর ওয়াহিদ হাদীছের বিরুদ্ধে আপত্তিসমূহ দূর করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এছাড়া 'যিয়াদাতুছ ছিকাহ' বা রাবীদের কর্তৃক হাদীছের মতনে বৃদ্ধি করা, পারিবারিক ইসনাদসমূহ প্রভৃতি ইসনাদ জাল হওয়ার প্রকাশ্য দলীল। মুছত্বফা আল-আ'যামী (২০১৭হি.) তাঁর উপস্থাপিত এসকল প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করেছেন তাঁর *On Schacht's Origins Of Muhammadan Jurisprudence* গ্রন্থে।

পর্যালোচনা :

শাখতের এই চরমপন্থী অনুসিদ্ধান্ত তাঁর পূর্ববর্তী অনুসিদ্ধান্তের সাথে সম্পৃক্ত। যেহেতু তিনি বিশ্বাস করেন যে, ১ম হিজরী শতাব্দীতে রাসূল (ছা.)-এর কোন হাদীছের অস্তিত্ব ছিল না, অতএব ইসনাদের অস্তিত্ব থাকারও কোন প্রশ্ন আসে না।[৪৯৫] এজন্য ১ম শতাব্দীতে ইসনাদের সপক্ষে প্রাপ্ত যে কোন প্রমাণ তাকে অপরিহার্যভাবে অস্বীকার করতে হয়েছে। ইবনু সীরীন (১১০হি.)-এর মন্তব্য لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم 'প্রথম যুগে মানুষ ইসনাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত না। অতঃপর যখন 'ফিতনা' শুরু হয়, তখন মানুষ বলতে লাগল, তোমাদের বর্ণনাকারীদের নাম বল।'[৪৯৬] এই বর্ণনাটি শাখতের মতে জাল। কেননা তিনি মনে করেন 'ফিৎনা'র অর্থ হ'ল উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনু ইয়াযীদ (১২৬হি.)-এর হত্যাকাণ্ড। আর ইবনু সীরীনের মৃত্যু ১১০ হিজরীতে। অতএব এই বর্ণনাটি মিথ্যাভাবে ইবনু সীরীনের নামে প্রযুক্ত করা হয়েছে;[৪৯৭] অথচ এটি ইতিহাসস্বীকৃত বিষয় যে মুসলমানদের প্রথম ফিতনা বলতে আলী (রা.) এবং মু'আবিয়া (রা.)-এর মধ্যকার ছিফ্ফীনের যুদ্ধকে বুঝানো হয়ে থাকে। যেহেতু ইবনু সীরীনের মৃত্যু ১১০ হিজরীতে, সেহেতু তিনি ৩৭ হিজরীতে সংঘটিত হওয়া ফিতনাকে উদ্দেশ্য করাই স্বাভাবিক। ইতিহাস বিশ্লেষণে এটিই

---

৪৯৫. Mustafa al-Azami, *On Schacht's Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, p. 167.

৪৯৬. *ছহীহ মুসলিম*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫; খত্বীব আল-বাগদাদী, *আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ*, পৃ. ১২২।

৪৯৭. Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, p. 36-37.

অধিকতর বোধগম্য। কেননা এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই মুসলমানরা সুন্নী ও শী'আসহ বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয় এবং বিশেষত শীআ'রা ব্যাপকভাবে হাদীছ জাল করে। এজন্য মুহাদ্দিছগণ এই সময়কেই ইসনাদের উৎপত্তিকাল নির্ধারণ করেছেন। অথচ শাখত তাঁর তত্ত্বকে ঠিক রাখতে সুদূর ১২৬ হিজরীতে সংঘটিত খলীফা ওয়ালীদ ইবনু ইয়াযীদ হত্যাকাণ্ডের মত একটি ঘটনাকে নিয়ে এসেছেন, যা মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ফিতনা ছিল না যে তাকে কেন্দ্র করে হাদীছ জাল করার মত বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হ'তে পারে। যে কোন নিরপেক্ষ গবেষক তা স্বীকার করবেন। অতঃপর ইবনু সীরীনের মৃত্যু সালের সাথে তা সমন্বয় করতে না পেরে নির্বিচারে হাদীছটি জাল বলে অভিহিত করলেন। এভাবেই শাখত ও তাঁর সমচিন্তকরা বার বার সত্যের মুখোমুখি হ'তে অস্বীকার করেছেন কিংবা এড়িয়ে গেছেন। নিম্নের উদাহরণগুলি থেকে তা আরও স্পষ্ট হবে।

ক. শাখত তাঁর পশ্চাদ-অভিক্ষেপ তত্ত্বটি প্রমাণের জন্য বেশ কিছু প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে, একটি হাদীছ ইমাম মালিক (১৭৯ হি.) উল্লেখ করেছেন কোন ছাহাবীর বর্ণনা বা মাওকূফ হিসাবে, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মে ইমাম শাফেঈ (২০৪ হি.) সেই হাদীছ ত্রুটিপূর্ণ মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, দুই প্রজন্ম পর ইমাম বুখারী (২৫৬ হি.) সেই একই হাদীছ বর্ণনা করেছেন পূর্ণাঙ্গ সূত্রে মারফূ' হিসাবে।[৪৯৮] তাঁর এই পর্যবেক্ষণ নিশ্চিতভাবে সত্য, যা মুহাদ্দিছগণের নিকট সুপরিচিত একটি প্রাচীন সমস্যা। তাঁরা এর সমাধানের জন্য ইলমুল ইলাল শাস্ত্রের আবিষ্কার করেছেন এবং এসকল ইসনাদের মধ্যে কোনটি বর্জনযোগ্য এবং কোনটি অধিকতর সঠিক ও প্রাধান্যযোগ্য তা নির্ণয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং এটি কোন নতুন বিষয় নয় এবং অসমাধানযোগ্য বিষয়ও নয়। কিন্তু এর ভিত্তিতে কি শাখতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে, রাসূল (ছা.) পর্যন্ত মারফূ সূত্রে বর্ণিত সকল হাদীছের সনদই এমন ত্রুটিপূর্ণ? কিংবা অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত কোন হাদীছই নেই?

পশ্চাদ-অভিক্ষেপ তত্ত্বটি মুহাদ্দিছদের নিকট 'যিয়াদাহ' বা বর্ণনাকারীর বর্ধিতকরণ হিসাবে পরিচিত। এটি 'ইলালুল হাদীছ' শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ইমাম দারাকুৎনী (৩৮৫হি.) এ বিষয়ে সংকলিত তাঁর সুপ্রসিদ্ধ العلل الواردة في الأحاديث النبوية গ্রন্থে ৪১২৭টি হাদীছ উল্লেখ

৪৯৮. Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, p. 165-166.

করেছেন, যেগুলোর মধ্যে হাদীছের সনদ ও মতনের আভ্যন্তরীণ নানা প্রায়োগিক (Technical) ত্রুটি-বিচ্যুতি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল ত্রুটিপূর্ণ হাদীছের একটি বড় অংশ হ'ল কোন হাদীছের সনদসমূহে 'মারফূ'/মাওকূফ, মাওছূল/মুনক্বাতিঈ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ একজন রাবী হয়ত কোন হাদীছকে ছাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। অপর রাবী তা সরাসরি রাসূল (ছা.) হ'তেই বর্ণনা করেছেন। আবার অন্য একজন রাবী তা 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই সমস্যাগুলো কখনও কোন রাবীর ব্যক্তিগত ত্রুটির কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে কোন বর্ণনাটি প্রণিধানযোগ্য। ক্ষেত্রবিশেষে হাদীছটির উভয়সূত্রই সঠিক হ'তে পারে। কেননা কোন হাদীছ একই সাথে মারফু' হতে পারে, আবার মাওকুফও হ'তে পারে। এটা এ জন্য যে, হয়ত দু'টি হাদীছ ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে বর্ণিত হয়েছে। অথবা বর্ণনাকারী ছাহাবী হয়ত একবার তাঁর শ্রুত হাদীছটি রাসূল (ছা.) হ'তে সরাসরি বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে কোন ফৎওয়া দেওয়ার সময় হাদীছটি নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বিষয়টি কেবলই প্রায়োগিক (Technical) বিষয়, যার সাথে হাদীছ জাল হওয়া বা না হওয়ার সম্পর্ক নেই। হাদীছ শাস্ত্র সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার দরুণ শাখত বিষয়টিকে অভিনব মনে করেছেন এবং তার তত্ত্বের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ দলীল মনে করেছেন। আদতে তা কোন অস্বাভাবিক কিছু নয়। বলা বাহুল্য, এই 'পশ্চাদ-অভিক্ষেপ' সম্পর্কে গবেষণা প্রত্যেক যুগের মুহাদ্দিছগণই করেছেন। বর্তমান যুগেও মুহাদ্দিছগণ রাবীদের এমন বর্ণনাগুলো সম্পর্কে গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন।[৪৯৯]

সমকালীন অন্যান্য প্রাচ্যবিদরাই শাখতের এই তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন জোনাথান ব্রাউন (জন্ম : ১৯৭৭খ্রি.) বলেন, মুহাদ্দিছগণ 'পশ্চাদ-অভিক্ষেপ'কে বর্ণনাকারীর زيادة বা সংযোজন হিসাবে দেখতেন। এটি তিন প্রকার। (১) সনদে সংযোজন, (২) মতনে সংযোজন এবং (৩) নিয়মতান্ত্রিক মতন সংযোজন (অর্থাৎ মতনের গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য মওকুফ হাদীছকে মারফূ' হাদীছে রূপান্তরকরণ)। এই ৩য় প্রকার বৃদ্ধিকরণ বা

---

৪৯৯. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য লেখকের মাস্টার্স থিসিস (অপ্রকাশিত)- مرويات الإمامين عمرو بن دينار ومنصور بن المعتمر المعلة بالاختلاف عليهما في كتاب العلل للإمام الدارقطني (ইসলামাবাদ : ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ, ২০১৭) দ্রষ্টব্য।

সংযোজনটিই আমাদের আলোচ্য বিষয়। শাখত এবং পশ্চিমা গবেষকদের মতে 'নিয়মতান্ত্রিক মতন সংযোজন' মারফূ' হাদীছের জাল হওয়া প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। অন্যদিকে মুহাদ্দিছদের নিকট বর্ণনাকারীর সততা এবং সহযোগী বর্ণনার (মুতাবা'আত ও শাওয়াহেদ) উপস্থিতি পাওয়া গেলে একটি হাদীছের মাওকুফ এবং মারফূ' উভয় সূত্রই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কেননা একজন ছাহাবী কোন ব্যাপারে হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে যেমন সরাসরি মুহাম্মাদ (ছা.)-এর বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেন, তেমনিভাবে নিজের ভাষাতেও হুকুমটি বর্ণনা করতে পারেন। সুতরাং দু'টির মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই।[৫০০] তিনি বিভিন্ন যুগে মুহাদ্দিছদের রচিত 'ইলাল' সংক্রান্ত গ্রন্থসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, শাখতীয় আপত্তিসমূহের ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ বহু পূর্ব থেকেই সতর্ক ছিলেন এবং যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।[৫০১]

ইউরী রুবিন (জন্ম : ১৯৪৪খ্রি.) পাণ্ডুলিপি বিশ্লেষণ (Systemetic textual analysis) পদ্ধতির সাহায্যে তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, শাখতের ইসনাদের 'পশ্চাদ-অভিক্ষেপ' তত্ত্বটি সারবত্তাহীন। তিনি বলেন, শাখতের প্রদত্ত উদাহরণগুলো কেবল এতটুকুই প্রকাশ করে যে একটি হাদীছের সম্পূর্ণ ইসনাদের (মুত্তাছিল) পাশাপাশি অসম্পূর্ণ ইসনাদও (মুনকাতি') থাকতে পারে। কিন্তু এমন কোন প্রমাণ নেই যে, অসম্পূর্ণ ইসনাদ (মুনকাতি') থেকে সম্পূর্ণ ইসনাদের (মুত্তাছিল) জন্ম হয়েছে।[৫০২] তবে পশ্চাদ-অভিক্ষেপ' কখনই ঘটেনি এমন নয়। মুহাদ্দিছগণ এমন কিছু অসৎ বর্ণনাকারীকে চিহ্নিত করেছেন যারা 'মুরসাল' হাদীছকে 'মারফু' হাদীছে পরিণত করেছেন। কিন্তু এটা কখনই স্বাভাবিক পদ্ধতি ছিল না যেমনটি শাখতের ধারণা। বরং তা ছিল ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত যাকে মুহাদ্দিছগণ সনদের কোন অসৎ বর্ণনাকারীর কর্ম হিসাবে অভিহিত করেছেন।[৫০৩] পরিশেষে তিনি বলেন, '.. the lack of evidence of backward growth of Isnads deprives Schacht of one of its basic dating tolls.' 'পশ্চাদ-অভিক্ষেপের সপক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণাদির ঘাটতি শাখতকে হাদীছের কাল-নির্ধারণী অন্যতম এই মৌলিক অস্ত্রটি থেকে বঞ্চিত করেছে।'[৫০৪]

---

৫০০. Jonathan Brown, *Critical Rigour Vs Juridicial Pragmatism*, p. 14.
৫০১. Ibid, p. 15-37.
৫০২. Uri Rubin, *The Eye of the Beholder*, p. 235-236.
৫০৩. Ibid, p.238.
৫০৪. Ibid, p. 260.

হেরাল্ড মোজকি (জন্ম : ১৯৪৮খ্রি.) বলেন, শাখত যে সকল উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন তা প্রমাণ করে যে, তিনি ধারণাই করতে পারেন নি যে, ২য় শতাব্দীর প্রথমভাবে কিংবা তারও পূর্বে কোন হাদীছ দুই বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করতে পারে। কেননা শাখত মনে করেন যে, একটি হাদীছের অধিকাংশ ইসনাদ অতিরিক্ত কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা স্বয়ং বর্ণনাকারীগণ কর্তৃক প্রণীত অথবা আগাগোড়াই জাল। তাঁর এই মতামতসমূহ স্বল্প কিছু উপাত্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত অবাধ সারলীকরণ। সবচেয়ে বড় কথা এগুলি তাঁর দাবী মাত্র, কোন প্রমাণিত বিষয় নয়।'[৫০৫]

জোনাথন ব্রাউন (১৯৭৭খ্রি.) বলেন, 'হাজারো হাদীছের মধ্যে শাখত মাত্র ৪৭টি উদাহরণের ওপর ভিত্তি করে ইসনাদের পশ্চাদ-অভিক্ষেপের ব্যাপারে তাঁর উপসংহার টেনেছেন, যা তার ধারণায় সমগ্র হাদীছ ভাণ্ডারের ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতাকে বিনষ্ট করেছে।'[৫০৬]

সুতরাং শাখতের নিকট 'পশ্চাদ-অভিক্ষেপ' তত্ত্ব ইসনাদের জাল হওয়ার প্রমাণে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হ'লেও বাস্তবে এই তত্ত্ব হাদীছ শাস্ত্র সম্পর্কে কেবল তাঁর নিরেট অজ্ঞতারই প্রমাণ বহন করে। তাঁর এই অতি দুর্বল অনুসিদ্ধান্ত গবেষণার প্রাথমিক শর্তই পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যে সমস্যার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা মুহাদ্দিছগণ হাজার বছর পূর্বেই চিহ্নিত করেছেন এবং তার সমাধানও বের করেছেন। সুতরাং এই মীমাংসিত বিষয়ে তাঁর গবেষণা যে কোন মুহাদ্দিছ বিদ্বানের নিকট স্রেফ অবান্তর প্রতীয়মান হবে।

খ. শাখত তাঁর 'সংযোগসূত্র' তত্ত্বের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কোন হাদীছের ইসনাদসমূহের যে অংশে কয়েকজন রাবী একজন নির্দিষ্ট রাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, সেই নির্দিষ্ট রাবী হলেন হাদীছটি জালকারী। যেমন একটি সনদ- আমর ইবনু দীনার (১২৬হি.) থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবনু ইয়াযীদ আল-খাওযী (১৫১হি.)/সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ(১৯৮হি.)/আবূর রবী' আস-সাম্মান (মৃত্যুসাল অজ্ঞাত)<আমর ইবনু দীনার (১২৬হি.)<আবূ সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (৯৪/১০৪হি.)<আবূ হুরায়রা (রা.)<রাসূল (ছা.)। এই সনদে আমর ইবনু দীনার থেকে তিন জন বর্ণনাকারী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সুতরাং শাখতের মতে এই আমর ইবনু দীনার হ'লেন এই হাদীছের সংযোগস্থলের রাবী, যিনি

৫০৫. Herald Motzki, *Dating Muslim Traditions*, p. 221.
৫০৬. Jonathan Brown, *Critical Rigor vs. Juridical Pragmatism*, p. 8.

কিনা সনদের পূর্বাংশে আবূ সালামাহ<আবূ হুরায়রা<রাসূল (ছা.) অংশটি জুড়ে দিয়ে হাদীছটি রচনা করেছেন এবং তার থেকে পরবর্তী তিন জন বর্ণনাকারী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। শাখতের মতে, আমর ইবনু দীনারই হলেন এই হাদীছটির জন্মদাতা এবং তার রচনাকালই হ'ল হাদীছটির প্রকৃত জন্মকাল। তাঁর ভাষায়, The existence of common transmitters enables us to assign a firm date to many traditions and to the doctrines represented by them 'এই সংযোগস্থলের বর্ণনাকারীগণ আমাদেরকে অনেক হাদীছ বা মতবাদের সঠিক উৎপত্তিকাল নির্ণয় করতে সাহায্য করে।'[৫০৭] আর যে সকল হাদীছে 'সংযোগসূত্র' নেই সে সকল হাদীছ সরাসরি প্রাথমিক হাদীছ সংকলক আব্দুর রায্যাক ইবনু হাম্মাম (২১১হি.), আহমাদ ইবনু হাম্বল (২৪১হি.) প্রমুখ কর্তৃক জালকৃত। তাঁর উত্তরসূরী জুইনবল এবং মাইকেল কুক এই তত্ত্বকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন।

এর জবাবে আমরা তিনটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত, মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণ 'সংযোগসূত্র' বা مدار الإســـناد সম্পর্কে সবিশেষ অবগত ছিলেন এবং তারা এ সংক্রান্ত ত্রুটি নিরসনে সূক্ষ্ম নীতিমালা অবলম্বন করেছেন।[৫০৮] যেমন আয-যাহাবী (৭৮৪হি.) বলেন,

فانظر اول شئ إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وســـلم الكبـــار والصغار، ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، فيقال له: هذا الحـــديث لا يتابع عليه، وكذلك التابعون، كل واحد عنده ما ليس عند الآخر مـــن العلم، وما اتعرض لهذا، فإن هذا مقرر على ما ينبغي في علم الحـــديث، وإن تفرد الثقة المتقن يعد صحيحا غريبا، وإن تفرد الصدوق ومن دونـــه يعد منكراً، وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظا أو إسنادا يصيره متروك الحديث

৫০৭. Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, p. 175. মজার ব্যাপার হ'ল, শাখত তাঁর গ্রন্থে উদাহরণ হিসাবে এমন কোন হাদীছের সনদ উল্লেখ করেননি যেখানে সংযোগসূত্র হ'লেন ছাহাবী বা তাবেঈ। কেননা এতে হাদীছের জন্মকাল প্রথম শতাব্দীতে স্বীকার করার ঝুঁকি নিতে হয়, যা তাঁর তত্ত্বের খেলাফ।- গবেষক।

৫০৮. মুছত্বফা আল-আ'যামী, *দিরাসাতুন ফিল হাদীছ আন-নববী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১৯-৪২১।

‘(ইসনাদ সমালোচনায়) প্রথমে লক্ষ্য কর রাসূল (ছা.)-এর জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ (সকল) ছাহাবীদের প্রতি। তাদের মধ্যে এমন একজন নেই যিনি এককভাবে কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নি। তখন বলা হবে যে, হাদীছটির কোন মুতাবা‘আত (সহযোগী বর্ণনা) নেই। অনুরূপই বিষয় তাবেঈদের ক্ষেত্রেও। তাদের প্রত্যেকের নিকটই এমন হাদীছ ছিল, যা অন্যদের কাছে ছিল না। আমি এ বিষয়ে এখানে আলোচনা করতে চাই না, কেননা এটি হাদীছ শাস্ত্রের একটি স্বীকৃত বিষয়। আর যদি (পরবর্তী যুগে) কোন একক বর্ণনাকারী ছিকাহ (শক্তিশালী) এবং নির্ভরযোগ্য হন, তবে তাঁর বর্ণনা ছহীহ গারীব (অর্থাৎ বিশুদ্ধ তবে অপ্রসিদ্ধ বর্ণনা) হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি এই একক বর্ণনাকারী ছাদূক (সাধারণ সত্যবাদী) বা এরও নিম্ন পর্যায়ের হন, তবে তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর কোন বর্ণনাকারী যখন অধিক হারে এমন হাদীছ বর্ণনা করবেন, যার শব্দে ও সনদে কোন সামঞ্জস্যতা পাওয়া যায় না, তবে তিনি একজন পরিত্যক্ত বর্ণনাকারীতে পরিণত হবেন।’[৫০৯]

অর্থাৎ মুহাদ্দিছগণ সংযোগসূত্রের একক রাবীর প্রতি অতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। এসকল রাবী শক্তিশালী বর্ণনাকারী না হ’লে তাঁর তার বর্ণনা গ্রহণ করতেন না। এমনকি রাবী শক্তিশালী হ’লেও তার বর্ণনা এক্ষেত্রে ‘গারীব’ বা অপ্রসিদ্ধ ঘোষণা করে তাতে ভুল থাকার সম্ভবনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর যে সব বর্ণনার মধ্যে প্রকৃতই ভুল থাকার প্রমাণ পাওয়া যাবে তার কথা তো বলাই বাহুল্য। হাকিম আন-নায়সাপূরী (৪০৫হি.)ও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[৫১০] তাঁছাড়া ইলালুল হাদীছের অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তুই হ’ল ‘সংযোগসূত্র’-এর বর্ণনাকারীর ভুল-ত্রুটি। ইমাম তিরমিযী, ইমাম দারাকুৎনী এ বিষয়ে পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও হাদীছ বর্ণনার সময়ই ইসনাদের কোন রাবীর تفـــرد (একক বর্ণনা) সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। সুতরাং ‘সংযোগসূত্র’-এর বর্ণনাকারী সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ পুরোপুরিভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং এ বিষয়ে তাদের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে।

সুতরাং হাজার বছর পর শাখতের কৃত এই দাবীর মাঝে কোন অভিনবত্ব নেই। শাখতের কট্টর সমর্থক মাইকেল কুক শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, শাখতের এই তত্ত্ব (সংযোগসূত্র তত্ত্ব) হাদীছ সমালোচনার নতুন

---

৫০৯. আয-যাহাবী, *মীযানুল ই‘তিদাল*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪০-১৪১।
৫১০. হাকিম আন-নায়সাপুরী, *মা‘রিফাতু উলূমিল হাদীছ*, পৃ. ৯৬-১০২।

কোন পদ্ধতির জন্ম দেয় না। মূলত এটি তথ্যের বিনাশ সাধন করে, কোন তথ্য সরবরাহ করে না।[৫১১]

দ্বিতীয়ত, শাখতের নির্বিচার দাবী 'সংযোগসূত্র'-এর বর্ণনাকারী মাত্রই হাদীছটি জাল করেছেন। কিন্তু এর দলীল কোথায়? মুহাদ্দিছগণ বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা, অন্য বর্ণনাকারীদের সাথে তাঁর বর্ণনার তুলনা এবং পারিপার্শ্বিকতা বিশ্লেষণের পর নিশ্চিত হন যে, বর্ণনাকারী সত্যিই হাদীছটি পূর্ববর্তী বর্ণনাকারীর নিকট থেকে শুনেছেন কি না। সুতরাং তাঁরা এই বর্ণনাকারীর বিষয়ে তথ্য ও প্রমাণ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু শাখত ও তার সমর্থকদের নিকট এমন কী দলীল রয়েছে, যে ঢালাওভাবে সকল বর্ণনাকারীকে মিথ্যা বর্ণনাকারী হিসাবে সাব্যস্ত করা যাবে? এর পিছনে কল্পনাবিলাস ব্যতীত বাস্তব কোন দলীল রয়েছে? এই কাল্পনিক সন্দেহবাদী ধারণার অসারতা প্রকাশ করতে গিয়ে মুছত্বফা আল-আ'যামী (২০১৭খ্রি.) যথার্থই বলেছেন যে, শাখতের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, বর্তমান যুগে কোন সাংবাদিক যখন বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য জমা করে তাঁর অনুসন্ধানসমূহ পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তখন আবশ্যিকভাবে ধরে নিতে হবে যে, সে এ সকল তথ্য জাল করেছে। কেননা পত্রিকাটির হাজারো পাঠককে কেবল তাকেই সংবাদটির একমাত্র সোর্স বা সূত্র হিসাবে গ্রহণ করতে হয়।[৫১২]

সুতরাং শাখতের এই তত্ত্ব একেবারেই ভিত্তিহীন এবং অজ্ঞতাপ্রসূত।

তৃতীয়ত, শাখতের ইসনাদ জাল হওয়া এবং সংযোগসূত্র তত্ত্ব যে স্রেফ কল্পনানির্ভর- এ প্রসঙ্গে আমরা এখানে হেরাল্ড মোজকি (জন্ম : ১৯৪৮খ্রি.)-এর পর্যবেক্ষণটি তুলে ধরতে চাই। তিনি বলেন, 'কিছু সম্ভবনার কথা তুলে ধরা ছাড়া সত্যি সত্যিই ইসনাদ জাল করা হয়েছে এমন উদাহরণ শাখত ও কুক খুব সামান্যই দিতে পেরেছেন। শুধু সম্ভাবনার ভিত্তিতে এবং ইসনাদ জাল করার বিরল কিছু উদাহরণের কারণে পুরো ইসনাদ ব্যবস্থাকে পরিত্যাগ করার কোন যুক্তি নেই। মধ্যযুগে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ কোন সরকারী দলীলপত্রকে ঐতিহাসিক সূত্র হিসাবে পরিত্যাগ করেননি এমন যুক্তিতে যে, তাতে কখনও এমন জাল করার ঘটনা ঘটে থাকে, যা চিহ্নিত করা কঠিন।'[৫১৩]

---

৫১১. Michel cook, *Early Muslim Dogma : A source-Critical Study,* p. 116.

৫১২. Mustafa al-Azami, *On Schacht's Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, p. 200.

৫১৩. Herald Motzki, *'Dating Muslim Traditions'*, p. 235.

তিনি বলেন, 'সংযোগসূত্র'-এর রাবীগণকে সাধারণভাবে সর্বপ্রথম বৃহত্তর আকারে হাদীছ সংগ্রাহক ও পেশাদার নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষক এবং নির্দিষ্টভাবে হিজরী প্রথম শতাব্দীর মুহাদ্দিছ হিসাবে দেখা উচিত, যাদের মাধ্যমে হাদীছের জ্ঞান চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাঁদের মাধ্যমেই মূলত সনদের প্রসার ঘটেছিল। পূর্বসূরীদের কাছ থেকে তারা হয়ত সনদসহ বা সনদবিহীন হাদীছ সংগ্রহ করেছিলেন। অতঃপর প্রাপ্ত সনদের মধ্যে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য সনদটি তারা উল্লেখ করেছেন। এ কারণে 'সংযোগসূত্র'-এর উর্ধ্বতন রাবী সাধারণত একজন হয়ে থাকেন এবং একই কারণে অধিকাংশ প্রাথমিক 'সংযোগসূত্র' ছাহাবীদের উপর না হয়ে তাবেঈদের উপর সৃষ্টি হয়েছে।[৫১৪]

তিনি আরও বলেন, ইসনাদ পদ্ধতির উদ্দেশ্য ছিল বর্ণনা পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা। এর নৈতিক ভিত্তি ছিল যে, যার নিকট থেকে তথ্য পেয়েছি তার নাম আমাকে উল্লেখ করতে হবে। জেনেশুনে এর ব্যতিক্রম করলে বর্ণনাটি মিথ্যা ও অসততা হিসাবে গণ্য হবে। নিশ্চিতভাবেই এই প্রক্রিয়াটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট পরিচিত ছিল এবং তৎকালীন জ্ঞানী সমাজ সামগ্রিকভাবে এই প্রক্রিয়ার ব্যত্যয় ঘটছে কি না তার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। এতে এটি প্রমাণিত হয় না যে, ইসনাদ জাল হওয়ার ঘটনা ঘটে নি, কিন্তু জ্ঞানী সমাজের উপস্থিতিতে এত বৃহদাকারে জাল করার ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তা ভাবা অসম্ভব। যদি এই বিজ্ঞতাপূর্ণ ইসনাদ প্রক্রিয়া কেবলমাত্র বা প্রধানত নির্ভরশীলতা সৃষ্টির ছলনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে হাদীছকে আইনসিদ্ধ করার জন্য ইসনাদ প্রক্রিয়া অর্থহীন বিষয়ে পরিণত হয়। ইমাম শাফেঈ কর্তৃক নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হাদীছের ওপর জোর প্রদান করার বিষয়টিও অযৌক্তিক এবং প্রতারণাপূর্ণ হয়ে পড়ে, যদি তিনি জেনে থাকেন যে তার সময়কালে প্রচলিত অধিকাংশ হাদীছের সনদ জাল।[৫১৫]

তিনি যথার্থই প্রশ্ন রাখেন, Was the whole system of Muslim Hadit criticism only a manoeuvre of deception? Who had to be deceived? Other Muslim scholars? They must have been

---

৫১৪. Herald Motzki, *Whither Hadith Studies*, p. 50-54; Idem, *Dating Muslim Traditions*, p. 227-228; Idem, *Al-Radd Ala l-Radd : Concerning the Method of Ḥadīth Analysis*, published in *Analysing Muslim Tradition*, p. 210-211.

৫১৫. Herald Motzki, *Dating Muslim Traditions*, p. 235.

aware of the pointlessness and vanity of all the efforts to maintain high standards of transmission, if forgery of isnads was part and parcel of the daily scholarly practice. 'মুসলমানদের সমগ্র হাদীছ সমালোচনা পদ্ধতি কি তবে কেবলমাত্র প্রতারণার কৌশলই ছিল? এতে কারা প্রতারিত হয়েছিল? অন্য মুসলিম বিদ্বানরা? যদি ইসনাদ জাল করাই তাদের বিদ্যাচর্চার প্রাত্যহিক অংশ হ'ত, তবে তাঁরা নিশ্চয়ই হাদীছ বর্ণনার উচ্চ মানদণ্ড ধরে রাখার জন্য তাঁদের যাবতীয় প্রচেষ্টার অর্থহীনতা ও অসারতা সম্পর্কে সচেতন হ'তেন! (অর্থাৎ এটি স্রেফ প্রতারণা হ'লে হাদীছের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের জন্য তাদের এত পরিশ্রমের কোন অর্থই হয় না)।'[৫১৬]

গ. শাখত হাদীছের মুতাবা'আত ও শাওয়াহিদ বা সমান্তরাল সূত্রগুলিকে বানোয়াট হাদীছের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য একটি ব্যর্থ প্রয়াস মনে করেন এবং এগুলি আগাগোড়া জাল হিসাবে অনুমান করেন। যে বিষয়টি মুহাদ্দিছদের নিকট ইসনাদ ব্যবস্থার অন্যতম শক্তিশালী দিক বিবেচিত হয়, সেটিকে উল্টো জাল প্রমাণ করার জন্য শাখত, জুইনবল ও কুকের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা বিস্ময়কর। এর প্রতিউত্তর না দিয়ে কেবল এর ফলাফল কী হ'তে পারে তা নিউইয়র্কের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ডেভিড পাওয়ার্সের একটি পর্যবেক্ষণ থেকে উল্লেখ করা হ'ল। তিনি সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) হ'তে বর্ণিত একটি হাদীছ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। হাদীছের ভাষ্য হ'ল, একবার সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূল (ছা.) তাঁকে দেখতে গেলেন। এমতবস্থায় তিনি রাসূল (ছা.)-কে বললেন, আমি (সম্পদ) অছিয়ত করতে চাই, আমার একটি মাত্র কন্যা সন্তান রয়েছে। তিনি অর্ধেক সম্পদ অছিয়ত করতে চাইলেন। রাসূল (ছা.) বললেন, অর্ধেক অনেক। তখন তিনি বলেন, তবে এক-তৃতীয়াংশ? রাসূল (ছা.) বললেন, ঠিক আছে এক-তৃতীয়াংশ করতে পার, তবে এক-তৃতীয়াংশও অনেক বেশী।[৫১৭] এই হাদীছটি জাল হিসাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন প্যাট্রিসিয়া ক্রোন এবং মাইকেল কুক। কিন্তু তাদের বিপরীতে ড. ডেভিড পাওয়ার্স তাঁর গবেষণায় হাদীছটির অন্যান্য সূত্রগুলো একত্রিত করে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ৩টি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন-

এক- এটি অস্বাভাবিক যে, আমরা আমাদের অনুসন্ধানে প্রাথমিকভাবে কেবলমাত্র নবী মুহাম্মাদের বিবরণ ছাড়া এমন কোন তাবেঈ পাইনি, যিনি সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ অছিয়ত সম্পর্কে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন।

---

৫১৬. Ibid, p. 235.
৫১৭. *ছহীহুল বুখারী*, ২৭৪৩-২৭৪৪, *ছহীহ মুসলিম*, হা/১৬২৮।

দুই- সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন ৫৫ হিজরীতে। সুতরাং এটা কৌতুহলের বিষয় যে, **১**ম হিজরী শতাব্দীর প্রান্তভাগে কোন তাবেঈ তাঁর ব্যক্তিগত মতটি রাসূল (ছা.)-এর নামে বানোয়াটভাবে প্রচলন ঘটানোর জন্য এমন একজন ব্যক্তিকে বেছে নিলেন যিনি **১**০ হিজরীতে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন!

তিন- সর্বোপরি এটা হয় অদ্ভুত কিংবা একটি চমকপ্রদ কাকতালীয় ঘটনা যে, ৬ জন তাবেঈ যারা উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শহরে অবস্থান করেন এবং ধারণা করা যায় প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে হাদীছটি জাল করার কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন, তারা অছিয়ত এক-তৃতীয়াংশে সীমাবদ্ধ করা এবং জাল সনদের মাধ্যমে তা রাসূল (ছা.)-এর বক্তব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলেই একই গল্প ফেঁদেছিলেন। আর সকলের জাল সনদ ঐ একজন ছাহাবীতে এসেই মিলিত হয়েছিল। যদি এই ঘটনাটি কোন জ্যেষ্ঠ তাবেঈ প্রথম আবিষ্কার করে থাকেন, তবে এটাই প্রত্যাশিত ছিল যে, কনিষ্ঠ তাবেঈগণ ভিন্ন কোন ছাহাবীকে বেছে নেবেন, যাতে তাদের মতবাদটি আরও জোরালো হয়।[৫১৮]

ডেভিড পাওয়ার্সের উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শাখতীয় তত্ত্বের বাস্তবতা কতটা অস্বাভাবিক এবং সারবত্তাহীন।

ঘ. 'পারিবারিক ইসনাদ' তথা সন্তান<বাবা<দাদা, ভাগিনা<খালা, দাস<মনীব প্রভৃতি ইসনাদকে শাখত সাধারণভাবে অপ্রামাণ্য বলে দাবী করেছেন। তিনি মনে করেন, এই পদ্ধতি ইসনাদকে নিরাপদ দেখানোর একটি প্রয়াসমাত্র।[৫১৯] মুহাদ্দিছরাও কিছু কিছু পারিবারিক সনদকে দুর্বল বলেছেন। যেমন মা'মার ইবনু মুহাম্মাদের বর্ণনা তাঁর পিতা থেকে, ঈসা ইবনু আব্দিল্লাহ তাঁর পিতা থেকে, কাছীর ইবনু আব্দিল্লাহ তাঁর পিতা থেকে, মূসা ইবনু মাতির তাঁর পিতা থেকে, ইয়াহইয়া ইবনু আব্দিল্লাহ তাঁর পিতা থেকে প্রভৃতি ইসনাদের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ আপত্তি করেছেন।[৫২০] কিন্তু এর ভিত্তিতে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ঢালাওভাবে সকল পারিবারিক ইসনাদকে অপ্রামাণ্য ঘোষণা করার কোন সুযোগ আছে কী? বরং পারিবারিক সনদের উপস্থিতি থাকাই তো অতি স্বাভাবিক। কেননা স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায় যে, কোন পরিবারের কর্তার কর্মকাণ্ডকে তাঁর সন্তানরা অনুসরণ করেন কিংবা তাঁর উত্তরাধিকার বহন

---

৫১৮. David S. Powers, *On Bequests in Early Islam*, p. 195.

৫১৯. Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, p. 170.

৫২০. Mustafa al-Azami, *On Schacht's Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, p. 197.

করেন। সুতরাং উত্তরাধিকার যদি জ্ঞানীয় সম্পদ হয়, তবে তাতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। নাবিয়া এ্যাবোট (১৯৮১খ্রি.) এই পারিবারিক ইসনাদকে প্রথম শতাব্দীতে হাদীছ সংরক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন আনাস ইবনু মালিক এবং আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রা.)-এর পারিবারিক ইসনাদ, যারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্ত র হাদীছ সংরক্ষণ করেছিলেন।[৫২১]

শাখতের পারিবারিক ইসনাদ অস্বীকারের ধরনকে নিন্দা করে মুছত্বফা আল-আ'যামী (২০১৭খ্রি.) বলেন, তাঁর এই তত্ত্ব খণ্ডনের জন্য বেশীদূর যেতে হবে না। যদি পিতা সম্পর্কে পুত্রের বর্ণনা বা তার বিপরীত, কিংবা স্বামী সম্পর্কে স্ত্রীর বর্ণনা বা তার বিপরীত, কিংবা একজন সহকর্মী থেকে অপর সহকর্মীর বর্ণনা যদি সর্বদা অগ্রহণযোগ্য হয়, তবে এতদ্ভিন্ন আর কোন উপায়ে কারো জীবনী লেখা সম্ভব? এতদসত্ত্বেও পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণ পারিবারিক ইসনাদকে পূর্ণভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সন্দেহজনক ইসনাদসমূহকে পরিত্যাগ করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে শাখত প্রদত্ত উদাহরণগুলো পর্যালোচনারও বিশেষ প্রয়োজন নেই।[৫২২]

ঙ. সর্বশেষে ইসনাদ পদ্ধতির ইতিহাস সম্পর্কে বলা যায়, এর শুরু হয়েছিল রাসূল (ছা.)-এর জীবদ্দশাতেই। ছাহাবীরা পরস্পরকে সূত্র হিসাবে উল্লেখ করে নিজেদের মধ্যে হাদীছ বর্ণনা করতেন। পূর্ব থেকে আরবদের মধ্যে এই চর্চা ছিল বলে এই প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই রাসূল (ছা.)-এর যুগে অব্যাহত ছিল। তবে ফিতনা তথা ছিফফীন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে শী'আরা জাল হাদীছ রচনা শুরু করলে ইসনাদ ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্ব পায়। অবশেষে হিজরী প্রথম শতকের শেষভাগে মুসলিম বিশ্বের শহরে শহরে শিক্ষাগার ছড়িয়ে পড়লে এবং জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তাবেঈদের মধ্যে রিহলা তথা বিভিন্ন শহরে ভ্রমণের সংস্কৃতি শুরু হ'লে ইসনাদ ব্যবস্থা আরও সুসংগঠিত ও নিয়মতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহণ করে। এটিই হ'ল ইসনাদ পদ্ধতি শুরুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। জার্মান প্রাচ্যবিদ Josef Horovitz (১৯৩১খ্রি.) তাঁর *Alter und Ursprung des Isnad* প্রবন্ধে বিষয়টি স্বীকারও করেছেন।[৫২৩] অতএব শাখতসহ তাঁর

৫২১. Nabia Abbott, *Studies In Arabic Literary Papyri*, Vol. II, p. 32-33.

৫২২. Mustafa al-Azami, *On Schacht's Origins Of Muhammadan Jurisprudence*, p. 197.

৫২৩. Ibid, p. 154-155, 167-167.

সমচিন্তকদের ধারণা মোতাবেক ইসনাদের জন্মকাল হিজরী ২য় শতাব্দীতে নয় বরং প্রথম শতাব্দীতেই।

আর ইসনাদ পদ্ধতির বাস্তবতা ও উপযোগিতা সম্পর্কে এতটুকুই বলা যায় যে, সহজভাবে বুঝতে গেলে ইসনাদ পদ্ধতি হ'ল বর্তমানে যেমন পিএইচ.ডি গবেষণা করা হয় কোন একজন শিক্ষকের অধীনে এবং দীর্ঘদিন ধরে সেই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কাজ করার পর একজন ছাত্র ডিগ্রি লাভ করেন, ঠিক তেমনই প্রক্রিয়া হ'ল ইসনাদ; যা একজন ছাত্র তাঁর শিক্ষকের নিকট যোগ্যতার পরীক্ষা দেয়ার পর লাভ করেন এবং পরবর্তীদের নিকট সেই জ্ঞান পৌঁছে দেন। এই ইসনাদ ব্যবস্থা মুসলিম উম্মাহ্র অনন্য গৌরবের স্মারক। মুহাদ্দিছরা সব সময়ই ইসনাদকে যেমন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি ইসনাদের বিচ্ছিন্নতা এবং এর মধ্যকার বিভিন্ন প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষ ত্রুটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁরা কোন রাবী অন্য রাবীদের নামে মিথ্যা বক্তব্য চালিয়ে দিতে পারেন এমন সম্ভাবনাও নাকচ করেন নি। আর একারণেই তাঁরা সনদের ত্রুটিসমূহ দূর করার জন্য শত-সহস্র কি.মি. দূরত্বের পথ অতিক্রম করতেন এবং রাবীদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চিত হ'তেন। ইলমুর রিজাল শাস্ত্রে তাঁরা সনদের প্রতিটি বর্ণনাকারীর ব্যক্তি পরিচয় এবং তাঁর জীবনাচার সংরক্ষণ করেছেন। তারা প্রতিটি রাবীর শিক্ষক ও ছাত্রের তালিকা সংরক্ষণ করেছেন এবং এই শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে কারা তার অধিক থেকে অধিকতর নিকটবর্তী ছিল, তাদের মধ্যে স্তরভেদ করেছেন। এত সব আয়োজনের একটিই লক্ষ্য ছিল যেন কোন ব্যক্তি মিথ্যা হাদীছ রচনা করলে সহজেই তা চিহ্নিত করা যায়। আর এভাবে তাঁরা ইসনাদের মাধ্যমে তথ্য ও প্রমাণভিত্তিক পরিপূর্ণ হাদীছ সংরক্ষণ ব্যবস্থা দাঁড় করিয়েছেন। বিশ্ব ইতিহাসে এটিই ছিল সর্বপ্রথম কোন যুগের লক্ষাধিক মানুষের জীবনী সংরক্ষণের প্রচেষ্টা, যা মুসলিম উম্মাহ্র জ্ঞান ও তথ্যভিত্তিক সভ্যতার এক আলোকজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং এই শাস্ত্রকে অস্বীকার করা এবং অগ্রাহ্য করা কেবল নিরেট অজ্ঞতা কিংবা জ্ঞানপাপেরই পরিচয়।

আবূ হাতিম আর-রাযী (২৭৭হি.) বলেন, لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسول إلا في هذه الأمة 'আল্লাহ আদম সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীতে এমন কোন জাতি অতিক্রান্ত হয়নি, যাদের মধ্যকার বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা তাদের রাসূলের রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার সংরক্ষণ করেছেন, একমাত্র এই মুসলিম উম্মাহ ব্যতীত।'[৫২৪]

৫২৪. শামসুদ্দীন আস-সাখাভী, *ফাতহুল মুগীছ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০।

ইবনুল মুযাফ্ফর আল-হাতিমী (৩৮৮হি.) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এই জাতিকে সম্মানিত ও মর্যাদাবান করেছেন ইসনাদের মাধ্যমে। প্রাচীন ও আধুনিক এমন কোন জাতি নেই, যাদের নিকট ইসনাদ রয়েছে। তাদের কাছে কিছু পাণ্ডুলিপি রয়েছে মাত্র। তারা তাদের কিতাবের সাথে বহিরাগত সংবাদসমূহ মিশ্রিত করে ফেলেছে। তাদের নবীদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলের যা কিছু নাযিল হয়েছে এবং যা তারা অসমর্থিত ও অবিশ্বস্ত সূত্র থেকে সংগ্রহ করে তাদের কিতাবের সাথে জুড়ে দিয়েছে তা পার্থক্য করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। আর এই মুসলিম উম্মাহ প্রত্যেক যুগে বিশ্বস্ততা, সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতার জন্য সুপরিচিত ব্যক্তির নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারা এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। অতঃপর তার উপর কঠোর অনুসন্ধান চালিয়েছে যাতে তারা অধিক থেকে অধিকতর বিশুদ্ধ বর্ণনা সম্পর্কে অবগত হ'তে পারে। অতঃপর তারা হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন বিশ বা ততোধিক সূত্র থেকে, যতক্ষণ না তা থেকে ভুল-ভ্রান্তিগুলো দূর করা গেছে এবং তার প্রতিটি শব্দ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় নে'আমত।[৫২৫]

ইবনু হাযম (৪৫৬হি.) বলেন, একজন বিশ্বস্ত রাবী থেকে অপর একজন বিশ্বস্ত রাবী পর্যন্ত বর্ণনাপরম্পরার মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে রাসূল (ছা.) পর্যন্ত পৌঁছানোর এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিম জাতিকে অন্যান্য সকল জাতির উপর অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। আর অবিচ্ছিন্ন সূত্র ইহুদীদের নিকটও অনেক রয়েছে। কিন্তু তারা মূসা (আ.)-এর ততটুকু নিকটবর্তী হ'তে পারে না, যতটা আমরা মুহাম্মাদ (ছা.)-এর নিকটবর্তী হ'তে পারি। বরং তাদের অবস্থা হ'ল তারা এবং মূসা (আ.)-এর মাঝে রয়েছে ৩০টি যুগ বা প্রজন্মের দূরত্ব। তারা কেবল শামঊন বা অনুরূপ কারো নিকটবর্তী হ'তে পেরেছে।[৫২৬]

---

৫২৫. খত্বীব আল-বাগদাদী, *শারফু আছহাবিল হাদীছ*, পৃ. ৪০; শামসুদ্দীন আস-সাখাভী, *ফাতহুল মুগীছ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০।

৫২৬. نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاتصال، خص الله بـه المسلمين دون سائر الملل، وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود، لكن لا يقربون من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من ثلاثين عصرا، وإنما يبلغون إلى شمعون ونحـوه.
দ্র. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূত্বী, *তাদরীবুর রাবী*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬০৪।

সুতরাং ইসনাদ পদ্ধতি সম্পর্কে শাখত বা কতিপয় প্রাচ্যবিদের শিশুতোষ কষ্টকল্পনা এবং বিভ্রান্তিকর অবৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে হাজার বছরের জ্ঞানচর্চার এই অমূল্য সম্পদ বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, বরং বিদ্বসমাজে ইসনাদের অনন্য প্রতিরোধ শক্তি নতুনভাবে উদ্ভাসিত হয়।

সংশয়-৫ : ইলমুর রিজাল শাস্ত্র মুহাদ্দিছদের নিজস্ব রচনা।

প্রাচ্যবিদগণ মুহাদ্দিছদের রচিত রাবীদের জীবনী শাস্ত্রের উপর আস্থা রাখেন না। তারা মনে করেন এগুলো মুহাদ্দিছদের একপেশে রচনা, যার নির্ভরযোগ্যতা খতিয়ে দেখার সুযোগ নেই। তারা আরও মনে করেন যে, একজন রাবী সত্যবাদী বা ন্যায়পরায়ণ হলেই কি তার বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য? এমন কি হ'তে পারে না, যে তিনি তার স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন নি?

পর্যালোচনা :

ইলমুর রিজাল বা রাবীদের জীবনী শাস্ত্র হ'ল পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম জীবনচরিতভিত্তিক বিশ্বকোষ, যা মুসলিম উম্মাহ্র জ্ঞান অনুশীলন ও তথ্য সংরক্ষণের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। স্প্রেঙ্গার (১৮৯৩খ্রি.) বলেন, মুসলমানদের রচনাসম্ভারের একটি গৌরবজ্জ্বল দিক হ'ল এর জীবনচরিত সমগ্র। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই আর না অতীতে কখনও ছিল যারা বারো শতাব্দীকাল ধরে সকল বিদ্বান মানুষের জীবনী নথিভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। যদি মুসলমানদের জীবনীমূলক রচনাসমূহ একত্রিত করা হয়, তবে সম্ভবত আমরা প্রায় পাঁচ লক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনচরিতের সন্ধান পাব। ফলে তাদের ইতিহাসের এমন একটি যুগ পাওয়া যাবে না এবং এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পাওয়া যাবে না, যেখানে তাদের কোন প্রতিনিধি নেই (অর্থাৎ সকল যুগের এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানের মানুষের জীবনী সংরক্ষিত হয়েছে)।[৫২৭]

---

527. The Glory of the literature of the Mohammadans is its literary biography. There is no nation nor has there been any which like them has during the twelve centuries recorded the life of every man of letters. If the biographical records of the Musalmans are collected, we should probably have accounts of the lives of half a million of distinguished persons, and it would be found that there is not a decennium of their history, nor a place of importance which has not its representatives (Aloy Sprenger, Introduction to "Al-Isabah" by Ibn-i-Hazar, A biographical dictionary of persons who knew Muhammad

শিবলী নো'মানী (১৯১৪খ্রি.) বলেন, 'কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের এই গৌরবের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পাওয়া যাবে না। তারা তাদের নবী (ছাঃ)-এর জীবনেতিহাস ও ঘটনাবলীর একেকটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশকে এমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে, আজ পর্যন্ত অন্য কোন ব্যক্তির জীবনেতিহাস এরূপ বিশুদ্ধ পন্থায় পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভবনা নেই'।[৫২৮]

সুতরাং এই বিরাট তথ্যসম্ভারকে যারা কেবল মুহাদ্দিছদের একপেশে রচনা হিসাবে পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে চান, তারা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, হঠকারী ও বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। তাছাড়া জ্ঞানীরাই জ্ঞানের মূল্যায়ন করতে পারেন, অজ্ঞরা নয়। সুতরাং তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি স্রেফ অজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে। নিম্নে তাদের আপত্তি খণ্ডন করা হ'ল।

ক. মুহাদ্দিছগণ রাবীদের সম্পর্কে যে সকল তথ্য একত্রিত করেছেন, তা তাদের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন নয়; বরং তারা বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ এসব জীবনীগ্রন্থে নথিভুক্ত করেছেন। এসকল নথি রচনার পিছনে তাঁদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ ছিল না যে, রাবীদের প্রতি নিজস্ব স্বার্থপ্রণোদিত কোন মন্তব্য করবেন। তাছাড়া জীবনীগ্রন্থের সংখ্যা একটি/দু'টি নয়, বরং দ্বিতীয় হিজরী শতকের শেষভাগে এই রচনাকর্ম শুরু হয়েছিল এবং নবম শতাব্দী পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অনেক জীবনীগ্রন্থ লেখা হয়েছে এবং একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তথ্যসমূহ যাচাই-বাছাই (Cross-check) হয়েছে। তাই এ সকল জীবনীগ্রন্থ সাধারণ ইতিহাসগ্রন্থের চেয়ে বহু গুণ বেশী নির্ভরযোগ্য। এখন প্রশ্ন হ'ল, যদি গবেষকদের নিকট প্রাচীন কোন ইতিহাসগ্রন্থ তথ্যসূত্র হিসাবে গৃহীত হয়ে থাকে, তবে ঠিক কোন যুক্তিতে রাবীদের জীবনীগ্রন্থসমূহকে তথ্যসূত্র হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না? তাছাড়া ইতিহাসের অন্য সব তথ্যের মত এই তথ্যগুলোও অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের সুযোগ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত গবেষণারীতির দাবীকে অগ্রাহ্য করে যদি এক লহমায় এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ বর্জন করা হয় কেবল মুহাদ্দিছদের একপেশে রচনার অভিযোগ তুলে, তবে একই অভিযোগে অন্যান্য সকল প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থও কেন বর্জন করা হবে না? কেননা সেগুলিও তো কোন এক মানুষের হাতেই

(Bishops College press, Calcutta, 1856), গৃহীত : ড. আব্দুর রঊফ যাফর, উলূমুল হাদীছ, পৃ. ১২১)।

৫২৮. ড. মোহাম্মাদ বেলাল হোসেন, *হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ : প্রকৃতি ও পদ্ধতি* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৬৬; গৃহীত : শিবলী নু'মানী, *সিরাতুন নাবাভী*, ১ম খণ্ড (করাচী : দারুল ইশা'আত, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ১১।

লিখিত। আর প্রতিটি মানুষ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ইতিহাস রচনা করে থাকেন, ভিন্ন কারো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়। প্রাচ্যবিদগণ কি তবে পূর্বযুগের সমস্ত ইতিহাসগ্রন্থ এবং ঐতিহাসিক নথিসমূহ বর্জন করে এক ইতিহাসশূন্য পৃথিবী দেখার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন?

খ. রাবী ন্যায়পরায়ণ হ'লেই তাঁর সকল বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে তা নয়। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তিনি যদি কোন হাদীছ বর্ণনা করেন, তবে সাধারণভাবে তা গ্রহণযোগ্যই হবে। কেননা স্বাভাবিক প্রকৃতিগত দাবী মোতাবেক মুহাদ্দিছগণ বর্ণনাকারীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হন এবং যতক্ষণ না তার মধ্যে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, ততক্ষণ তাকে সত্যবাদী হিসাবেই ধরে নেন। আর সত্যবাদিতাকেই তাঁদের যোগ্যতার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কেননা ইসলামে ন্যায়পরায়ণতার মূল্য সবচেয়ে বেশী। ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতার কারণেই কোন মানুষের ভেতর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং যখন তিনি ন্যায়পরায়ণ তথা সত্যবাদী হন, স্বাভাবিকভাবে তাঁর বর্ণনারও বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি হয়। অপরপক্ষে কোন ব্যক্তির উপর প্রমাণহীনভাবে সন্দেহ পোষণ করা এবং মিথ্যারোপ করা ইসলামের নীতিমালা বহির্ভূত।

গ. সত্যবাদী ব্যক্তিও কোন স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হ'তে পারেন কি না?- এর জবাবে আমরা বলব, অবশ্যই পারেন। কিন্তু তা প্রমাণসাপেক্ষ। যদি তা প্রমাণিত হয়, এমনকি যদি এ ব্যাপারে সামান্য সন্দেহও সৃষ্টি হয়, তবে মুহাদ্দিছগণ সেই রাবীর বর্ণনা গ্রহণ করেন না। আবার ক্ষেত্রবিশেষে গ্রহণ করলেও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গ্রহণ করেন। এ কারণেই ইবনু শিহাব আয-যুহরী (১২৪হি.)-এর মত বিখ্যাত মুহাদ্দিছও যখন মুরসাল তথা বিচ্ছিন্ন সূত্রে কোন হাদীছ বর্ণনা করেন, তখন তাঁর বর্ণনা মুহাদ্দিছগণ গ্রহণ করেন না। ইবনু জুরাইজ (১৫০হি.)-এর মত সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ যখন কোন হাদীছ 'আনআনাহ' সূত্রে তথা সরাসরি শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন এমন কথা স্পষ্টভাবে না বলেন, তখন তার হাদীছ গ্রহণ করা হয় না। কেননা তিনি 'তাদলীস' তথা কখনও কখনও স্বীয় শিক্ষকের নাম উল্লেখ না করে সনদ বর্ণনা করতেন বলে অভিযোগ ছিল। সুতরাং মুহাদ্দিছগণ কখনই কোন রাবীর নিকট থেকে নির্বিচারে হাদীছ গ্রহণ করেন না, তিনি যতই সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ হোন না কেন।

ঘ. মুহাদ্দিছগণ সবকিছুর উপর কেন রাবীর ন্যায়পরায়ণতা বা সত্যবাদিতাকে এত গুরুত্ব দিলেন? এ বিষয়ে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর

ফ্রেড ডোনার (জন্ম : ১৯৪৫খ্রি.)-এর একটি পর্যবেক্ষণ বেশ গুরুত্বের দাবী রাখে। তিনি বলেন, ‘এটা স্বাভাবিক ছিল যে, যখন মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা এবং নেতৃত্বের জন্য পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি হ’ল, তখন মুসলমানরা এই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য ধর্মনিষ্ঠতা বা সত্যবাদিতার বিচারকে সর্বপ্রথমে অগ্রাধিকার দিলেন। মানব সমাজে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কিংবা কোন ব্যক্তির অবস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য যেসব বৈশিষ্ট্য ব্যবহৃত হয় তা হ’ল- গোত্রীয় বা পারিবারিক পরিচয়, ঐতিহাসিক সংশ্লিষ্টতা কিংবা সম্পত্তি, শ্রেণী, জাতীয়তা প্রভৃতি। কিন্তু ইসলামের মৌলিক কাঠামোতে এসবের কোন স্থান নেই। এজন্য সংক্ষেপে বলা যায়, প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের নিকট আইনী বৈধতার অর্থ ছিল ধর্মনিষ্ঠতা (তাক্বওয়া)-এর ভিত্তিতে আইনী বৈধতা।’[৫২৯]

মুসলমানদের এই ধর্মনিষ্ঠতার ধারণাটিই সম্ভবত প্রাচ্যবিদদের জন্য হজম করা কঠিন হয়। কেননা তাঁরা মনে করেন, একটি বিবাদ মেটানোর জন্য পক্ষগুলোর পারস্পরিক স্বার্থই প্রধান বিচার্য বিষয়, এখানে ‘ধর্মনিষ্ঠতা’র বিবেচনা অস্বাভাবিক। একই ঘটনা ঘটেছে মুহাদ্দিছদের ‘ন্যায়পরায়ণতা’র শর্ত অনুধাবনের সময়ও। কেননা তাদের ধারণায় এখানে প্রধান বিচার্য বিষয় হওয়া উচিৎ ছিল এ সকল বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিস্বার্থ, তাদের ধর্মনিষ্ঠতা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এজন্য গোল্ডজিহের, শাখত বারাংবার হাদীছ বর্ণনার পিছনে রাবীদের ব্যক্তিস্বার্থ খুঁজেছেন। কিন্তু ইসলাম জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল কিছুর ঊর্ধ্বে রেখেছে ধর্মনিষ্ঠতাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে, ইহকালে ও পরকালে ধর্মনিষ্ঠতা বা তাক্বওয়ার ভিত্তিতেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়। এমনকি এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল্য জাতি, বর্ণ, সম্পদশালীতা এবং ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সর্বপ্রকার স্বার্থের ঊর্ধ্বে। আর যখন এই শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিত হয়, তখন মানুষের নিকট সকল প্রকার ব্যক্তিস্বার্থ তুচ্ছ হয়ে যায় এবং নৈতিক ও পরকালীন স্বার্থই সর্বাগ্রে প্রাধান্য পায়, যা প্রাচ্যবিদগণ অনুধাবন করতে অপারগ।

---

৫২৯. It was natural.. that when there arose within the community of Believers political and social tensions and disputes over leadership.. the Believers first resorted to considerations of piety to resolve those issues. Other distinctions commonly used in human societies to settle disputes and establish an individual's status- tribal or family affiliation, historical associations, or claims based on property, class, ethnicity, etc.- do not appear as part of the original Islamic scheme of things. ...Legitimation among earliest believers, in short, meant legitimation through piety (Taqwa). =Fred M. Donner, *Narratives of Islamic Origins* (Princeton, New Jersey : The Darwin press, 198), p. 98-99.

উপসংহার

পরিশেষে বলতে হয়, ইসলামের ইতিহাস শুরু থেকে নানা মতবাদ আর বিসংবাদে মুসলিম উম্মাহ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, তবুও মুসলিম উম্মাহর নৈতিক আদর্শসমূহ, মৌল নীতিসমূহ কখনই ভ্রষ্টতার করালগ্রাসে হারিয়ে যায় নি। বরং সমস্ত আক্রমণ থেকে ইসলামের মৌল নীতিসমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছায় রক্ষা পেয়েছে। সালাফে সালেহীন এবং মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরামের সমাবেত প্রচেষ্টায় দ্বীনের বিশুদ্ধ ভিত্তি সর্বযুগে অব্যাহতভাবে অটুট ছিল, আজও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। যত নতুন নতুন মতবাদের ভিড় জমুক না কেন, তা টিকে থাকতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। এটাই ঐতিহাসিক সত্য।

আলোচ্য বইয়ে হাদীছ অস্বীকারকারীদের ২৫টি সংশয় খণ্ডনে যে পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে, তাতে হাদীছের প্রামাণিকতা সম্পর্কে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকার কথা নয়। এরপরও জানা প্রয়োজন যে, প্রতিটি বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয়ের অবতারণা এবং প্রতিটি বিশ্বাসকে যুক্তি ও বস্তুবাদী বিজ্ঞানের আলোকে পরীক্ষা করার চেষ্টা কেবল সন্দেহের উপর সন্দেহই বৃদ্ধি করে। কোন সুস্থ চিন্তার বিকাশ ঘটায় না। আস্থাহীনতা এবং চঞ্চলতায় আত্মহারা হওয়া ছাড়া এতে বিশেষ কোন লাভ হয় না এবং মূল উদ্দেশ্য তথা সত্যের মুখোমুখিও হওয়া যায় না। আর সন্দেহ-সংশয় তো অবিশ্বাসীদের প্রাচীনতম রোগ। যে রোগের নিরাময় ইলমুল ইয়াক্বীন বা সুনিশ্চিত জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া অর্জিত হয় না। ঠিক তেমনি রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সংরক্ষণের জন্য লক্ষ লক্ষ মুহাদ্দিছীনে কেরাম যে অতুলনীয় ইলমী প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, তার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা যাদের নেই, তাদের প্রচেষ্টাকে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকৃতি দেয়ার মত শুদ্ধ অন্তর যাদের নেই, সর্বোপরি আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করবেন, এর প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই, তারা পরিষ্কারভাবে অন্তরের রোগে রোগাক্রান্ত, যার কোন নিরাময় নেই।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কুরআন ও হাদীছ মুসলমানদের নিশ্চিত বিশ্বাসের জায়গা। এখানে পশ্চিমা দর্শনের সমালোচনামূলক মনোভাব (Critical Approach) খাটে না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যেমন তারা ক্রিটিকাল হওয়ার চেষ্টা চালায় সেটা দুনিয়াবী সকল ক্ষেত্রে পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু আল্লাহর দেয়া বিধানের উপর নয়। আল্লাহর বিধান শাশ্বত, অপরিবর্তনশীল। তা বুঝতে হয়ত আমরা কখনও ভুল করতে পারি, কিন্তু তাতে সত্যের অবস্থান নড়চড় হয় না। কোন জিনিস সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হওয়ার পর তা 'মানবীয় প্রচেষ্টা' মনে করে তার অবস্থানকে দূর্বল করার চেষ্টা করা শয়তানের

ওয়াসওয়াসা। এতে কোন জ্ঞানও নেই, সততাও নেই। আছে কেবল শঠতা এবং হঠকারিতা। এজন্যই দেখা যায় যারা হাদীছ সংকলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়, তারা শেষ পর্যন্ত কুরআন সংকলনকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। মূলতঃ তাদের উদ্দেশ্য তা-ই- ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, ইসলামের বিধি-বিধানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা।

সর্বোপরি উপরোক্ত পর্যালোচনাসমূহের আলোকে গবেষকদের উপকারার্থে আমরা কিছু ফলাফল এবং প্রস্তাবনা এখানে উল্লেখ করব।

ক. ফলাফল :

(১) ইসলামী শরী'আতের মূল দু'টি উৎস হ'ল কুরআন ও হাদীছ। কুরআন হ'ল ইসলামী শরী'আতের প্রধান উৎস এবং হাদীছ হ'ল দ্বিতীয় উৎস যা কুরআনের মতই আল্লাহ্র অহী হিসাবে পরিগণিত এবং কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে সংরক্ষিত। উভয়ই পরস্পরের পরিপূরক। একটি অপরটি থেকে কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়।

(২) রাসূল (ছা.)-এর যুগেই মুখস্থকরণ এবং লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণ করা শুরু হয়েছিল এবং ছাহাবী ও তাবেঈগণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থেকেছে। অতঃপর আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাবদ্ধকরণ শুরু হয়েছে হিজরী ২য় শতকের শুরু থেকে। সুতরাং কুরআনের মত হাদীছও যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়েছে।

(৩) হাদীছ ও সুন্নাহ্র মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। শারঈ আহকাম সাব্যস্ত করার জন্য সুন্নাহ ও হাদীছ সমার্থবোধকভাবেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুহাদ্দিছ, উছূলবিদ এবং সকল মাযহাবের ফক্বীহগণ হাদীছ ও সুন্নাহকে সমার্থকভাবেই ব্যবহার করেছেন।

(৪) ইসলামী শরী'আতের দলীল হওয়ার জন্য হাদীছ বা সুন্নাহ কারও আমলের মুখাপেক্ষী নয় এবং হাদীছের বিপরীতে কোন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর 'আমল মুতাওয়ারাছ' বা 'পরম্পরাভিত্তিক আমল' শরী'আতের দলীল নয়। কেননা হাদীছের বিপরীতে কোন ইজমা', ক্বিয়াস ও কারও ব্যক্তিগত মন্তব্য স্থান পেতে পারে না; সেটা 'পরম্পরা ভিত্তিক আমল' বা সামাজিক প্রচলন হোক কিংবা কোন অনুসরণীয় ব্যক্তির মতামত হৌক। অনুরূপভাবে প্রাচ্যবিদ ও কিছু আধুনিকতাবাদী মুসলিম পণ্ডিতের ধারণা অনুযায়ী সুন্নাহ কখনও 'সামাজিক রেওয়ায' বা 'প্রচলন' অর্থেও মুসলিম সমাজে ব্যবহৃত হয়নি।

(৫) হাদীছ ইসলামী শরী'আতের বুনিয়াদী উৎস হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্‌র মাঝে কারও কোন দ্বিমত নেই। আহলুস সুন্নাহ ওয়া জামা'আতের সকল বিদ্বান এ বিষয়ে একমত যে, কোন হাদীছ ছহীহ বা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত হ'লে তার ওপর আমল করা ওয়াজিব, তা বহু সূত্রে (মুতাওয়াতির) বর্ণিত হোক কিংবা একক সূত্রে (আহাদ)। আক্বীদা ও আহকাম সর্বক্ষেত্রেই হাদীছ নিরংকুশভাবে আমলযোগ্য। অনুসরণীয় চার ইমামসহ মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহ বিদ্বানগণ সকলেই রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ্‌র একচ্ছত্র মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদান করেছেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মত ও রায়ের ওপর নিঃশর্তভাবে হাদীছকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

(৬) মুসলিম উম্মাহ্‌র মাঝে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত হাদীছ গ্রহণের ব্যাপারে সর্বপ্রথম দ্বিধার সৃষ্টি হয় মু'তাযিলাদের মাধ্যমে, যখন তারা হাদীছকে মুতাওয়াতির ও আহাদ দু'ভাবে বিভক্ত করে এবং খবর ওয়াহিদ হাদীছকে 'যান্নী' বা সন্দিগ্ধ আখ্যা দিয়ে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। মু'তাযিলাদের এই যুক্তিবাদী ও ভ্রান্ত চিন্তাধারার দূরবর্তী প্রভাব পড়ে আহলুস সুন্নাহ্‌র অনেক বিদ্বানের উপর। বিশেষত ফকীহ বিদ্বানগণের মাঝে এই মত প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে তাঁরা খবর ওয়াহিদ হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে ক্বিয়াসী যুক্তির ভিত্তিতে নানা শর্তারোপ করেছেন।

(৭) খবর ওয়াহিদকে ফক্বীহগণের বড় একটি দল এবং একদল মুহাদ্দিছ 'যান্নী' বা প্রবল ধারণানির্ভর আখ্যায়িত করলেও বিশুদ্ধ মত হ'ল, ছহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হ'লে এবং উপযুক্ত প্রমাণ সংযুক্ত হ'লে খবর ওয়াহিদ নিশ্চিত জ্ঞান প্রদান করে।

(৮) প্রাথমিক যুগে হাদীছ অস্বীকার নীতির যে আবির্ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তা রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ্‌র আইনী মর্যাদাকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্ন থেকে সৃষ্টি হয়নি, বরং তার পিছনে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ নিহিত ছিল। আর মু'তাযিলাগণ খবর ওয়াহিদ অস্বীকারের নীতি গ্রহণ করলেও তা মূলত রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ অস্বীকারের নিমিত্তে ছিল না। সুতরাং প্রাথমিক যুগের হাদীছ অস্বীকারকারীগণ রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ্‌র আইনী মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেনি। কিন্তু আধুনিক যুগের হাদীছ অস্বীকারকারীগণ রাসূল (ছা.)-এর সুন্নাহ্‌র আইনী মর্যাদাকে নাকচ করেছেন, যা অভিনব।

(৯) হাদীছের প্রতি সন্দেহবাদী একদল পণ্ডিত রয়েছেন, যারা সরাসরি হাদীছ অস্বীকারকারী না হ'লেও অনেক ক্ষেত্রে হাদীছ অস্বীকারকারীদের চেয়ে হাদীছ

শাস্ত্র ও মুহাদ্দিছদের গৃহীত নীতিমালার প্রতি অধিক বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করেছেন। হাদীছ শাস্ত্র সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞানই তাদেরকে এ পথে প্রবৃত্ত করেছে বলে অনুমিত হয়।

(১০) প্রাচ্যবাদী হাদীছ গবেষণার সূত্র ধরে আধুনিক যুগে মুসলিম সমাজে হাদীছ অস্বীকার নীতির আবির্ভাব ঘটেছে এবং আমাদের পর্যবেক্ষণে হাদীছ অস্বীকারকারী প্রায় সকল ব্যক্তি প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের গবেষণা দ্বারা প্রভাবিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে হাঙ্গেরিয়ান প্রাচ্যবিদ ইগনাজ গোল্ডজিহারের মাধ্যমে প্রাচ্যবাদী হাদীছ গবেষণা শুরু হয় এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বৃটিশ প্রাচ্যবিদ জোসেফ শাখতের মাধ্যমে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই অবধি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীছ বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে এবং তাদের গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল হাদীছ ইসলামী শরী'আতের কোন উৎস নয় এবং বর্তমানে মুসলমানদের নিকট যে হাদীছ ভাণ্ডার সংরক্ষিত রয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে রাসূল (ছা.)-এর বক্তব্য ও কর্মের প্রতিনিধিত্ব করে না; বরং তা পরবর্তী যুগের মুসলিম শাসক ও বিদ্বানগণ কর্তৃক রচিত। তাদের মতে, বিশেষত শরীআতের হুকুম-আহকাম বিষয়ক হাদীছসমূহ সবই জাল ও বানোয়াট।

(১১) প্রাচ্যবিদ হাদীছ গবেষকদের লেখনীসমূহ পর্যালোচনা করে আমরা যে বিষয়গুলি লক্ষ্য করেছি, তা হ'ল- (ক) তাঁদের গবেষণার উৎসসমূহ অত্যন্ত সীমিত। তারা সামান্য কিছু হাদীছ পর্যালোচনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা সমগ্র হাদীছ শাস্ত্রের ওপর আরোপ করেন। ফলে তাদের গবেষণা অত্যন্ত দুর্বল ও সংকীর্ণ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত (খ) তাঁদের গবেষণায় সারলীকরণের প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষ্যণীয়। মুহাদ্দিছগণ যেমন কোন হাদীছ যঈফ বা জাল হ'লে কেবল সেই হাদীছটি বর্জন করেন। অথচ এর বিপরীতে প্রাচ্যবিদগণ তাদের গবেষণায় কোন হাদীছ ত্রুটিপূর্ণ পেলে সেই হাদীছকে অযৌক্তিকভাবে পুরা হাদীছশাস্ত্রই জাল হওয়ার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করেন। (গ) আরবী ভাষাগত দুর্বলতা এবং হাদীছশাস্ত্রে বুৎপত্তি না থাকায় তাঁরা মুহাদ্দিছগণের ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো প্রায়শই বুঝতে ব্যর্থ হন, যা তাদেরকে পদে পদে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত করেছে। (ঘ) তাঁরা মুহাদ্দিছদের গৃহীত হাদীছ সমালোচনা নীতির প্রতি গভীরভাবে অশ্রদ্ধাশীল এবং সন্দেহবাদী (Skeptic)। ফলে হাদীছশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁরা বহুলাংশেই অজ্ঞতার শিকার। (ঙ) মুহাদ্দিছগণের গৃহীত নীতিমালাকে তারা ভিন্ন মোড়কে এমন চটকদারভাবে উপস্থাপন করেন, যেন তারা নতুন কিছু আবিষ্কার করেছেন। যেমন জোসেফ শাখতের প্রধান

দু'টি মতবাদ- সনদের সংযোগসূত্র তত্ত্ব (Common Link Theory) এবং পশ্চাদ-অভিক্ষেপ তত্ত্ব (Backgrowth of Isnads) মুহাদ্দিছগণেরও আলোচ্য বিষয়। তাঁরা এ বিষয়গুলো নিয়ে হাজার বছর পূর্বেই আলোচনা করেছেন এবং নিয়মতান্ত্রিক সমাধান প্রদান করেছেন। অথচ জোসেফ শাখত এই মীমাংসিত বিষয়গুলিকে হাদীছ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর মূল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। (চ) তাঁদের হাদীছ গবেষণা বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে প্রতীয়মান, যদি তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নাও হয়, তবুও তা সভ্যতার সংঘাত থেকে সৃষ্ট। কেননা নিয়মতান্ত্রিক গবেষণাপদ্ধতি অনুসরণের দাবী নিয়ে তারা যেভাবে সুস্পষ্ট তথ্যবিকৃতির আশ্রয় নিয়েছেন এবং প্রামাণ্য তথ্যের পরিবর্তে অনাবশ্যকভাবে কাল্পনিক অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন, তাতে সত্য উদঘাটনের চেয়ে মতাদর্শিক স্বার্থ চরিতার্থের প্রচেষ্টাই অধিকতর স্পষ্ট হয়। (ছ) সর্বোপরি প্রাচ্যবাদী হাদীছ গবেষণা মূলতঃ তাদের বিশ্ব দর্শন (Worldview)-এরই প্রতিনিধিত্ব করে। যেহেতু তারা প্রত্যাদেশভিত্তিক জীবনব্যবস্থায় বিশ্বাসী নন, সেহেতু ইসলামী জীবনব্যবস্থায় কুরআন ও হাদীছ তথা আল্লাহ্র অহীর অস্তিত্ব স্বীকার করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের গবেষণারীতির সাথে তাদের রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাৎ এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাদের গবেষণা পরিচালিত এবং ফলাফলও ভিন্ন। এজন্য কোন কোন প্রাচ্যবিদ এই দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যকে চিন্তাকাঠামোগত সংঘর্ষ (Clash of Paradigm) হিসাবে স্বীকারও করেছেন।

(১২) মুসলিম সমাজের হাদীছ অস্বীকারকারীদের আপত্তিসমূহ পর্যালোচনাকালে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, তারাও প্রাচ্যবিদদের মতই সারলীকরণে অভ্যস্ত। কিছু ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণাকে তারা তত্ত্ব আকারে খাঁড়া করতে চেয়েছেন, যা অতিশয় দুর্বল এবং অজ্ঞতার ওপর ভিত্তিশীল। হাদীছ শাস্ত্রের খুঁটিনাটি দিকসমূহ সম্পর্কে স্বল্পজ্ঞান, মুহাদ্দিছ বিদ্বানগণের প্রতি অশ্রদ্ধা, যুক্তিবাদ নির্ভরতা, পশ্চিমা চিন্তাদর্শনে প্রভাবিত হওয়া এবং সর্বোপরি কুরআন ব্যাখ্যায় নিজস্ব চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠার পথে হাদীছকে বাধা মনে করা প্রভৃতি বিষয় তাদেরকে এই পথ অবলম্বনে উৎসাহিত করেছে বলে অনুমান করা যায়।

(১৩) আমরা এই পুস্তকে হাদীছ অস্বীকারকারী এবং প্রাচ্যবিদদের মোট ২৫টি আপত্তি ও অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে, এসকল আপত্তি ও সমালোচনা সর্বতোভাবে অসার এবং ভিত্তিহীন। নিছক সন্দেহ, ভুল ধারণা, কাল্পনিক তথ্য এবং বিচ্ছিন্ন কিছু উদাহরণ ছাড়া হাদীছ অস্বীকারের পিছনে উপযুক্ত কোন দলীল তাদের কাছে নেই।

খ. প্রস্তাবনাসমূহ :

আমরা অস্বীকার করি না যে, হাদীছকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিদ্বানদের মধ্যেও কিছু তত্ত্বীয় বিতর্ক রয়েছে, বিশেষতঃ হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু যুক্তিবাদী শর্তারোপ, যা প্রকৃতপক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। এগুলো দূর করা এবং হাদীছের চর্চাকে সমাজে আরো বিস্তৃত করতে পারলে তাওহীদ ও সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ গড়ার পর ইনশাআল্লাহ সুগম হবে। এ ব্যাপারে আমাদের প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপ :

(১) মুহাদ্দিছ ও ফক্বীহদের মধ্যে হাদীছকেন্দ্রিক নীতিগত যে বিভক্তি পরিলক্ষিত হয়, তার পিছনে আমরা প্রধান কারণ হিসাবে লক্ষ্য করেছি মানত্বিক বা যুক্তিবাদের প্রচ্ছন্ন প্রভাব। এই প্রভাবকে যদি অপসারণ করা সম্ভব হয়, তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মধ্যে হাদীছকেন্দ্রিক কোন বিভক্তির অবকাশ থাকে না। তাছাড়া এতে সন্দেহ নেই যে, হাদীছ সম্পর্কে ফক্বীহ ও মুতাকাল্লিমগণের তুলনায় মুহাদ্দিছগণের গৃহীত নীতিই সর্বযুগে নিরাপদ ও সত্যানুবর্তী প্রমাণিত হয়েছে।[৫৩০] অতএব মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যপ্রয়াসী বিদ্বানগণ নিঃশর্তভাবে হাদীছ অনুসরণের নীতি বাস্তবায়নে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করলে বিভক্তি দূরীকরণের পথে একটি বড় অগ্রগতি সাধিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশেষত সমকালীন মুসলিম বিশ্বে الرجوع إلي الكتاب والسنة الصحيحة তথা 'পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন'-এর যে ইতিবাচক ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা এই নীতি অবলম্বনেরই একটি সুফল বলে প্রতীয়মান হয়।

---

৫৩০. আলীগড় আন্দোলনের ভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে জোরালোভাবে কলম ধরা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮খ্রি.)-এর মন্তব্যটি এখানে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, یاد رکھو کہ تمام طوائف متکلمین فلسفۂ قدیم کے مقابلے میں بھی ناکام رہے تھے- آج نام نہاد فلسفۂ جدید کے مقابلے میں اسي طرح ناکام رہیں گے- اس وقت بھی صرف اصحاب حدیث اور طریق سلف ہی کامیاب ومنصور ہوئے تھے اور آج بھی اس میدان میں بازی انھیں کے ہاتھ ہیں- فقھاء متکلمین میں سے آج تک کوئی اس میدان کا مرد نہیں اٹھا- 'মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত যুক্তিবাদী কালাম শাস্ত্রবিদ সম্প্রদায় যেমন প্রাচীন দর্শনের (গ্রীক ও অন্যান্য দর্শন) বিপরীতে ব্যর্থ হয়েছিল, আজও তারা একইভাবে তথাকথিত নয়া দর্শনের (পশ্চিমা আধুনিকতাবাদ) বিপরীতে ব্যর্থ হবে। অপরদিকে সেই সময়ও যেমন কেবলমাত্র আছহাবুল হাদীছ তথা হাদীছের অনুসারী এবং সালাফদের পথ অনুসরণকারীরা সফল ও বিজয়ী ছিলেন, তেমনি আজও বাজি তাদের হাতেই। ফক্বীহ ও মুতাকাল্লিমগণ আজ পর্যন্ত কেউই এই ময়দানে টিকে থাকতে পারে নি। দ্র. মুহাম্মাদ ইকরাম, *মওজে কাউছার* (লাহোর : ইদারায়ে ছাকাফাতে ইসলামিয়া, ২২তম সংস্করণ : ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২৬২।

(২) ফিক্বহী মাযহাবের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান যা-ই হোক না কেন, হাদীছের প্রতি আমাদের এই নীতির ব্যাপারে ঐক্যমত হওয়া উচিৎ যে, কোন হাদীছ মুহাদ্দিছগণের নীতিমালার আলোকে বিশুদ্ধ প্রমাণিত হলে তা নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করে নিতে হবে। হাদীছের মর্যাদা সংরক্ষণে এবং শারঈ ক্ষেত্রে পারস্পরিক মতপার্থক্য দূরীকরণে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হ'তে পারে। বস্তুত কোন সত্যসন্ধানী ব্যক্তির জন্য এই নীতি অবলম্বন করা কঠিন বিষয় নয়।[৫৩১]

(৩) মৌলিক বিশ্বাসগত এবং আমলগত ক্ষেত্রগুলোতে মুসলিম উম্মাহকে যতদূর সম্ভব সর্বজনস্বীকৃত অবস্থান (Common Ground) খুঁজে নিতে হবে। আর সেটা একমাত্র সম্ভব তুলনামূলক অধিকতর বিশুদ্ধ হাদীছের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের বিতর্ক থাকবেই, তবে সকল বিদ্বানের চেষ্টা থাকতে হবে যতদূর সম্ভব সুন্নাহ্র নিকটবর্তী ফৎওয়াটি অনুসন্ধানের জন্য। মুসলিম উম্মাহর সফলতা এই পথেই নিহিত বলে আমরা মনে করি।

(৪) হাদীছ অস্বীকারকারী এবং প্রাচ্যবিদদের ভ্রান্তিসমূহ অপনোদনে মুসলিম বিদ্বানগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তবে এ প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। বিশেষত ভবিষ্যত প্রজন্ম যেন এতে বিভ্রান্ত না হয়, এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেই সাথে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে নিয়মিত সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। এছাড়া ইংরেজী, ফ্রেঞ্চসহ বহুল প্রচলিত আন্তর্জাতিক ভাষাগুলোতে মুসলিম

---

৫৩১. ইমাম আবু শামা আল-মাক্বদীসী (৫৯৬-৬৬৫খ্রি.)-এর মন্তব্যটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ينبغي لمن اشتغل بالفقه ألا يقتصر على مذهب إمام، ويعتقد في كل مسألة صحة ما كان أقرب إلى دلالة الكتاب والسنة المحكمة، وذلك سهل عليه إذا كان أتقن معظم العلوم المتقدمة، وليجتنب التعصب والنظر في طرائق الخلاف المتأخرة، فإنها مضيعة للزمان ولصفوة مكدرة 'যারা ফিক্বহের সাথে জড়িত তাদের উচিৎ হবে, যে কোন একজন ইমামের মাযহাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকা এবং প্রতিটি মাসআলার ক্ষেত্রে যেটি কুরআন ও সুন্নাহ্র স্পষ্ট দলীলের নিকটবর্তী হবে তাতেই আস্থা রাখা। যারা পূর্বযুগের অধিকাংশ জ্ঞানসমূহে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, তাদের জন্য এটি সহজ কাজ। তাদের জন্য আরও উচিৎ হবে গোঁড়ামি ত্যাগ করা এবং পরবর্তীদের মতবিরোধপূর্ণ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেয়া। কেননা এগুলো সময় নষ্টকারী এবং খুবই অপ্রীতিকর বিষয়।' দ্র. শাহ ওয়ালিউল্লাহ আদ-দিহলভী, *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪।

বিশেষজ্ঞদের অধীনে একটি ইসলামী বিশ্বকোষ রচনার আশু প্রয়োজন। কেননা প্রচলিত বিশ্বকোষসমূহ প্রাচ্যবিদদের তত্ত্বাবধানে লিখিত। ফলে হাদীছ বিষয়ে তাদের ভ্রান্তিপূর্ণ পর্যবেক্ষণই সেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ বিষয়ে সাম্প্রতিককালে মদীনায় প্রতিষ্ঠিত مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৫) সমাজে হাদীছ বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে। বিশেষত বাংলাদেশের উচ্চতর দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে এখনও পর্যন্ত উলূমুল হাদীছ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ অপ্রতুল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ এবং হাদীছ বিভাগসমূহেও উলূমুল হাদীছ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উচ্চতর গবেষণা হয় না। এই দৈন্যদশা দূর করতে হবে এবং হাদীছ শাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের অবগত করাতে হবে। যাতে এ বিষয়ে তারা উচ্চতর গবেষণার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে এবং হাদীছ অস্বীকারকারী, হাদীছের প্রতি সন্দেহবাদী ও প্রাচ্যবিদদের ভ্রান্তিসমূহ খণ্ডনে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে।

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللهم اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-

*****

‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই